জল মাটি আগুনের উপাখ্যান
আবুল বাশার

॥ ১ ॥

—কে যায় ?

জবাব আসে না। বৈঠকের দাওয়ার নীচে সন্ধ্যামণির ঝাড়। ফাটা টালির এক জায়গা ঝরে গিয়ে ফোকর হয়েছে। মনে হচ্ছে, ফোকরটা মাপ করে আকাশের চাঁদের সঙ্গে কেউ কেটেছে ; ফোকর আকাশের, না টালির, না চাঁদের—ভ্রম হয় ! চাঁদ গলে এসে সন্ধ্যামণির ঝাড়ে লেগেছে।

—কে যায় ? ফের বুড়োটা হাঁক পাড়ে।

—আমি।

—আমি কে ?

ফোকরটা তালপাতার পাখা দিয়ে ঢাকা যেত। সেই অবসর কারও হয়নি। ভাঙা টালি ফেলে দিয়ে নতুন টালি লাগানো আরও মেহনতের। ওই ফাঁকে এখন একটা চকোর উড়ে বেড়াচ্ছে। বুড়ো জানে, ওখানে চাঁদ আছে, কিন্তু চাঁদটা তার চোখে ঘষা পয়সার মতো অস্বচ্ছ। ছোট। পূর্ণিমা রাতে চকোর দেখা একটা কাণ্ড বটে ; ফটিকজল, চকোর-চকোরী, এসব হল যৌবনের ব্যাপার।

—আমি ? আমি অশ্ব ? কে তুমি ? গেরাম ? মৌজা ? দিগর ?

—আছে।

—আছে জানি, কিন্তু বলা হচ্ছে না কেন ? নাম ? নাম বলো ধম্মপুত্তুর।

চাঁদের মুখে ছড়িয়ে এসে লেগেছে বাঁশের ডগাটা ; কঞ্চি। বাঁশবনে জ্যোৎস্না ফিসফিস করছে, গা ঘেঁষাঘেঁষি করছে হাওয়া আর একটি স্বর্ণগোধিকা ঠোঙার স্তূপ ঠেলে কামের তাড়নায় সর সর করে মত্ত হয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে। সেই শব্দ কান পেতে শুনল বুড়ো। তারপর সে রাস্তায় গড়িয়ে চলা সাইকেলের চেন খসে পড়ার শব্দ শুনল। লাঠি বাড়িয়ে পথের নাগাল দেখে নেয়। এটা স্বভাব।

—নাম বলো।

—নাম মদন।

—দিগরে পাঁচখানা মদন। কোনখানা তুমি ?

—আজ্ঞে, নাম মদন একটাই।

—অ। কেতা আছে বলতে হবে। চেন তোলো।

চাঁদের মুখেলাগা বাঁকা কঞ্চিটার দিকে চাইল নাম মদন। অর্থাৎ মদন দেবনাথ। যুগীপাড়ার ছেলে। সে কি বলতে পারে না, ও হল, যুগীপাড়ার মদন। না, পারে না। কারণ যুগীপাড়ায় আর এক বুড়ো মদন আছে, স্বর্ণকার। নাম মদনই তার পক্ষে সুবিধের।

—কে যায় ?

ত্বরিত মিষ্ট জবাব—নাম মদন।

কেবল আজই সে জবাব দিতে দু'দণ্ড দেরি করেছে। গড়িমসি করেছে এক রতি ; অন্যমনস্কতার ফলে। কী সেই অন্যমনস্কতা ? অন্য কোন দিকে তার মনটা ধেয়ে যাচ্ছিল ? কাম তো ফতে হয়েছে। মনটা কি খচখচ করে, দুখায় ? সামান্য চিনচিনে ব্যথা ?

আঙুলে কালি লাগল মদনের। লাগুক, অমন একটু আধটু লাগেই। কালি না লাগলে মরচে লাগত, সেটি আরও খারাপ। চকোরটা কি চাঁদের চারপাশেই ঘুরছে না ? সিটে কালি মোছে আঙুলের। নিজেরই তৈলাক্ত চুলে আর দাড়িতে তারপর। এবং গোঁফে তা দেয় সেই আঙুল দিয়ে।

—মাডগার্ড আছে হে ?

—না।

—বেল ?

—না।

—কী আছে ?

—খুরিটা চোট হয়েছে হাটে। আঙুলে টিপলে ঘণ্টির কল নড়ে আর ঘষটে খিল্‌ক খিল্‌ক করে, তাইতেই চলে যাই।

—রিম ?

—টাল আছে কিছুটা, প্যালায়। আর ধরেন সামনের ব্রেক নমো নমো করে ধরে। পেছনেরটা ফোকলা।

—ক' ক্রোশ যেতে হল ?

—তা আপনার ন' মাইল ছাড়িয়ে যাওয়া তো, অনেকটাই ক্রোশ হবে বাবা।

—ন' মাইলে ওপাড়ার পুনির বিয়ে হয়েছে।

—আজ্ঞে।

ন' মাইল জায়গার নাম। এই রকম একখানা সাইকেলের কঙ্কালে চড়ে এতটা পথ তাড়িয়ে চলে যাওয়া মস্ত রোখ নিঃসন্দেহে। চেন

পড়েছে কতবার গোনা নেই। তবু দমেনি মদন।

—পুনির সাথে দেখা হল বাপ ?

—না।

—পুনিরা পাকা সড়কে ধান শুকোতে দেয়, আগুনে নাই। দ্যাখো নাই বাবা মদন ?

বুড়োর নাম ধম্ম। সরকার ধর্মনারায়ণ। ইউনিয়ন আমলে প্রেসিডেন্ট ছিল। বয়েস একশ' এক বৎসর। একে গাঁয়ের, মৌজা-দিগর-মহকুমার পাবলিক 'বড়ো বাবা' বলে ডাকে। সরকারি ডাক। বড়ো বাবাকে শ্রদ্ধা দেখানো নিয়ম। কথা শুধালে কথা বলা, তা-ও বিধেয়।

ধম্ম আরও একবার লম্বা লাঠিটা রাস্তার দিকে মেলে দিয়ে জানতে চাইছে মদন চলে গেল কিনা !

—চাঁদ উঠেছে নাকি ?

—আজ্ঞে !

—দোল পুন্নিমের চাঁদ, রঙের চাঁদ। কবে গেল ?

—পরশু।

—রঙ খেলেছ তুমি ? দোলের রাতে আমার জন্ম গো ! জন্মালাম, কিন্তু সাড়াশব্দ নাই। পেট থেকে পড়ে চেঁচায় না জাতক, মরা নাকি হে !

এবার বড়ো বাবা তেনার জন্মবেত্তান্ত শোনাবেন। লাখ কথার এককথা যেন। তেনার সবই আশ্চর্যজনক। সবকিছুতেই বিস্ময়ের আবির ; কী করে জন্মের পর তিনি চেঁচালেন, সেটিই এখন কথা।

—যাই ? বলে নাম মদন নরম করে চলে যাওয়ার অনুমতি চাইল। তখনও ধম্ম হাতের লাঠি রাস্তার দিকে মেলে পথের ছেলেটাকে আটকে দিতে চাইছে। যদিও লাঠিটা এত দূর পৌঁছয় না, পথ ফাঁকা, তবু লাঠির নির্দেশ মানুষ মানে ! বাধা ঠেলে যেতে পারে না।

ধম্ম বলল—বড়ই তাড়া নাকি হে ? দুনিয়াটা নিতান্ত খাসা জায়গা বাপু। এসেছিলাম, তা-ও যে লম্বা সময়, এখন যাব যাব করছি। তাক করে রয়েছি, কিন্তু শালা মরণ আর আসে না। হেঁ হেঁ !

—যাচ্ছি তা হলে ?

—কাছে আসো, দেখি তোমাকে ! এত যে ডালভাঙা ক্রোশ, ভাঙা বাইক ; কষ্ট হল খুব ?

—তা হল আজ্ঞে !

—কোনও খবরটবর ছিল ? চাকরি না বিয়ে বাবা ? নাকি মরাটরা...

—বিয়ে ! বলেই কেমন চমকে উঠল মদন ।

—ভাল কথা ! খুব ভাল কথা । মেয়ে দেখা হল তা হলে ? কী কর বাপ ?

—টানাভরনা বড়ো বাবা !

—হাত-চালানি মাকু নাকি ডোর-দড়িটানা ? মেয়ে সুশ্রী ?

আর কোনও কথা কইতে আগ্রহ ছিল না মদনের । ধর্ম যদি জেনে যায় মেয়ে অতি সুশ্রী, থুতনির উপর তিলও আছে, গলার ভাঁজে বাদামি জড়ুল, প্রগাঢ় কেশবতী, চোখ দু'টি...

এই শালা বুড়োটা যেন ভগবানের পেয়াদা । নিখুঁত গেজেট । কথা দিয়ে জগৎ দেখে । সব বর্ণনা বিশদে করতে হয় । চোখ যথেষ্ট ঝাপসা । কান এখনও কিন্তু সজাগ । ফিস্ করলে দাঁড়া খাড়া করে । বাইকের চেন পড়ে গেলে শুনতে পায় । কুক্ষিতে সব ঘটনা ধরা । একশ বছরের কুক্ষি কম না । নাম ধর্ম । যেমন সে কিনা নাম মদন ।

মদন সাইকেলটা বৈঠকের দেওয়ালে খাড়া করে রেখে ধর্মের ঝুলন্ত পা স্পর্শ করল । কপাল ঠেকিয়ে উঠে দাঁড়াল । এতেই খুশি ধর্মনারায়ণ । ছোট্ট একটা প্রণাম ঠুকে দিলে ধর্ম আশীর্বাদ করে এবং ঠাণ্ডা হয়ে যায় । পথিককে আর প্রশ্ন করে না ।

—ভাল বউ হোক তোমার ! ঘরকন্না সুখের হোক বাছা । বউ মাড় গালবে মালাইতে, লাটাই তকলি চরকা ঘুরবে তোর ঘরে । যুগিকে অন্ন জোগাবে অন্নপূর্ণা । যা, চলে যা ।

আশীর্বাণী শুনতে শুনতে হঠাৎ মদনের চোখে জল এল । এ রকম জল চলে আসে কেন ? কোনও পাপ হল ঠাকুর ? কুঞ্চিকে সে কি একদিন শহরের ওই সন্দেহজনক নিরাময় ক্লিনিকটার সামনে একলা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেনি ? বুকে বইখাতা ধরা থাকলে কী হবে ! সিসে রঙের টেলিগ্রাফের পোস্টে লাগানো টিনের পাতে লাল অক্ষরে জ্বলজ্বল করছিল 'গর্ভপাত' । কলেজে এসে ভ্রূণমোচন করেছে কুঞ্চি ওরফে শিমুল । অত নরম নির্দোষ মুখে, কী পবিত্র কালো চোখে লুকনো ছিল তুলোর মতন কোমল পাপ ।

অবশ্য আজকাল কেউ আর ভ্রূণ-বিনাশকে ঘটনা মনে করে না । এ রকম গর্ভপাতের সেন্টার সব চাকলায় জাঁকিয়ে বসেছে । গুপ্তরোগের বিজ্ঞাপনে ছেয়ে গেছে শহরের চোয়াল ।

ওই গলিতে গেল কেন শিমুল ? লোহালক্কড়ের দোকানে রেশম-তসরের থান শস্তায় বেচে দিচ্ছিল মদন । ওজনে আর মাপে মারা এই থান । শস্তায় দিলে মাড়োয়ারিরা খুব কেনে । একটু ঝুঁকে

স্যাঁতলা-ভিজে, ক্ষয়াটে সিমেন্ট ঝরে যাওয়া ইট-পিছল গলিটায় চেয়ে দেখল নোট গুনে নিতে নিতে সে। দেওয়ালে চাপড়া-ধরা নোনা হঠাৎ হাওয়ায় খসে পড়ে। শাড়ি-পরা শিমুল নাভির গর্ত দেখতে দেয় না। তলপেটটা কি সামান্য ঠেলে ওঠেনি! এই জন্যেই সালোয়ার-কামিজ পরেনি।

হিতেনদার ক্লিনিক। হিতেন হল কোয়াক-ডাক্তার; নসিপুরের ছোট পাকুড়তলার লোক। ওর ছিল দরমা-বেড়া আর বালির ঘাটের টালির ডিসপেনসারি, তাই থেকে এই। গর্ভপাতের ব্যবসায় চড়চড় করে ওঠা যায় বিত্তের টঙে। হিতেন এখন টঙে উঠে ঠ্যাং নাচাচ্ছে। অবশ্য এখনও গাঁয়ে ঘোড়ায় চড়ে রুগি দেখে বেড়ায়। ঝানকারোগা ঘোড়া। পিছনের পা দু'খানি গাঁটে গাঁটে ঠেকে পেলিয়ে টোক্কর খায়। গা কাঁপে থরথর করে। এখনও কোয়াকটা গর্ভ সামলাতে গিয়ে গাঁয়ের আঁধারে মেয়েমানুষ মেরে ফেলে।

শিমুলের তলপেট সাফ হয়ে গেল চোখের সামনে। দেখতে হল। ধর্মের গেজেটে একথা লেখা নেই। বড়ো বাবা, তোমার কুক্ষি সাফ করলেও শিমুলের ক্লিনিকাল রিপোর্ট বার হবে না। কাছে এলে কুক্ষিকেও তুমি 'ভাল বর হোক' বলে আশীর্বাদ করবে!

দেওয়াল থেকে সাইকেলখানা টেনে নিয়ে পথে পড়ল মদন। তারপর গড়াতে গড়াতে থুঃ করে থুথু ফেলল গ্যাঁজসুদ্দো। থুথুতে রইল জ্যোৎস্না লাগা নীল শাঁস। মদন ফেরার পথে পুনিদের টিকরে কচি আমগাছটার গায়ে বাইক হেলান দিয়ে সিটে দাঁড়িয়ে চুরি করে বোল-গুটি ছিঁড়ে খেয়েছে। থুথুতে তাই এখনও নীল কষ।

শনির থানে এসে থামল মদন। সন্ধ্যার পরও দেব-পূজার ধুনি-মালসা-ধূপ কেঁড়িয়ে-কুণ্ড হয়ে পথে গোলাচ্ছে। তেলমাখা পিছল কালো-কোঁদা গা দরমার ফাঁকে গোচর হয়। উরুর কাপড় উপরদিকে জড়ো করা। নারকোল দু'ফাঁক হয়ে সামনে লুটনো। সিঁদুর ছড়িয়ে; ও প্রান্তে লাল কাপড় পড়ে আছে। নীল রঙের দুষ্ট দেবতার পুরুত মেটে মিস্ত্রি কল পোঁতে, জলের কল।

মদন হাঁকল—মেটেদা আছ নাকি?

—আছি।

—কাল একবার যাবে, উঠোনের কলে বালি উঠছে। লেয়ার ঠিক হয়নি। এক পাইপ কমিয়ে দাও, না হয় বাড়িয়ে দাও।

—হবে।

মদন দেখল, ঘরের মধ্যে এয়োস্ত্রী তিনখানা, একখানা কুমারী। এবং

কুমারীটি আর কেউ না, মাঠপাড়ার দানো মদনের বোনটা। এই হল কুঞ্চি। ভাসাভাসা অতি পবিত্র কাজল-চোখে, বস্তুজ্ঞানহীন চোখে চেয়ে নিঃশব্দে হেসে বেরিয়ে এল।

—আমাকে একটু ব্যাকে নেবে মদনদা ? বলে শিমুল মদনের হ্যান্ডেল ধরে নিষ্পাপ ভঙ্গিতে সম্মুখে এসে দাঁড়াল। চুলে স্যাম্পুর গন্ধ, শরীরে চন্দন। ধক করে শ্বাসে ঠেলে এল। রসবতী খেজুর গাছের মাথার মৌজের গন্ধে চন্দন মেশালে এবং বকুল দ্রব করলে যা হয়, সেই মূর্ত অবয়ব, আজ তার নাভির উপরে নীচে মৃদু রোমের আভায় সুগোল গহ্বর প্রকাশিত, কারণ ওখানে তেরছে এসে ঠাকুরের দীপালোক, গলিত ঘি-তেলের জ্যোৎস্না লেগেছে। আকাশে চাঁদ টই দিচ্ছে, নীচে জাগ্রত বাসন্তী যৌনতা।

মদন বলল—রডেই বস, নিয়ে যাই ! ব্যাকে কেন ? আয় না !

—না দাদা, সে ভারী লজ্জা করবে। তা হলে তুমি যাও, কমলাদিই এগিয়ে দেবে। আমি তো পুজোর জন্য আসিনি। আচ্ছা, যাও। বলেই থানের ঘরে গুঁজে গেল শিমুল। মুখটা কেমন ভারী হয়ে গেছে। চোখে ভীরু প্রত্যাখ্যান এবং ভদ্র দূরত্ব ঘনিয়ে উঠেছে।

নগেনের বউ কমলার বাসন্তী রঙের শাড়ির পিছনে পিঠ ঘেঁষে বসে গেল কুঞ্চি। একবার খালি তেরছে দেখল মদনকে এবং একবারও আর চোখ তুলে চাইল না এদিকে। এই সময় মদনের যৌনক্রোধ হয়।

মনে মনে ভাবল, কাম তো ফতেহ্ করে এল, পেটফেলা মেয়ের সর্বনাশে ঠাকুর দোষ দেখেন না। মনে পড়ল, ওই অত ভোরে চেনে ফেড়ে যাওয়া পাজামার পা গিঁটবাধা দেখে পালমশাই অনেকক্ষণ শুধু গিঁটটার দিকেই চেয়ে রইলেন।

—কী চাই বাবা ?

—আজ্ঞে চাই না কিছু। খালি একটা খবর দিতে আসা। বিশ্বাস না করেন বাজিয়ে দেখবেন। ছেলের বিয়ে দিচ্ছেন শুনলাম।

—হ্যাঁ, দিচ্ছি। কেন বাবা, কী হয়েছে। বলে কাঁচাপাকা জোড়া ভুরু শিবু পাল কপালে তুললেন। বাইরের উঠোনে কুলতলায় পড়ে থাকা টুলটা দেখিয়ে বললেন— টুলটায় গিয়ে বসো, আমি আসছি।

চিড়চিড়ের সরু ডাল চিবিয়ে শিবপদ দাঁতন করছিলেন। ধুতি পরনে, গায়ে সেই ধুতিই ফেরতা দেওয়া, লোমশ ভুঁড়ি দেখা যাচ্ছে, এক কাঁধ খোলা।

একটু বাদে মুখ ধুয়ে গায়ে নীল রঙের আধ-ময়লা বাংলা শার্ট গলিয়ে, হাঁটুর চাকির এক ইঞ্চি নীচে নামে এমনই ধুতির বহর দিয়ে একটি মোড়া

হাতে ঝুলিয়ে এলেন পালমশাই। টুলে বসেছে মদন।

মোড়ায় বসে পালমশাই ঝুঁকলেন মদনের মুখের কাছে। বললেন— কে হয় মেয়ে ? আত্মীয় ?

মদন বলল— আমাকে ভুল বুঝবেন জানি। গোপন না করে বলি, আমি শত্রু। কেমন শত্রু শুনবেন ?

—না। দরকার নেই। শত্রু না হলে এভাবে বাইক মেরে সাত-সকালে আসবে কেন ! ঘটনা কী বলো !

—আমিই দানো মদনের চাক বন্ধ করে দিতে পারি। কিন্তু সম্পর্কে মিতে আর শিমুল ভাল মেয়ে বলে করিনি ! ভাল মেয়ে, মুখের নকশা ভাল, চুলের ঢাল নেমেছে নিতম্বে, গলার ভাঁজে জড়ুল, থুতনিতে তিল। মিলিয়ে নিন। হায়ার সেকেন্ডারিতে ফার্স্ট ডিভিশন, একটা লেটারও পায়নি, ফিলজফি অনার্স, ফার্স্ট ইয়ার। টেনেটুনে ফার্স্ট ডিভিশন। যাই হোক। হিতেন ডাক্তারের ক্লিনিকে একটু খোঁজ নেবেন। মেয়ের অ্যাবরশন হয়েছে।

—বল কী !

—আজ্ঞে হ্যাঁ !

—কী করে হল !

—আর জানতে চাইবেন না। যা বলে গেলাম, অনুগ্রহ করে আমার নামে কাউকে বলবেন না।

থ হয়ে বসে রইলেন পালমশাই। থুতনি খানিকটা ঝুলে গেছে। কুঞ্চির সৌন্দর্যের প্রতি পালের বিতৃষ্ণা জেগে উঠল হঠাৎ। সেই বিকৃত হয়ে ওঠা মুখটা মনে করলে মদনের যৌনক্রোধ কমে আপাতত।

মদন সাইকেল গড়িয়ে বাজার পেরিয়ে নদীর কিনারে লাল সড়কে নেমে আসে। এই নিয়ে অন্তত সাতটা বিয়ে ভেঙে দিল মদন। কেন দিল ? না, ঘটনাটা কী করে ঘটে যায় !

সাইকেলটা সকালে প্রায়ই টায়ারে বাতাস-মরা থাকে। আজ ছিল না। হাওয়া ছিল টিউবময় পূর্ণ। সাইকেলটাই তাকে টেনে নিয়ে গেল। রাতভর ক্রমে বাতাস ছাড়ে বাইক, এত সন্তর্পণে এবং মন্থরে যে, সিট চিবনো কুকুরটাও টের পায় না। খুঁটিতে, চিঁড়ে-কুটনো ঢেঁকির খুঁটায় বাইক হেলান দিয়ে ঘুমালে আপনা থেকে হড়কায়। হড়কালে ছোট কাছিমবৎ সিটটা খুলে পড়ে যায়। তখন কুকুরটা আসে। ছিঁড়ে খেতে চেষ্টা করে রাতভর। চিবিয়ে দেয়, গিলে ফেলতে পারে না।

যদি পারত, কুঞ্চির বিয়ে হয়ে যেত। চামড়া খেতে না পেরে কুকুর নারকোল মালাইতে রাখা মাড় খেয়ে গেল রাতে। বাজে দুর্গন্ধ ছিল

উঠোনে। মাড়ের গন্ধে লেবুফুল মূর্ছা গেছে।

অতি ভোরে উঠোন থেকে সিটটা তুলে মদন সাইকেলে টুপির মতো করে বসিয়ে নেয়। টায়ার বাতাসে টাইট। লাফিয়ে পড়ল পথে। জ্যোৎস্নার সরে দিগন্ত তখনও মদির।

এভাবে গেল কেন সে? সাইকেলটার জন্যই তো। আর কারই বা ঘাড়ে দোষ চাপাতে পারে মদন! চকের বাজারে এই মড়া-সাইকেল করেই বাবা যেত আসত। সুতো আনত, কোরা থান দিয়ে আসত। তাঁতের গর্ত হল আশ্চর্য গহ্বর। ওখানে গায়ের ছাপে চক্রধারী, ক্ষুর-অলা ফণী কেঁড়িয়ে ছিল এক ভোরে। বাবা বোঝেনি। পা দু'খানি নামিয়েছে মাত্র, অমনি দংশাল বাবাকে। অত্যন্ত ঠাণ্ডা, সংযত সেই সাপ। একবার মাত্র টানা, মাত্র একবারই ভরনা, তারপরই মাকু থেমে গেল। মুখটা ঢলে পড়ল থানের বুনোট তোলা রেশমের ফাঁদে; মৃত্যু সে কি রেশম?

এত আস্তে মরে গেল বাবা। কেউ জানল না মৃত্যুর এমন বুনন, এত রোদ এসে পড়া রেশমি উজ্জ্বলতা সেই ভোরে। বাবা শুধু 'অক্' করে শব্দ করেছিল। একবারই। তারপর নিঃশব্দে ঢলে পড়েছিল। মুখ থেকে লালা ঝরে পড়েছিল রেশমে। জিভটা বেরিয়ে এসেছিল বিস্ময়ে, ভয়ে আর অসতর্ক ব্যথায়। যেন মৃত্যুর পরও বিশ্বাস করছে না, সে এভাবে মরে যেতে পারল। মেনে নিতেই পারছে না বেচারি। মৃত্যুকে না মানা মৃত্যু কি আদতে রেশম নয়?

বি.এ. পাশ করে সেই গর্তেই ঢুকতে হয়েছে মদনকে। পা ঢোকানোর আগে গর্তটা দেখে না নিলে চলে না। বিষে মৃত বাবার গায়ে চাকা চাকা দাগ হয়েছিল। ফোলা ফোলা, রসাল দাগ।

সবই মনে পড়ছে। চৈত্রের হাওয়া দিচ্ছে নদী ভৈরব। মাঠপাড়ার দানো মদনের ঘরে বাতায় ঝোলা হ্যারিকেনের আলো জ্বলছে ফোঁটার মতো। শোনা কি যায় কোনও শব্দ। আথালের শব্দ? গোটার শব্দ? পিটনের শব্দ? পিটন, আথাল, গোটা। এই সব স্ত্রী-হেতের অর্থাৎ স্ত্রীদের ব্যবহৃত হাতিয়ার ভৈরবের মাটিকে পিটিয়ে চলে রাতেও। দানো মদনের বাঁজা বউয়ের গতর ঢলিয়ে ওঠে। গায়ে ঘাম, কপালে ঘাম, গলা বয়ে নামা বুকের উপত্যকা এবং স্তনদ্বয়ের খাঁড়ি চুইয়ে যাওয়া ঘাম—সবই দেখে, এক্ষণে মদন দেবনাথ। মনের মধ্যে ছবি দেখা, হুতোশি ছবি।

উদরে ঘামের রেখা চিকিয়ে ওঠে। আলগা কাপড় ঠেলে ওঠা তলপেটে ঘামেরই শ্রম। এখন কি তবে বীরভূমের লাল মাটির 'রাঙা' দিচ্ছে বউ? শব্দ নেই। নীরব জ্যোৎস্নায় নদীও কি বধির? রাঙা দিলে

তুলি চলনে চুড়ির শব্দ হবে, এত দূর থেকে চুড়ির শব্দ শোনা যাবে না।

রাঙা দেওয়া হাতখানি কী ফর্সা গো! মুখেই প্রায় বলে ফেলে একা মদন। নদীর কাঁধালে দাঁড়িয়ে।

নাম মদন ভাবছিল, মিতবউ যখন বাতায় ঝোলা দড়ি ধরে মাটির লেই লাথিয়ে চলে তখন কী কী ঘটনা হয় তার শরীরকে ঘিরে। বেশ বড় বড় বুক দুটো কাপড়ের আড়ালে উছলে উছলে নড়তে থাকে। বালির মিশেল দিতে দিতে মাটিকে লাথানো—পায়ের ফর্সা গোছ, মৃদু রোম, আরও উপরে ধবল মসৃণতা, উঠোনে কুকুরের জিভের মতো দৃষ্টি লেলিয়ে বসে বিড়িফোঁকা মদন ভেবেছে একদিন সে ঝাপিয়ে পড়বে বউটার উপর।

এ রকম সেক্সি বউ ক'টা আছে দিগরে? এদিকে মিতে তো কোমরধসা, দু'বছর আগে চাকপুজোর ফুল পাড়তে গিয়ে ধসে গেল। জষ্টি মাসে ফুল কোথা! জ্যৈষ্ঠের প্রথম শনিবার চাকপুজো সম্বৎসরের কৃত্য। অশোক কি কৃষ্ণচূড়া ফুলে পুজো। প্রকৃতি নেড়া, ক্ষয়াটে, মাটি ফাটা, ধু-ধু করা, লু বওয়া ঝলসানো চরাচর, নদী শুখাশীর্ণ, ধুলোয় সমাচ্ছন্ন আকাশ।

ডাল ভেঙে পড়ে গেল দানো মদন। মজুমদার বাবুদের জোড়া-পুকুরের অশোক মটকে ফেলে দিল ছোকরাকে। বউ মাটি মেখে চাকে বসাবে বলে নদীর বালিওড়া চরের দিকে উদাস হয়ে চেয়ে বসেছিল। রবিবারে চাক ঘুরবে।

পুরুত ডাকবে না বলে গিয়েছিল দানো। ফুল চড়িয়ে, লেই বসিয়ে সাড়ে বাইশ পাক ঘোরালেই শনিবারের পুজোর ক্ষান্তি হয়ে যাবে। শিবের নামে চাকা ঘুরে যাবে। ব্যাস! পয়লা পাক দেওয়ার আগেই বাঁজা গঙ্গাজল ছিঁটিয়ে দেবে।

দানো মদন নিজেই একটু আধটু নমঃ নমঃ করতে পারে। সাড়ে বাইশ পাকের রবিবারের বউনিতে শনিবারে পুরুত না দিলেই বা কী। শনিবারে লিঙ্গপূজা হয়েছে। বোশেখে চাক ঘোরে না। চাকের দেবতা বিশ্রাম করেন। মৃত্তিকা ঘুমিয়ে থাকেন। ধরিত্রী গা জুড়োয়।

গা, মাটির গা। ধরিত্রী বসেন চাকের উপর পা ছড়িয়ে। মাটির মুখটা, গলাটা, বুকটা, কোমর এবং নিতম্ব আঙুলের চাপে ভেঙে যায়, খাড়া হয়ে ওঠে। নিতম্বে প্রহার করো বউ। আথাল বসাও, পিটনে মারো। গোটা ঠুকে দাও। হেঁসো দিয়ে কাটো।

ভাবতে ভাবতে আপন মনে হেসে ফেলল নাম মদন। মাটিকে কী না করে এরা! সব করে। লাথি মারে নদীর কাঁখাল, কোঁখ থেকে কেটে

এনে। কোঁখ হল কুক্ষি। নদীর কুক্ষি হল কুমোরের ইতিহাস। শিক্ষিত ছেলে নাম মদন নদীর পাড়ের বাবলার গাছে সাইকেল হেলান দিয়ে কচ্ছপ-সিটটা তুলে নিয়ে নদীর কাঁধালে মরা ঘাসে ফেলে চেপে বসে এক দুই লাখ জোনাকির দিকে চেয়ে রয়েছে। নদীর বুকে অনন্ত জোনাকি। জ্যোৎস্না এবং চৈত্র-জোনাকির ধূসর ভৈরব।

এখানে কী ? কেন ? এই পথেই ফিরে আসবে শিমুল। এরা নদীর কুক্ষি খোঁটে। এরা জানে না কোদালের ব্যবহার। এরা ব্যবহার করে খুপড়ি, ছোট কোদাল। এরা খোঁজে এঁটেল নয়, মেটেল।

তফাত বলো, নাম মদন ! মাটির বিচার, তার কি কোনও শেষ আছে পৃথিবীতে ! কতটা আবোল, কতটা বালি, কতটা চন্না, কতটা মেটেল—সব বলে দাও জোনাকিগুলোকে। আর বলো মিতে, কোমরভাঙা মিতের কতখানি সর্বনাশ করলে ! হিকমপুরে কেন ছুটে গেলে তুমি ! কেউ তো জানে না হে ! এই কুকুর-খাওয়া সিটটায় বসে কী করছ এখানে। বড্ড কামেচ্ছা জাগে নাকি !

সিটটা বগলে দেবে নদীর খাঁড়ি বেয়ে হড়কাতে হড়কাতে নেমে যায় মদন দেবনাথ। সাইকেলটা বাবলাগাছের গায়ে হেলান দিয়ে রইল। হ্যান্ডেলে ঝুলছে গিটবাঁধা কাপড়ের ব্যাগ—তাতে রয়েছে একখানা আড় বাঁশি। তার এখন জলে পেচ্ছাব করতে ইচ্ছে হল। দেখতে ইচ্ছে হল চাঁদের ছায়া জলে কিভাবে পড়েছে।

অনন্ত জোনাকি। নীল আলো জ্যোৎস্নায় কেমন ফ্যাকাশে বা পানসে। জল ছুঁয়ে উড়ছে। এই চৈত্রে, এমন শুখা উষরে এত মচ্ছব কিসের ! এত জোনাকি কেন ? সামনে বৈশাখে চাক বন্ধ থাকবে। এক মাস টানা, কম কথা ! ওই একমাস কী খায়, কী খায় শিমুল, বাঁজা বউটা, কী করে ?

জ্যৈষ্ঠে কী দেবতার ফুল থাকে বৃক্ষে, লতায়, বনে, ঝোপে, আঙিনায় ? ঝড় থাকে আকাশে। মেঘ থাকে, ঝড়জল থাকে। মাটি ঝুনোট হয়, খরিয়ে ওঠে বৃষ্টির কামনায়, সোঁদাগন্ধে ভেজে কোন ফুল ? কুমোরের জীবনে ফুলের প্রশ্ন বৃথা। চাকের পুজো ধরিত্রীরই পুজো। খরানো মাটির স্তব, তাই না হে মদন ? আষাঢ়ের আগেই মাটি তুলে ফেলো, ডাঁই দাও আগুনেয়। বৈশাখে চাক বন্ধ, অপেক্ষায় রয়েছ জ্যৈষ্ঠের প্রথম শনিবারটির জন্য।

এ নদীকে মদন চেনে। কাঁখাল, কাঁধাল অর্থাৎ কুক্ষি ও স্কন্ধ চেনে। চেনে আবোলের, মেটেলের, চন্নার চুঁট। ষাঁড়ের যেমন কাঁধের উচ্চ মাংসকে চুঁট বলে সেই রকম মাটিরও চুঁট বা চুড়ো অবশ্যম্ভাবী। ভৈরবের

এ অংশ চুঁটঅলা, এ অংশ অদ্ভুত।

আবোল হল উপরের স্তর, একে বলো বোকা মাটি, এ মাটি বেজে ওঠে না, রেঙে ওঠে না। অথচ দেখতে একটু লাল অথবা গেরুয়া, পাকা কাজ এতে হয়ই না।

দানো বলল— এ দিয়ে বাজনা হয় না গো মিতে। এই ধরেন নুনের ভাঁড়টা, কাতাড়িটা, থেলেটা, চায়ের পেয়ালাটা, জলের গেলাসটা, এই পর্যন্ত। হাটে কী হয় ? মানুষ হল বাজনদার জীব, নিজে বাজে, অন্যকে বাজায়। নইলে দেখেন, কী দিয়ে কী— খোলাম কুচি দিয়ে হাঁড়ি, হাঁড়া, কোর, কলসি, কুঁজো বাজিয়ে তবে নিস্তার।

—রসের কথা বটে গো একখানা ! বলে ওঠে নাম মদন।

—চার পয়সার হাঁড়ি, বাজনা চারআনির, এক কালে এমনটিই হয়েছে। এখনও একখানা এখোগুড়ের হাঁড়া কিনতে হলে বাজনা দিয়ে তবে নেবে গেরস্ত। আমি বাজিয়ে দেখাব, তারপর সে বাজিয়ে দেখে নেবে। কেন ? কেননা...

—কেননা ?

—আপনি শিক্ষিত মানুষ মিতে গো, বাজনার কথা কী শেখাব আপনাকে। মাটির বাজনা, মাটির সুর সবাই বোঝে না। বোঝে, কিন্তু পেত্যয় নাই। সব সময় ঠকে যাওয়ার ভয়ে মরছে মানুষ। ভাবে, আমি খনখনে ফাটা জিনিস দিচ্ছি, খোলামের কেতায়, মারের কায়দায় মাটির চেরা গলাটি শোনা যাচ্ছে না।

—তাই বলুন, সেটাও হয় বুঝি।

—আহ্ মশাই, মাটি যেমন সুরে কাঁদে, বেসুরেও কাঁদে।

—কাঁদে ?

—অবাক হচ্ছেন মিতে ! কাঁদে না তো কী ?

এক বৈশাখে দুই মদনের আলাপ এমনই ভিয়েনে চলেছিল। কাজ না থাকলেই কি মানুষের কথা ফুরিয়ে যায় ? না, আরও বাড়ে। পেটে পাথর বেঁধেও দানো মদন কথা চালাতে পারে।

দানো আরও এক দফা চায়ে চুমুক দিয়ে বলল— গুমোর আছে যার বাজনা হল তার !

—বিষম কথা হে মিতে !

—তা বইকি, বিষমই হচ্ছে কথাটি। একখানি থেলো, এইটের গুমোর কোথা ! ও হল চিৎপাত, মানে চিৎপাত্র, খোলা, উদোম। এ বাজেও না, বাজাতেও হয় না। নুনের ভাঁড় কি চায়ের পেয়ালা, এদের গুমোর নেই, বাজনাও নেই। বলেন, আছে ?

—না।

—একটি একতারা কি শুধু তারে বাজে ?

—না।

—কিসে বাজে ? লাউটির গুমোরে ; ওই যে তানপুরোটি ওই নিতম্বের, কী বলব...

—বলুন !

—হাহাকার।

—সেই তো বটে, নিতম্ব, খুব একখানা বলেছেন গো !

—বা, ওইটেই পদ্মনাভি, ওইখেনে সব। যে মানুষটা বেজে ওঠে, তারও চাই গুমোর। আপনাতে আমাতে খুব হালকা সম্বন্ধ তো নয়, সুরে সুরে বাঁধা। একবেলা না দেখলে মনটা আনচান করে। তবু কি জানেন, আপনার সবখানি দেখা যায় না, আমারও না।

—খুব বেড়ে বলেছেন মিতে। অনেক কিছুই শেখা গেল আপনার কাছে। মাটি যে কাঁদে, সুরেও কাঁদে, বেসুরেও কাঁদে এমনটি কখনও শুনিনি।

—কেন শুনবেন না, যাত্রাপালায় শোনেননি, আপনাদের রবি ঠাকুর লেখেননি ?

—কী জানি... বলে নাম মদন অপাঙ্গে মিতবউয়ের মুখে স্নিগ্ধ করে চেয়ে রইল।

মিতবউ চোখের কোণে জমে ওঠা লজ্জা কাটানোর জন্য বলল—আপনি আসেন ভাল লাগে। চা খান, পান দিই মুড়ে, মাল খান না, সবই ভাল লাগে আপনার। পরামর্শ দ্যান। আপনাকে আমরা বিশ্বাস করি।

বউ মৃন্ময়ী ওরফে মিনুর কথা শুনে দানো মদন গলায় কেমন একটা অসহিষ্ণু দুর্বোধ্য স্বর করল। তারপর বলল—কথার ছিরি দ্যাখো বড়ো বাবা, বলে কিনা বিশ্বাস করি। মিতেকে কেউ বিশ্বাস করি বলে ? মিত্র থেকেই মিতে। শত্রু নাকি যে গুছিয়ে বলতে হবে বিশ্বাস করি।

নাম মদন জিভ কাটল দাঁতে। তারপর চুকচুক করল। বলল—সরল মনে বলেছে বউ। অত ধরলে চলে না। তা বড়ো বাবার কথা উঠল কেন ?

—উঠবে না, ধম্মের নামটা আপনিই আসে।

আসলে কিন্তু মিনু যে-কারণে বিশ্বাসের কথা তুলেছে, তা দানো মদনের বোঝার কথা নয়। নাম মদনের চোখের দৃষ্টিকে ভয় পেয়েছে বউটা। মদন পাল যখন বাড়িতে থাকে না, এমন সুনসান দুপুরে হঠাৎ

হাজিরা দেয় নাম মদন। শিমুল কলেজ চলে যায়, মিনু একা। নাম মদনকে সামলানো কঠিন হয়।

—এত অসভ্যতা করে বেড়ান, বিয়ে করলেই তো পারেন। এমন একটা কথা মুখের উপরই বলে ফেলেছে মৃন্ময়ী। তখন হাসতে হাসতে নাম মদন বলেছে—আপনার স্বামীভক্তি দেখে ভাল লাগল। একটু পরীক্ষা করছিলাম। ছুঁয়েছি বলে দুঃখ নেবেন না।

—পাল মশাই না থাকলে, আপনার না আসাই ভাল।

—এত করে বলবেন না। পোন তা হলে বন্ধ হয়ে যাবে। বলে তখনকার মতো চলে এসেছিল মদন দেবনাথ। পোন হল মৃৎপাত্র পোড়ানোর উনুন। তারপর সন্ধ্যার আগে হঠাৎ-ই মিনুর কাছে ছুটে গিয়ে নাম মদন মাথা নিচু করে বসেছিল চুপচাপ। অনেকক্ষণ কোনও কথা মুখ দিয়ে বার করতে পারেনি। তা দেখে মৃন্ময়ী ঠাণ্ডা গলায় বলেছে—আপনি আছেন বলেই তো আমরা আছি। এক ডালি আবোল আপনার জমি থেকেই কুড়িয়ে আনলাম।

—মিছে বলার দরকার নেই। কুড়িয়ে কেউ আনে না, কেটে আনে। ওই মাটি কাটা আর আমার গা কাটা, একই কথা। যান তো অন্যের কাঁধালে, কেমন দেয় দেখি!

মৃন্ময়ী চুপচাপ কিন্তু চাপা বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে দেখতে থাকল নাম মদনকে। কথা বলার ইচ্ছে তার হচ্ছিল না। বিস্ময় আর ভয় আর খুবই চেপে রাখা ঘৃণা একসঙ্গে মিতবউয়ের চোখে অপমানের অশ্রুতে ঝিকিয়ে উঠেছিল; তা লক্ষ করে মনে মনে আনন্দ হচ্ছিল তাঁতঅলা মদনের।

অথচ এমন কথা ছিল না। কী কথা ছিল, সেই বাগে ধেয়ে যেতে চাইছে মদনের মনটা। কান্না পাচ্ছে। এই কান্না কি সত্য? সত্যিই কি কাঁদছে মদন? নিজেকেই কি বিশ্বাস হয়। নদীর জলের কিনারে এসে ওপারে চরের দিকে চাইল সে। সমস্ত মাঠ আচ্ছন্ন করে নীল আলো। অযুত নিযুত জোনাকির তামাশা চলেছে সেখানে। জলের স্রোত ঠিক এই জায়গায় বদ্ধ হয়েছে, দামে শ্যাওলায় গাঢ় এবং গহন কালো—চাঁদ পড়েছে তাতে, জলের মুকুরে। সেই বিম্বের গায়ে পেচ্ছাব করে আরাম বোধ করল ঊনত্রিশ বছরের যুবা।

এখানে আবোলের রাঙা স্তূপ, পাশে কিনারার মধ্যস্তরের মাটির স্তূপ, তার পাশে চন্নার স্তূপ। মেটেল হল দোঁআশ এঁটেল মাটি। দামি মাটি। স্তূপটার কাছে বসে নাম মদন স্পর্শ করল মাটিকে। দ্বন্দ্বটা এই হেথায় গো যুগিপাড়ার ছেলে! এঁটেলে আর মেটেলে। চাষিতে আর কুমোরে।

হঠাৎ চোখে পড়ল কিনারে পাড়ের গুহার কাছে কী যেন পড়ে

আছে। কুমোরের ঝুপড়ি আঁচড়ানো গুহা। গুহার ওখানে ডালি আর খুপড়ি। এ নির্ঘাতি বাঁজা বউটার কাজ। এ যখন আছে, এই চৈত্রের ধূসর জ্যোৎস্নায় মিনু নিশ্চয় আসবে।

গুহার মধ্যে ঢুকে বসল নাম মদন। মদনের শিক্ষার সংস্কার আছে এই যে, গুহা এক আদিম আশ্রয়। চারপাশে পরিবৃত হিংসা, তারই বৃত্তবিন্দু হল গুহা। কথাটি কঠিন বটে, কিন্তু সহজ করা যায়। গুহা থেকে মানব-মানবী শিকারে বেরিয়ে গেলে একটা ব্যর্থ-শিকারী বাঘ এই গুহায় এসে ঢুকত। মানুষ ফিরে এলে গুহার ভিতর থেকে লাফিয়ে পড়ত আদিম-সুন্দরের স্কন্ধে। একটি নগ্ন সুন্দরীকে ছিন্নভিন্ন করা যায়। করত এককালে। আর আজ ?

এত গুহা, এত চুঁট—এভাবে নদীকে বিক্ষত করেছিস কেন রে! কেন ? কাকে বলছে নাম মদন! নদীর জন্য কান্নাকাটি কি ভাল ? নদীর জন্যই কি কাঁদছে নাকি!

দৃশ্যটা এ রকম। মিনু তার ননদকে সঙ্গে করে চৈতালি রাতে মেটেল আঁচড়ে, কুরে, খুঁটে নিতে এসেছে। কোমর-ধসা মরদটা তো পারে না। নেতানো কোমরে কেবল চাকটা ঘোরাতে পারে। দু'হাতে বল আছে, তাই দিয়ে লেইকে মর্দন করতে পারে। মাটির বুকের বোঁটা আঙুলে বাজিয়ে দেয়।

চাকের ভক্তির উপর, আসনের উপর, নারী বসেন, নাম মৃত্তিকা। তীব্র ঘূর্ণনে পাকে পাকে উঠে দাঁড়ায় নারীদেহ। চাপে চাপে বসে যায়। বোঁটায়, স্তনে, গলায়, কোমরে, নাভিতে, উরুতে, যোনি-জঙ্ঘায়, পেলব-পায়ে নেচে ওঠে মাটি; আঙুল, আঙুলের খাঁজ কী দুঃসহ শিল্পী-পুরুষের; চিরকাল কাঁদায় মৃত্তিকাকে। নারী কাঁদবে বলে জলে ভেজে, রজঃরসে স্ফীত হয়, শুয়ে পড়ে, কাত হয়, কোমর বাঁকায়, চিত হয়—সব হয়। নারী কি শুধু কামকেন্দ্র, আর কিছু নয় ?

এভাবে কেন মদন! এভাবে কেন ? নারীর জন্য এত তৃষ্ণা তোমার! গুহায় বসে শিকারির মতো চেয়ে থাকা কেন ?

কী শুনছ ? পায়ের শব্দ ? পাড়ের উপর দিয়ে হাটুরে মানুষ দু'একটি হঠাৎ-হঠাৎ চলে যায়। গুহা কেঁপে ওঠে। ওই পথিককে ভয় করে মিনুরা। নগেন পালের কান মলে টেনে তুলেছে বড় চৌধুরীর ছেলে ঘনা। বলেছে—মাটি কাটা হচ্ছে, এই শালো! ওঠ্!

—বাপ! কাটিনি গো। কুড়িয়ে নিচ্ছি! নদীর মাটির হিসেব কেন বাবা!

—নদীর মাগের মাটি শালা। ভৈরবের নাঙের মাটি! নদী নিজে

খেয়ে তোদের উগরে দেয় বুঝি ?

—বাবা গো। ছেলের বয়েসি তুমি। কানে হাত দিও না। অপমানে মরে যাব ঘনা। ছেড়ে দে।

ঘনা চলে গেলে গুহার কাছে গালে হাত রেখে ডুকরে ডুকরে কেঁদেছে নগেন। সেই ডুকরোনো শব্দে চরের চখাচখি ভয়ে ডানা ঝাপটে পালিয়েছে আকাশের দিকে। সেই ঝাপটায় নগেনও ভয় পেয়েছে। চরের মধ্যে একটা পাখি সারারাত চেঁ চেঁ করেছে কেন নগেন জানে না।

ওরা জানে না। নাম মদন ভাবে। ওরা যেন কিছুই জানে না। নদীকে যেন কখনও প্ররোচিত করে না পাড় ভাঙতে। এই গুহায় জল কি ঢোকে না বর্ষা-প্লাবনে। গুহা করে বলেই তো চুঁটঅলা জমি ভেঙে পড়ে জলের ধাক্কায়। জলের ফিসফিসানি শোননি ? ষড়যন্ত্র জান না ?

চাষির রোখ কীসে ? মাগ ছেলের চেয়ে বাড়া রোখটা কেমন শুনি ! এই মাটিকে মেটেল ধসিয়ে আলগা করে কারা। মাটির আঠা নষ্ট করে কারা ? নদীর পাড়ের মধ্যস্তর মেটেল। নীচের স্তর চন্না, কাদাকাদা, বেলে মাটির কাছাকাছি, নরম এবং কালো। এ মাটিতে কাজ হয় নগণ্য। বাটি, খুরি আর কুঁয়োর পাড় তৈরিতে চন্নার সঙ্গে মেটেলের মিশেল লাগে। অতএব মেটেল না হলে চন্নার কদর নেই, আবোলেও শুধু চলে না।

এই চৈত্রেই, এই রাতে, মিনু বৈশাখ-আষাঢ়ের জন্য মেটেল সংগ্রহ করবে। অর্থাৎ চুরি করবে। কীভাবে করবে ?

মৃন্ময়ীরা ঝোড়া আর খুপড়ি নিয়ে পথ দেখে সাবধানে খাঁড়ির তলে দ্রুত চলে আসবে। পথে কেউ নেই। যদি পথিক ওদের দেখে ফেলে, ওরা তখন বাহ্যে-পায়খানার ভান করে দু'হাতে পরনের কাপড় প্রায় কোমর পর্যন্ত তুলে জলের উপর কখনও দাবনা, কখনও হাঁটু, কখনও গোছ ডুবিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। পথিক ভাবে, পালের মেয়ে শৌচ করতে নেমেছে জলে।

মাটি কাটলে ফাঁসি কেউ দেবে না, পেয়াদা এসেও ধরবে না। কিন্তু চাষি দেখলে এবং পাড়ের জমির যদি সে মালিক হয়, খেপে যাবে মহাক্রোধে, খুন চেপে যাবে মাথায়। এমন কথাই সে বলবে যে, সেই তীব্র ধর্ষকামযুক্ত গালিগালাজ পেটের ভাত ঠেলে তুলে আনতে চাইবে গলার দিকে।

আইন দিয়ে পারে না। কারণ নদীর মাটি নেওয়ার অপরাধযোগ্য আইন নেই। কিন্তু অন্যের মাটি কোপালে অপরাধ হয় বইকি।

—কে গো ওখানে ? নদীর জলে উবু হয়ে বসা কেউ হাঁকল।

অত্যন্ত ভদ্র গলা। ছেলেটা ভাবছে, গুহার কাছে মাটিচোর ঘুঁষে গেছে। তা তো নয়ই।

ত্বরিত জবাব দিতে হয়—নাম মদন।

—ওহ্ মদনদা। তাই বলো, পাহারা দিচ্ছ বুঝি ?

—কে রে, রতন নাকি! আয় ইদিকে, দেখে যা। তোর সব ভুঁই ইয়েতে ঢুকে গেল, গব্‌ভে গেল এক হাত, তো তিনহাত গেল পালের মাগের... কী বলে...

—মুখ খারাপ করো না মদনদা।

—তা তো বলবি, কেন না ভদ্দরনোক হয়েছ কি না! তোর তো বুক ফেটে যায়, ইদিকে মুখটি ফোটে না। কেন রে! বলতে বলতে গুহা থেকে বার হয়ে আসে মদন।

তারপরই মদনের মধ্যে পাগলামি শুরু হয়। হঠাৎ সে ঝোড়া আর খুপড়ি দু'হাতে করে পাড়ের ভাঙা খাঁড়ি লাফিয়ে ডিঙিয়ে হড়কে ছুটে আসে রতনের সামনে। মেটেলের পড়ে থাকা স্তূপের চুঁটে পাজামার গিঁটবাঁধা পা ছড়ে যায়, হাতের কনুই ছড়ে যায়। পড়ে গিয়ে গাল কেটে যায়। ঠোঁট ছেঁড়ে। নোনতা রক্ত লাগে জিভে ; চন্নার ঝুরো বালি আর আবোলের নুন।

—অক্। আহ্।

—লাগল ? পড়ে গেলে ? ওঠো, ওঠো!

—না, পড়ব না! এই দ্যাখ, এই মেটেলের চুঁট, কার ? তোর না দানোর মায়ের ?

—আমার। গত বর্ষার আগে এ অঙ্গনা ঘোষের ভুঁই ছিল দাদা!

—আর এই আবোলের মুকুট-পরা কেঁড়, কার ছিল ?

—অঙ্গনার। আমার মায়ের।

—এইটে, চন্নার স্তূপ ? তোর মায়ের ? না কি হ্যাঁ ? বল শালা!

—কেন এমন করে বলছ মদনদা। অঙ্গনারই ছিল।

—তবে।

—আমি কী বলব!

—তুমিই তো বলবে, আর কে বলবে তবে! অঙ্গনা ঘোষ। বিধবা ?

—না, এ তো মূলে প্রকৃতিই নিয়েছে!

—তাই নাকি! ওহ্ শালা! ইচ্ছে করছে, তোকে ধাক্কা মেরে জলে ফেলে দিই, তারপর চুবিয়ে মেরে বলি, প্রকৃতি নিয়ে গেল। বলি ?

—এই মদনদা, গলায় এমন করে ধাক্কা দিচ্ছ কেন ? পড়ে যাব যে। আহ্। ছাড়ো।

এই সময় জলে একটা ছপছপ শব্দ হয়। নদীর ঘাটের ওই দিকটায় চোখ চলে যায়। নদীর কোথাও কোথাও এই চৈত্রে ছোট ছোট বালির চড়া জেগে উঠেছে। সেই চড়ার হিসেব বুঝে জলের অগভীরতা তাক করা যায়। জলের রঙ চিনে বালি চিকানো জলের তলার পথ বার করা যায়। এভাবে পারে যায় মানুষ। ওপারের চরে উঠে সিঁথিপথ ধরে চলে যাওয়া যায়।

নদীর তলে পথ, কিন্তু পদচিহ্ন রাখে না। স্রোতের তাড়ায় মুছে যায়। তা হলে পথটি চেনা যায় কিভাবে? ওপারের বাবলা গাছটাই হয়তো চিহ্ন অথবা আর কিছু। ওপারে ভাঙন নেই। নদী পলি ফেলে চরের সঙ্গে সমতল রেখায় সমান হতে চাইছে; পাড়ের ভাঙন শুধু এপারে। এপারে বসতি, এপারেই ভাঙন।

নাম মদন আশ্চর্য হয়ে চড়া জেগে ওঠা ওই দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে রতনের গলা ছেড়ে দেয়, তার হাতের ফাঁস শিথিল হয়ে এসেছিল।

—কে গো! অর্ধস্ফুট বিস্ময় প্রকাশ করে রতন।

—কে একটা বটে। মাছ ধরছে নাকি! উঁহু! মৈত্রদের চর থেকে আসছে মনে হচ্ছে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মদন আকাশে চাইল। মনে মনে বলল, আকাশে ওড়া চরের বালি ধীরে ধীরে বসে যাচ্ছে, চাঁদ ক্রমশ স্বচ্ছ হয়ে আসছে। চৈত্রের মৃদু হাওয়া আর জ্যোৎস্নাকে পোড়াচ্ছে জোনাকিরা। সেই রকমই মনে হল মদনের।

দু'জনই অপেক্ষায় রইল। ছপছপ শব্দ পরনের কাপড়ে জড়িয়ে যাচ্ছে নাকি! দূর থেকে হলেও অবয়ব কম জলে এপারের দিকে চলে এলে খাড়া হয়ে উঠল। একটি মেয়ে। আজ হাটবার নয়। নদীর পাড়ের পথ স্বভাবত বেশ নির্জন। সন্ধ্যার পরই প্রায় নিশুত হয়েছে। এই সুযোগটাই পালেরা নেয়। দিনের বেলা খুপড়ি চালানো ওরা বন্ধই করেছে ভয়ে। রাত্রেই ওরা মাটিকে কাটে।

—বুঝেছিস, ওপার থেকেই এল। চরে কী করছিল মেয়েটা। মাথায় কী যেন চড়ানো।

—ঝোড়া নাকি মদনদা?

—দাঁড়া, এদিকেই আসছে। কী ব্যাপার।

মদনের লুকিয়ে থাকা গুহাটার কাছে এগিয়ে এল মেয়েটা। দাঁড়িয়ে রইল। একা একা কান্না, বিরক্তি আর কষ্টের খর নিঃশ্বাস ফেলে, শ্রান্ত গলায় আপন মনে বিড়বিড় করে বকছে মেয়েটা। মদন আর রতন

খাঁড়ির জল পড়নের ঝোরা গর্তে ঢুকে পড়ার চেষ্টা করলে মৃন্ময়ী ওদের দেখতে পেল।

—কে গো তোমরা ? কী করছ ওখানে ? কথা বলো। অত্যন্ত ভয়ে মৃন্ময়ীর গলা কেঁপে ওঠে।

আর লুকনো হয় না। মদন রতনের হাত ধরে টেনে লাফ দিয়ে দিয়ে মিনুর সামনে এসে বাঘের মতো দাঁড়ায়।

দু'হাত উর্ধ্বে তুলে মাথার ঝোড়া ধরে গুহার কাছে দাঁড়িয়ে থরথর করে কাঁপছে মৃন্ময়ী। একবার দু'বার জলের পথে ভুল পা ফেলে হড়কে গভীর জলে চলে গিয়ে কপাল অবধি ডুবে গিয়েছিল। চুল ভিজে গিয়েছে। অনেকটা জল ঢুকেছে পেটে। কাপড় ভেজা। বুকের ভেজা পাতলা কাপড়ের তলে পুষ্ট বুক চাঁদের আলোয় স্পষ্ট। কাঁধের দু পাশ বেয়ে দড়ির মতন নেমেছে ভেজা শাড়ি। ব্লাউজ নেই। ফলে বাহুমূল নিরাবৃত। পিঠেও কাপড় ঠিক নেই, উপরে ঠেলে লেপ্টে লেগে রয়েছে। ফাঁসের ঝুঁটি কাঁধের উপর খাড়া এবং প্রায় চুড়ো হয়ে ঠেলে উঠতে চাইলেও ভিজে বাবুইয়ের বাসায় মতন সেঁতিয়ে আধখোলা হয়েছে।

গালে ভেজা চুল লেপ্টানো। চোখে ভয় আর কাজল। কপালে, নাকের গোড়ায়, ঠোঁটে, গলায় জলের ফোঁটা। অথচ ঠোঁট শুকনো। মদনের এখন মিনুর অধরকে ওষ্ঠ ও অধর দিয়ে উষ্ণ আর রসাল করতে তীব্র বাসনা হয়। স্নায়ুতে চরম উত্তেজনা আগুনের খড় ধরে পুড়ে যাওয়ার মতো ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে ছুটছে।

মিনুর চোখ দু'টি ক্রমশ গরিব হয়ে উঠছে, কিছু বিমর্ষ। মিনুকে সম্ভব কোনও রক্তাক্ত বিষণ্ন ধর্ষণ। এর গায়ে আচমকা হাতও দিয়েছে নাম মদন। কিন্তু আজ এই হতভাগা রতন এসে জুটল কেন ? মদন কি একা পারত না ? ওই বুকের তীব্র পুষ্টতা কি দখল করা রোগা গড়নের মদনের পক্ষে সম্ভব ? ওই শরীর কি পাহাড়ের চুড়োর মতন দুরারোহ, মদন কি পিছলে পড়ে যাবে !

দুর্ভিক্ষের মানুষের সামনে অন্নের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে মৃন্ময়ী। চোখ দু'টি গরিব। কাজল ধুয়ে মোছেনি, তবু সখীন গরিবের মতন জ্বলছে। ওকে আরও গরিব দেখাত যদি চোখে কাজল না দিত মিতবউ।

পৃথিবীতে গরিবকে ধর্ষণ করা সবচেয়ে সহজ। যে-মেয়ের চোখ গরিব তাকে ধর্ষণ কি সহজতর ? এই রকমটি মনে হয় কেন মদনের ? দৃষ্টিতে কারও পবিত্র নম্র দারিদ্র থাকে। সব সময় না হোক, কখনও বা ফুটে ওঠে অরক্ষিত নিরাবৃত দুঃখ। মদন জানে মিতবউ সেক্সি, কিন্তু

তাকে এই ধূসর জ্যোৎস্নায় এত দরিদ্র দেখাচ্ছে কেন ? মনে হচ্ছে, রতন আর সে মিলে মিনুকে ধর্ষণ করলে মিনু চেঁচাবে না।

নাম মদনের মনে হল, পৃথিবীতে একদিন একফোঁটাও দুঃখ ও দারিদ্র থাকবে না, এমনটি কল্পনা করতে ভাল লাগে এবং তখন সেই পৃথিবীতে জন্মাবে মদন। এবং তখনও এই রকমই রোগা মড়ামার্কা বাইকে করে সে দু'টি গরিব মেয়েচোখ খুঁজে বেড়াবে। কেন ? এমন কেন মনে হয় তার ? এসব ভাবতে ভাবতে মদনের প্রবল কামেচ্ছা জাগে।

শিকারির মতো আরও এক ধাপ মিনুর দিকে এগিয়ে গিয়ে ভাবে, রতনটা বিদ্যার ভারে কী আশ্চর্য নোয়ানো। বইয়ের পোকা, গ্রন্থ তাকে কি রকম শালীনতা দিয়েছে। ওর কি মিতবউকে দেখে কিছুই হচ্ছে না।

মিনুকে আক্রমণের যুক্তির অভাব নেই কোনও। কিন্তু হঠাৎ-ই রতনের সামনে এ কী করল মদন ! আক্রমণের ভঙ্গিমায় এগোলেও মিনুর মসৃণ দুই বাহুমূলে দুই হাতের বৃদ্ধ আঙুল ঠেকিয়ে খামচে ধরল সপাটে মুঠোয় ধরা কায়দায়, তারপর মিনুকে ঝাঁকাতে লাগল আর বলে চলল—খুব বাড় বেড়েছে না, ওপারে চরের মধ্যে কী হচ্ছিল। কী হচ্ছিল। কী হচ্ছিল। কী হচ্ছিল।

—নাহ্। আমি আর পারছি না রতন ! আমাকে চরের একটা দাঁড়াশ তাড়া করেছে গলা তুলে, নদীর চড়ায় সাঁতরে এসে বুকে মুখ দিত। সাপ, পক্ষী, মানুষ কে আমার আপন, বলুন মিতে বলুন। ছিঃ। এ কী করছেন। ছাড়ুন। ছাড়ুন বলছি।

হাত ও ঝোড়া টলে টলে কেঁপে কেঁপে যাচ্ছিল মৃন্ময়ীর চাপা আর্তনাদের সঙ্গে। এবং সে আর পারল না। ঝোড়া ফেলে দিল মাথা থেকে আর বলল—নিন, নিয়ে যান। নদীর বুকের চড়ার মোটা বালি জল ঠেলেও উঠোনে তোলা গেল না। মাটির এত কষ্ট মা। বলে দু'হাতে মুখ ঢেকে খাঁড়ির গুহার কাছে বসে পড়ল মৃন্ময়ী এবং ফোঁপাতে লাগল। অসম্ভব বোকা হয়ে গেল রতনেরা।

—সাপে, ওই দাঁড়াশে নারীর বুকে মুখ দেয় ?

—জানেন না ! বলে মুখ থেকে দু'হাত সরিয়ে ফুঁসে উঠল মিনু। হঠাৎ তার অশ্রু মুহূর্তের জন্য আগুন হয়ে গেল।

মাথা নিচু করল মদন। রতন বলল—শুনেছি একলা মেয়েদের কাউকে পেলে দাঁড়াশে বুকের দুধ খেয়ে যায়। লোকে বলে।

—পাকে পাকে জড়ায় রতন, তারপর খায়। হ্যাঁ গো। জানো না। বলে ঝোড়ার দিকে দেখল চেয়ে মৃন্ময়ী। আবার তার কান্না চেপে এল।

মিনুর ফোঁপানি থামিয়ে দিল বংশী মদনের বাঁশি। নইলে আরও কাঁদত বউটা। ও যখন কাঁদছে, দু'হাতে মুখ ঢাকা, তখন ওর একটি থাইয়ের ভেজা কাপড় সরে গেছে অজান্তে। ফর্সা জানুতে উড়ে এসে বসেছিল মাটির রসচোষা সাদা তেকোনা পতঙ্গ। কীট-পতঙ্গ, পাখি, সাপ, কেউ তার আপন নয়।

বাঁশিতে সতর্ক হল বউ। গ্রাম হড়হড়িয়ার বংশী মদন, বাঁশি বাজিয়ে বেড়ায়, আড়-বাঁশি। ও বাজাচ্ছিল, বনতল ফুলে ফুলে ঢাকা/নীলিমায় ওঠে চাঁদ বাঁকা। কান্না থামিয়ে মিনু তার নগ্ন জানুর অংশ ঢাকল, তারপর চেয়ে দেখল রতন ঝোড়াতে মাটি কুড়িয়ে তুলছে। জলের কিনারা থেকেও ছোট ছোট চাঁই তুলে এনে ভরে দিচ্ছে। নাম মদন নদীর ওপারে চরের দিকে চেয়ে রয়েছে।

চরে দু'খানি হ্যাজাক নেমেছে, সোনালি গমের ভুঁইতে। সারারাত গম কাটা চলবে। ওই চরে কী রকম আলো। মনটা কেমন হয়ে যায় ওই আলোর দিকে চাইলে। মনে হয়, মুনিষেরা সব অন্য কোনও পৃথিবীর মানুষ। আনন্দে হইচই করে মৈত্রদের জমির গম কেটে চলেছে। ওই চরেই রয়েছে প্রকাণ্ড দাঁড়াশ সাপটা, গলা তুলে দাঁড়িয়ে মাথা নাড়ে। মৃন্ময়ীকে তাড়া করেছিল।

মৃন্ময়ী কী করেছে ? মৈত্রদের ভুঁই কুপিয়ে ভুসো চন্না নয়, নদীর বুকে চরজাগা বালি আনতে গিয়েছিল। চড়ার বালি কাজের জন্য ভাল। ভেবেছিল, সন্ধ্যার মুখে ওপার থেকে নিয়ে আসি, রাত বাড়লে এপারের মেটেল ধসিয়ে ঝোড়া ভরবে। চক্ষুলজ্জা বলেও তো একটা কথা আছে।

তা ছাড়া চাষিদের রোখ আর ক্রোধকে এরা ভয় পায়। মাটির জন্য চাষি সব করতে পারে। হত্যা বা আত্মহত্যা, মোকদ্দমা-নালিশ সবকিছু। গত সনে মঙ্গল পালের মাথা চকজমার মুনশির বেটা খুপড়ি মেরে ফাটিয়ে দিয়েছিল। মঙ্গলের মাথা রক্তাক্ত, রক্তে চুল ভেজা। তর্ক করতে করতে হঠাৎ পাড়ের উপর থেকে তড়াক করে ঝাঁপিয়ে পড়ল মঙ্গলের কাঁধে। প্রথমে কাঁধ কামড়ে ধরল, তারপর কাঁধ ছেড়ে আচমকা মঙ্গলেরই খুপড়ি, মঙ্গলের মাথায় বসিয়ে দিল।

চাষির রক্ত ঠাণ্ডা, হঠাৎ অতর্কিতে উষ্ণ হয়ে উঠলে, কতটা গরম হয়েছে বোঝা যায় না। ভদ্রলোকের রাগ চোখেমুখে দেখা যায়, পাতলা চামড়া রক্তোচ্ছ্বাসে ভরে যায়। অধিকাংশ চাষির মুখের চামড়া পাথরের

মতো কঠিন, রাগের তরঙ্গ দেখা যায় না। চাষি খচে গেলে চোখদুটো তীব্র হয় আর রক্ত আসে চোখের ডিমে, কারও কারও চোখ মহিষের রক্তের মতো ঠাণ্ডাভাবে দড় হয়ে ওঠে। এত ধীরে সেই ঘটনা হয় যে, কুমোর সহসা বুঝতে পারে না।

মুনশির বেটার চক্ষুকে বুঝতে পারেনি মঙ্গল পাল। দড়িদড়ি চিমড়ে কালো আধমরা মঙ্গল। ট্যানা, জানুস্তম্ভ উদোম, গা খালি, পা ফাটা, খড়ি ওঠে, মাঝে মাঝে আলুর খোসার মতন শরীরে খোসা ওঠে। আর কী ? পেটে শূলের ব্যথা বলে সোডা খায়।

তা ছাড়া সে পেটের জন্য কী করে ? ঘরের কোণটিতে লাঠি মেরে অন্য ডগাটি পেটে চেপে ব্যথা দমাতে গোঙায়—পাড়াসুদ্দো লোক শোনে, পথিক শোনে মঙ্গলের হাহাকার। জানে, এ লোকটি গোঙাবে, কিন্তু মরবে না। থমকে দাঁড়ায় পথিক, গোঙানি শোনে কিছুক্ষণ, তারপর নিঃশব্দে চলে যায়।

মঙ্গলের বউ ভারি সুন্দরী। এই অবধি ভাবতে ভাবতে এসে থামল মদন। না, থামতে পারল না। সে ভাবল, কে তবে সুন্দরী নয় ? ঘর্মাক্ত চাষি বেন্টের ভাবনা চিত্তাকর্ষক। পালেদের বউরা, মেয়েরা সবাই সুন্দরী। অধিকাংশ পুরুষ খর্ব বা শীর্ণ। কালোই বেশির ভাগ। কেউ ঢ্যাঙা, কারও পেট চেরা কিসের আঘাতে। পায়ে রগের দড়ি। রগ অর্থাৎ শিরা।

বউরা রগওঠা নয়, মসৃণ, কিসের জোরে রসস্থ। শিক্ষিত ছেলে মদন কলেজে সাহিত্য পড়েছে এবং এখনও রাতজেগে উপন্যাস কবিতা পড়ে। বাংলাভাষায় ভাবপ্রকাশের ক্ষমতা ছিল। কলেজ-ম্যাগাজিনের সম্পাদক ছিল সে। 'রৌরব' পত্রিকায় তার কবিতা ছাপা হত। সে জানে ধর্ষণেচ্ছা শুধু ব্যক্তির কোনও অবদমিত আকাঙ্ক্ষার বিকৃতি নয়, ধর্ষণেচ্ছা সামাজিক প্রণালী।

পালেদের মেয়েবউ সুন্দরী, একথা কেন বলে মানুষ ? আর বলে বলেই তো, ওরা বেশি করে সুন্দরী হয়েছে। কিন্তু এরা কেউ জীবনানন্দের কবিতায় উৎপন্ন ক্ষমাহীন সুন্দরী নয়, এরা গোধূলি-মদির, সহজ। চাষির ছেলের পক্ষে এরা কিছু সান্নিধ্যে সহজ ; সেই সব গোঁয়ার যুবা, অর্ধপ্রৌঢ় শ্রমভাঙা লোক পালের উঠোনে কুল কি পেয়ারাতলায় চটিজুতো পেতে বসে অর্ধনগ্ন শরীরের কাপড়ে অন্যমনস্ক বউয়ের সঙ্গে গল্পালাপ করে যায়। তাতে কি চোখের ক্ষুধার নিবৃত্তি ঘটে ! দৃষ্টি লেহনে মেয়েবউ বিরক্তি প্রকাশ করে কচ্চিৎ। সচরাচর কেন করে না ? কারণ এইটুকু আহ্লাদ মেনে নিতে হবে। মেনে না নিলে কী ঘটতে পারে, অত

ঝুঁকি চাক সইবে না হয়তো।

মদনের মনে হল, ফোঁপাতে ফোঁপাতে মিতবউ, বাঁশি শুনতে শুনতে মৃন্ময়ী নাম মদনকে মেনে নিচ্ছে। কারণ, মদন তো বউকে দু'ফোঁটা শাসন করেছে মাত্র।

হ্যাঁ, মিতবউ। মদনের কাছে মিতবউ শব্দমুদ্রাটি জীবনের অনেকখানি। নাম মদন বাংলাভাষাকে এক অলৌকিক গড়নে নিজের কেতায় ব্যবহার করবে বলে ওই মিতবউ শব্দকে ভালবাসে। মিতবউ মানে মিতস্ত্রী অর্থাৎ কিছুটা বউ। যেমন মিতবর বা কোলপাত্র আসলে বর না হয়ে বর বা বরের ভান করে বসে থাকা বালক।

ধর্মনারায়ণ কী বলেছিলেন? বলেছিলেন—মিতবউ শুনে ভেবো না নাম মদন, ওটা আসলে তোমারও বউ! তা হয় না। হবে, যদি দানো মদন অকালে মরে। ধর্ম এ দেশে মানুষের সম্পর্ক বাতলায়। কী হবে তা হলে দুই মদনের সম্পর্ক। মিতে পাতলে তোমরা ধম্মের সামনে। সম্পর্ক হল তোদের, ধম্মের সম্পর্ক।

অথচ বড়ো বাবা আজ সন্ধ্যায় নাম মদনকে চিনতেই পারল না। পাঁচ পাঁচটা মদন, বুড়োর কুক্ষি স্মৃতি দিয়ে সামলাতে পারেনি। শোনা যায়, আরও একজোড়া মদন মিতে হয়েছে ধম্মের সামনে। কবে? মানুষে মানুষে কবে যে কী হয়!

মদন পালের বউ নিশ্চয়ই সুন্দরী। ধূসর জ্যোৎস্না আরও কিছু শীতল এবং স্বচ্ছ হয়েছে। মিনুর ঠোঁটে ভেজা জ্যোৎস্না আরও তাকে সুন্দরী করেছে। মিতবউ জানে, সে মিতস্ত্রী, কেবলমাত্র সে দানো মদনেরই বউ। আর কারও বউ হতে যাবে কেন। কিন্তু মিতবউ যে নাম মদনেরও একটুখানি বউ হতে পারে, বাংলাভাষার এই যুক্তিটা কি বোঝানো যায় না মিনুকে?

নাম মদনের মায়া হচ্ছিল বউটার উপর। তার এই হৃদয়ের আর্দ্রতা মিনু বুঝবে না। ধর্ম বলেছিল—মিতিনকে রক্ষা করা তোমার কর্তব্য নাম মদন। লক্ষ্মণ যেমন সীতাদেবীকে রক্ষা করেছিল সেই রকম। মিতিনকে দেবীজ্ঞান করবে। তবে বলতে নেই, দানো যদি অপঘাতে বা দুর্ঘটে মরে যায় আর যদি নাম মদন অবিবাহিত থাকে, তবে নামের সাথে মিনুর বিয়ে হবে। ধর্ম তোমাদের সম্পর্ক বেঁধে দিল। মৃন্ময়ী, তুমিও ভাই নাম মদনকে ভালবাসা দিও। তোমাদের ভালবাসার জয় হোক।

নাম মদন কখনও মিনুকে দেবীজ্ঞান করেনি। তার পক্ষে এমনটি সম্ভবই ছিল না। তবে ধর্মের কথা শুনতে শুনতে দানোর মুখের দিকে চেয়ে মনে হয়েছিল, মিতের মৃত্যু হলে সত্যিই কি মিনুকে বিয়ে করবে

সে ? পাগল, ধর্ম পাগলই বটে।

ভেবেছিল নাম মদন, মিতিনকে রক্ষা করা কর্তব্য, কথাটির মধ্যে যথেষ্ট ধর্মজ্ঞান রয়েছে। আবার সেই কথাটিও মিছরি-মিছরি, রসে তির্যক, মিতবউ শুনে ভেবো না নাম মদন, ওটা আসলে তোমারও বউ।

—এ সব কথা বলছেন কেন বড়ো বাবা!

—যুগের হালচাল খারাপ, মানুষ আজকাল সম্পর্কের দাম দেয় না। তা ছাড়া, মিতেকে ফেলে মিতিনকে নিয়ে ভেগে যাওয়ার ঘটনা আমার কুষ্কিতে আছে। সেই কারণে সাবধান করে দিলাম।

—ওহ্। বলে আশ্চর্য বোধ করেছিল নাম মদন। তখনই একটুখানি ঘোমটা টানা মিতবউয়ের টসটসে মুখে লজ্জার আলো পড়েছে দেখে ভারি সুন্দর লেগেছিল নাম মদনের।

সম্পর্ক পাতানো হলে মাত্র তিনজনের সেই কোলাহলহীন অনুষ্ঠানটি কিছু চিন্তায় ফেলেছিল দানো মদনকে। হঠাৎ তার মনে হয়েছিল—আমি তা হলে মরে যাব ? অথবা বউ কি তাকে ছেড়ে চলে যাবে! মৃত্যু কেন, অবিশ্বাস কেন। ধর্ম বহুদর্শী, অনেক দেখেছেন।

দানো মদন জানত, শিক্ষিত ছেলে নাম মদন কেন এই সম্বন্ধ পাতালো। দানো কি তার যুগ্যি! মোটেও না। একই পাঠশালে এবং হাইস্কুলে সহপাঠী ছিল তারা। কিন্তু দানোর পড়াশুনা ক্লাস নাইনে গিয়ে আর এগোল না। বাপ গেল অপঘাতে, তখন স্কুল ছেড়ে চাকে বসতে হল তাকে। নাম কিন্তু কলেজ ডিঙিয়ে অনার্স পেয়েছে। এই লোকের সঙ্গে ভালবাসা।

মিনুই দানোকে উৎসাহ দিয়েছে। কানে কানে বলেছে—নাম বেচারি কাঙাল গো। উঠোনে চটি পেতে বসেন, উঠতে চান না। তোমাকে মিতে মিতে করেন, সত্যিকারের ভাব পাতালে পার। এই সব লোককে বড় পিঁড়িখানা এগিয়ে দিতে হয়। কেন জানো। টানে অনটনে কাজ দেয়। একদিন কী বলেছেন জানো, মাটি নিলে আমার জমি থেকেই নেবেন মিতিন, অন্যের জমি খোঁটা ঠিক না। চাষিরা খেপে আছে।

জীবনের রোষ থেকে বাঁচার জন্যই কি ধর্মের সম্বন্ধ গড়া। মানুষ কি তাইই করে। অসহায় মানুষই তো ধর্মকে টেনে বেড়ায়। স্বার্থ ছাড়া কি দুনিয়ায় বাস্তবিকই কোনও সম্বন্ধ হয় ?

বড়ো বাবা বলেছে—ধর্মের সামনে সম্বন্ধ হল। কেউ অধর্ম করো না। নিঃস্বার্থ হও, এক ঝোড়া মাটি এনো বউ। রাঙা মাটি। আমি মন্ত্র পড়ে শুদ্ধ করব ধরিত্রীকে, তারপর ওই মাটির আলিপনা দিও উঠোনে। তারপর আসন পেতে মিতেকে বসাবে এবং পায়েস খাওয়াবে, মিঠাই

দেবে বউ, আপন হাতে তুলে গুঁজে দেবে চাঁদমুখে। ধূপকাঠি জ্বলবে, কপালে মিতের চন্দনের ফোঁটা দেবে। নিরগ্নি হবে না বাছা। ধূপচিতে আগুন রেখো। আগুন, মাটি, জল, এইই তোর জীবন মৃন্ময়ী। হে পরাৎপর, তুমি মানুষের অন্নচিন্তা দূর কর। ধর্মপ্রমাণ যা কিছু, তাইই সুন্দর। তুমি ফুলকে পুষ্পে, মাটিকে মৃত্তিকায়, সূর্যকে অন্তরীক্ষে সুন্দর করেছ। তুই মা পঞ্চতপা, আকাশে সূর্য, চারপাশে আগুন, মৃন্ময়ী তোর ভাল হোক!

—আশীর্বাদ করো বড়ো বাবা, আমার যেন পঞ্চামৃতে রুচি হয়। ভিজে গলায় প্রার্থনা করে মৃন্ময়ী।

সন্তানের জন্য এমনই সকাতর বুদ্ধিশিষ্ট প্রার্থনা দেখে ধর্ম মুদিত চোখ উন্মোচন করে এবং মন্ত্রদ্রব মৃত্তিকা অর্থাৎ মিনুর চোখে চেয়ে থাকে। তারপর শ্লথসুরে বলে—দধি দুগ্ধ ঘৃত মধু চিনি।

কুমোরের মৃৎপাত্র সজ্জিত পোনের দৃশ্য ধর্মের সামনে উঠে আসে। মৃত্তিকা পা ছড়িয়ে বসেছেন যেন। তিনি পুড়ে মরবার জন্যই যেন নদীর কূলে কূলে জেগে রয়েছেন।

ধর্মের সহসা মনে হল, এ নারী গর্ভবতী হবে না কখনও। পঞ্চামৃতে রুচি অসম্ভব। মিনুর দৃষ্টি চঞ্চল, শরীরের রেখায় প্রবল অবাধ্য কামনা সাগরের স্রোতের মতন কিনারে কিনারে মাথা কুটে মরছে। এ মেয়ে পুড়ে মরবে।

হঠাৎ-ই ধর্ম বলল—তোর আধারে শুধু ঘৃতাহুতি মা! আমাকে মাফ কর! ওহে পরাৎপর, তুমি ফুলকে পুষ্পে, মাটিকে মৃত্তিকায় রাখো না। পঞ্চমুখের জটা থেকে জলকে মর্তে প্রবাহিত করেছ। জলও নিরন্তর চঞ্চল। ভৈরব হল নদীর নাম বাছা! অধিক কী আশ্চর্য হব '

—আমার কী হবে বাবা! বলে প্রায় ডুকরে ওঠে মিনু।

ধর্ম স্বগোক্তি বা খেদোক্তি করে—মাটিকে পটিয়ে বাঁচতে হবে। সবই জানো তুমি। বিলাপ কিসের মৃন্ময়ী।

—আমাকে তুমি কত খারাপ ভেবেছ বড়ো বাবা! আমাদের মিতে কত ছোট ভাবছে মিনিকে। হায়! আমারই দোষ হল ঠাকুর!

—তুইই তো মা এদের মিতালি পাতালি!

—হ্যাঁ। এক ঝোড়া রাঙা মাটি আনব। রাঙা মাটি! মন্ত্র দিও, যেন স্বামীর বশে থাকতে পারি। বলে বাঁকা-বিস্ফারিত চোখে মিনু মিতেকে দেখে এবং কেঁদে ফেলে। আঁচল মুখে গুঁজে কান্নার চাপে ফুলে ফুলে ওঠে। উচ্ছ্বাসকে নিঃশব্দে বাঁধে তার ব্যথিত যৌবন।

চৈত্র-জ্যোৎস্নায় সেই মৃন্ময় ব্যথিত যৌবনের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে চাইল

মদন। হ্যাজাকের আলো শোঁ শোঁ করছে পরপারে, ভুঁইটার মধ্যখানে আলো ছড়ানো, যেন স্বর্গস্থান হয়েছে। ওই আলো, এই জ্যোৎস্না, ধূসর নীল জোনাকির মত্ততা সহ্য করতে পারে না নাম মদন। পারে না।

হঠাৎ তীব্র ঝাঁঝে রতনকে বলে—রেখে দে। কুড়িয়ে তুলতে হবে না। কী করছিস এই সব ? কেন রে, এত দরদ কিসের তোর। দাঁড়াশে মেয়েমানুষ খেয়েছে, এমন তো কখনও শুনিনি।

—আপনাকে তা হলে মিছে বললাম মিতে ! এত খারাপ আমরা, সত্য বলতেও জানি না। চোর ! মাটি চোর কুমোরনি, তাকে কেউ পোঁছে না, বিশ্বাসও করে না। কুমোরনি, তোর কোল কেটে খাই, শাপে শাপে মরি, নইলে মরদের কোমর ধসালি কেন কুমোরনি। বলতে বলতে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ে মৃন্ময়ী।

এমনই সময় চুঁটের উপর এসে দাঁড়ায় কুঞ্চি। ডাকে—বউদি চলে এসো। কার সঙ্গে অমন করে কথা বলছ ?

—কেউ না। চল, আসছি !

—মঙ্গল পালের ব্যথা উঠেছে বউদি। এত গোঙাচ্ছে, বাঁচেই কি না। এসো শিগগির। বলে কুঞ্চি পা চালিয়ে ফিরে যায় । একটু বাদেই মিনু পাড়ে ওঠে, ঝোড়া-খুপড়ি কিছুই নেয় না। আসলে হয় সাহস করে না, নয়তো চড়া অভিমান হয়েছে।

তা হলে নগেনের বউ কমলার সঙ্গে কখন বাড়ি ফিরে এসেছে শিমুল, তারপর বউদিকে ডাকতে এসেছে। মনে মনে নাম মদন বলল—ভাল করলি নে কুঞ্চি। আমি তোর জন্য অপেক্ষা করছিলাম। তুই আমার বোনের মতন, যদিও তোকে দেখে আজ আমার যৌনক্রোধ হয়েছে। এটি ঠিক নয়, এ অন্যায়। আমি আজ তোর সর্বনাশ করে এলাম। বিশ্বাস কর, আমি এ চাইনি। এই রাতে, আমি ভৈরবের কাঁখালকে সব সর্বনাশের কথা বলে যাব। কারণ কুমোরের মাটিকে সবই বলা যায়।

রতন বলল—তা হলে কী করব দাদা ? ঝোড়া-খুপড়ি সব এখানেই থাকবে ?

—তাই থাকবে। তুই চলে যা। আচ্ছা, আমার সিট কোথা ?

—কোথায় ফেললে আবার !

—খুঁজে দেখতে হবে। তুই চলে যা।

—মঙ্গলকে তা হলে দেখে যাই একবারটি। খুপড়ি-ঝোড়া পঞ্চায়েতে জমা দিও, নাকি ?

—সে যা হয় হবে। পালরা গিয়ে চাইলেই তো প্রধান ফেরত দিয়ে দেবে। খালি মৃদু করে বকবে। বলবে নদীর পাড় কাটো কেন। নদীর

ভাঙন ঠেকাতে হবে। নইলে বসতি গ্রাস করবে নদী। নইলে বিস্তর ক্ষতি করবে নদী। চাষির আবাদ নষ্ট হচ্ছে, আবাদি জমি চলে যাচ্ছে বছর বছর। ভাল নয়, এ তোমরা ভাল করছ না মৃন্ময়ী। পঞ্চায়েত থেকে আমরা মাটিকাটা বন্ধ করতে চাই।

—করুন, আমাদের ব্যবস্থা করে যা ইচ্ছে করুন।

—তোমাদের ব্যবস্থা কিসের!

—মাটি কোথায় পাব আমরা। কোথায় যাব! আপনি উচ্ছেদ করতে চান আমাদের!

—আহাহা, তাই কি বলেছি!

—তাইই তো বলছেন! মাটিকাটা বন্ধ হয়ে গেলে গরিব পালেরা কী খাবে!

—চাষিরা বলছে, মাটি কিনে এনে মাটির কাজ করতে।

—কেনার পয়সা কোথা। সরকার থেকে দেবেন টাকা? কেনা মাটিতে লাভ হবে না। নদীর মাটি মাগনা পাই বলে আজও টিকে আছি। সব জেনেও আপনার লোকেরা আমাদের হয়রানি করে। আমরা না কাটলেও এ মাটির পাড় ভাঙবে।

—না, ভাঙবে না। সেই কথাই তো চাষিরা বলছে। ভাঙলেও কম ভাঙবে। ওরা পাহারার লোক রেখেছে বলে গেছে নাম মদন। বলেছে, কেউ পাহারা না দিলে ওই যুগি একা দেবে। অকাট্য কথা বলে গেল ছেলেটা।

রতন কখন একা খাঁড়ি বেয়ে পায়ে পায়ে চলে গেল নদীর কিনারা বওয়া পথে। তারপর হয়তো মঙ্গলকে দেখতে গেল। এ দিকে আপন মনে একাই কথা বলে যাচ্ছিল নাম মদন। সে একা একা প্রধান ও মৃন্ময়ীর অভিনয় করছিল নারী ও পুরুষ কণ্ঠে। সে এ সব পারে। নানা রকম গলা করে একলা কথা বলে যেতে পারে নির্জনে। এই গুহার মধ্যে ঢুকে মাটিকে শোনায় মাটির মানুষের দুঃখ।

—মিতিন খুব দুঃখ পেল হে বড়ো বাবা! ওপারে হয়তো এখনও হ্যাজাকের আলোয় দাঁড়াশটা দাঁড়িয়ে মাথা দোলাচ্ছে। ইস্! ভাল কি করলাম ধর্মনারায়ণ! তুমি যেমনটি বলেছিলে, ঠিক উঠোনে রাঙা দিয়ে স্নানশুদ্ধ মৃন্ময়ী, পট্টবস্ত্রে ধূপধুনা পঞ্চদীপে মিত-বরণ করেছিল গো! মিঠাই খাইয়েছিল। উনি এমনকি আমায় গড় হয়ে এই পায়ের কাছে প্রণামও দিয়েছিলেন। মিত-বরণের অনুষ্ঠান পাল পাড়ার ছেলে বুড়ো, বালবাচ্চা, বউঝি সবাই নয়ান মেলে দেখেছে। কেউ কেউ ভেবেছিল, এ সব হল মিনির ঢঙ, বড়ই আদিখ্যেতা। আর কোনও পাঁকাল-বুড়ো

বিড়বিড় করে বলেছিল, সবই হল স্বার্থ, স্বার্থ।

নাম মদন সিট খুঁজছে, কুকুর-খাওয়া কাছিমবৎ সিটটা, বাইকের সিট। কোথায় ফেলল সে ? জলের কাছে ? চুঁটের উপর ? গুহার মাটিতে ? খুঁজতে খুঁজতে মনে হল, মনটা বড়ই কষ্ট পাচ্ছে।

ঝোড়া-খুপড়ি জলের কিনার থেকে তুলে আনে নাম মদন। হঠাৎ-ই নিজের জমির মাটি কোপাতে থাকে। তার জমিকে শেষ করে দিয়েছে মৃন্ময়ী। পাঁচ বিঘেকে আড়াই বিঘে করেছে। এই জমি সে জনার্দন জোতদারের কাছে বেচে দিতে চেয়েছিল।

জমিটুকু বেচে সে বিধবা বোন নির্মলার পুনর্বিবাহ দিতে চেয়েছিল। নিঃস্ব হয়ে, রিক্ত হয়ে, ভূমিহীন হয়ে, এমনকি এই জমির জন্যই দানো মদনের সঙ্গে তার ধর্মের সম্বন্ধ হয়েছে, জমি বেচে দিলে সেই সম্বন্ধ ছিন্ন হয়ে যাবে জেনেও মদন চেষ্টা করেছে জমি বেচে দিতে।

জনার্দন কী বলেছিল তাকে ? কোপ মেরে থেমে মনে করে মদন। কত দিন ঘোরাল তাকে, কতভাবে ! বোনের বিয়ের আগেও সে একবার গিয়েছিল জনার্দনের কাছে। তখনও নাম মদন জমি বেচতে চেয়েছিল। জনার্দন বললেন—এখন বড় ব্যস্ত আছি নাম মদন। আগে দাঁড়াও, ভেবে দেখি। পয়সার টান চলছে বাবা।

কাঁচাপাকা ভারী ভুরু জোড়া শুঁয়োপোকার মতন নড়িয়ে, অকারণ চোখ পাকিয়ে কথা বলে ছোট জোতদার জনার্দন চক্রবর্তী। বুকভর্তি কড়া কড়া লোম, সাদা ঝুরো হয়েছে একস্থানে। কোথাও কোথাও রূপোর ঝিলিক, মুখে কামানো দাড়ি দুদিনেই খোঁচ হয়ে ওঠে। কাঁধ প্রকাণ্ড, কাঁধে পিঠেও লোম। পায়ে লোম। কখনও তাকে বন্য মনে হয়।

সাদা দাঁত বার করে হাসলে বনমানুষ হাসছে বলে ভ্রম হয়। খরখরে গলা। তলার ঠোঁট একটু বাইরে ঠেলে এসে উল্টে যাওয়ার মতন স্ফুরিত, সেই অধরে খয়েরের মতন রঙ-লাগা। কেন ? পান খান বলে। পেটটাও চেতানো, চর্বিতে কঠিন।

এই লোকটার কত পয়সা। মাথার চুলে রোগ আছে। স্থানে স্থানে উঠে গিয়ে তৈলাক্ত টাকের মতন চকচক করছে, যেন কেউ খুবলে নিয়ে কোথাও ফেলে দিয়েছে। গোল গোল সেই চকচকে চামড়া ফোড়ার দাগের মতন মসৃণ। এত পয়সাও তাকে সুন্দর করেনি।

এই লোকের তেলকল, আটাকল, ধানমাড়াই কল, ট্রাক্টর, পাম্প—সব আছে। আছে তৎসহ স্কুলের চাকরি। গঞ্জে জুতোর দোকান, সারের দোকান, সবই জাঁকিয়ে চলে। এই লোকের লাল রঙের মোটর-বাইক

আছে। এই লোক ছোট কে বলেছে! গোলা আছে ধানের।

এত আছে লোকটার। এত কেন থাকে মানুষের। অথচ এই লোকটার ডাকনাম ফকির। ফকির চক্রবর্তী।

নাম মদন বলল—পয়সার বড় দরকার জ্যাঠা। আপনি উদ্ধার করুন।

—কার দরকার নেই পয়সার। সবার পয়সা লাগে বাবা। আমি বন্ধক নিই না খোকা!

—বেচব জ্যাঠা, জমি বেচে দেব। বন্ধক কেন রাখবেন। খুব শস্তা করে দেব ভাবছি। নির্মলার আর একবার বিয়ের চেষ্টা করছি। সম্বন্ধ হয় হয়, ভেঙেও যায়। এবার পাকা হয়েছে।

—তোমার একবার চাকরিও পাকা হয়েছে বলে বলেছিলে! স্কুলের চাকরি। তাই না? সেই যে ঘাসিপুর গেলে...সে বারে কী হল।

—আজ্ঞে।

—তার কী হল।

—পঞ্চাশ হাজার ডোনেশন। চল্লিশে নেমেছিল সেক্রেটারি। তা-ও হল না।

—কেন? বলে জনার্দন ঠোঁট ছুঁচলো করে মদনের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। তিনি বসেছিলেন একটি কাঁঠাল কাঠের খসখসে চেয়ারে। কাঁধে গামছা ফেলা, পইতে ভুঁড়িতে ঝুলে এক জায়গায় কিছুটা জড়ো হয়ে পাক খেয়েছে। হাতে একটা নোট বই। মাঝে মাঝে কী যেন বিড়বিড় করে হিসেব করে নিয়ে পেন্সিল দিয়ে আঁক দিচ্ছেন। যোগ বিয়োগ করছেন হয়তো। শিক্ষার্থীদের ভঙ্গিমায় কর গুনছেন, তারপর সংখ্যা বসাচ্ছেন। সেই ফাঁকে কথা শোনার সময় কানে পেন্সিলটা গুঁজে নিয়ে স্মিত হেসে চাইছেন বক্তার মুখের দিকে; যেন বক্তার কথাগুলি হিসেবের চেয়ে কম খাটো নয়।

অথচ বোঝা যাচ্ছে জনার্দনের মন হিসেব ছেড়ে অন্য প্রসঙ্গে যেতে বাধ্য নয়। আবার জনার্দন প্রশ্ন করলেন—কেন হে?

নাম মদনের চোখে জল এসে পড়তে চাইছিল। তবে হৃদয় বড়ো শুকনো, চাইলেই জল আসে না। বরং রক্ত ঝরতে চায়।

—আর কেন! সবই তো বোঝেন! হুদোয় চাকরি। দুটো ভ্যাকান্সি ছিল। সায়েন্স বা ওয়ার্ক-এডুকেশন—যে কোনও একটা নিতে পারে, কী ভাবে হবে হেডমাস্টার জানত। আর একটা পোস্টও ছিল, আর্টসের। সেকশন বেড়েছে, ওটা বোধহয় সেকেন্ড পোস্ট। লিটারেচর গ্রুপ থেকে নিতে পারে। আমার বাংলা। ফর্টি সেভেন পার্সেন্ট মার্কস আছে। তা

ছাড়া আমার এক্সট্রা কারিকুলাম আছে। ইন্টারভিউ ভাল দিয়েছিলাম। গভর্নমেন্ট নমিনি, ব্লকের সহ-সভাপতি নন্দবাবু বললেন, তোমারই ফার্স্ট-চান্স মদন। হেড-মাস্টারও তোমাকে প্রেফার করছেন। এখন টাকা জোগাড় করো!

টাকা! নাম মদন মুখ শুকনো করে বলল—কত টাকা স্যার?

—তা ধরো, হাজার পঞ্চাশ তো বটে! বলে নন্দবাবু স্কুলের মাঠে মদনের হাত ধরে টেনে নিয়ে চললেন কোনও গোপন কথা বলবার জন্য। অন্য ক্যান্ডিডেটেরা লক্ষ করছিল সহ-সভাপতির সঙ্গে মদনের গূঢ় সদ্ভাব। মদনের হয়েই গেছে, পার্টি ব্যাক করতে চাইছে, এখন শুধু টাকা জোগাড় করা।

গভর্নমেন্ট ওরফে পঞ্চায়েত নমিনি বা ব্লকের সহ-সভাপতি স্কুল-বিল্ডিংয়ের অর্ধ-নির্মিত এবং নির্মীয়মান ঘরে এনে তুললেন নাম মদনকে। ঘরটার দেওয়াল হয়েছে, ছাদ হয়নি। ফাঁকা হাঁ-করা আকাশের নীচে জামগাছটা নুয়ে এসে পড়েছে ছাদহীন ঘরটায়। গাছে একটা কালো রঙের পাখি, প্রথমে কাক মনে হলেও, পরক্ষণেই বোঝা যায়, কাক নয়। মদনের কেন যেন মনে হল, পাখিটা ভাল নয়। হঠাৎ দেখে মদন কেমন আঁতকে উঠল। কাক নয় ভেবে ওর কেন যেন ভয় করল। পাখি দেখে এই ধরনের ভয় তার কখনও হয়নি।

পঞ্চাশ হাজার টাকা একটি ভয়ঙ্কর কল্পনা। তারই ক্রিয়া ও চাপেই কি তার মধ্যে বিদঘুটে চেঁচানো আর ধাঁধোশ-গাওয়া পাখিটাকে ভীতিপ্রদ করেছে?

নন্দবাবু বললেন—যা ভাবছ তা নয়, কাক না। এই পাখিটা ধাঁধোশে থাকে, হুদো হুদো করে ডাকে!

—হুদো! হুদো! চরম বিস্মিত হয় নাম মদন। জায়গার নাম। অঞ্চল একটা। হুদো অঞ্চল। এই নাম কেন পাখির মুখে!

—হুদো হুদো শুনলে তোমার ভয় করবে। খুব খারাপ ডাক। দিনের বেলা ডাকে কম। সন্ধ্যার পরই অশ্রাব্য ওই ডাক পাড়তে থাকে। অবশ্য এ পাখিটা সেই পাখি নাও হতে পারে।

নাম মদন জানে, সত্যিই হুদো হুদো করে ডাকা একটি পাখি গ্রামবাংলায় থাকে। সেটার রঙ বোধহয় ধূসর। বা কালো ওই পাখিটাই সেই পাখি। যে ভাবে একটি হুতোশি ধাঁধোশ-লাগা স্বরে পাখি ডাকছে—হুদো!—সেই ডাক দিয়ে একটি অঞ্চলের নাম রাখে কেন মানুষ? বুকের ভেতরটা কেমন শুকিয়ে আসে মদনের।

নন্দবাবু বললেন—পাশের ঘরটারও ছাদ হয়নি।

—পাখিটাকে তাড়িয়ে দিন না !

—আপনিই চলে যাবে। তাড়াতে গেলে বাঁদরামি করে, ইতর ! তোমাকে দেখছে হে ! শোনো ! যে জন্যে এখানে আসা। ছাদ না হলে, জানলা কপাট না বসালে সেকশন বসবে কীসে !

—আজ্ঞে !

—পঞ্চাশ হাজারে হবে না, মাস-ডোনেশন কালেক্ট করতে হবে।

—আমি পারব না স্যার ! আচমকা বলে ওঠে নাম মদন।

নন্দবাবু পরনে ফুলহাতা বাংলাশার্ট আর ধুতি। পায়ে স্যান্ডেল। নীল রঙের নরম মসৃণ কাপড়ের শার্ট ইস্তিরি করা, ধুতিও ফাইন। মাথার চুল উল্টে টেনে পিছনে আঁচড়ানো, মুখ তৈলাক্ত করে কামানো, লোশনের মিষ্ট সৌরভ পাওয়া যায়। মুখে দামি জর্দার পান।

সহ-সভাপতি ঈষৎ মাত্রায় বিস্মিত হয়ে মদনের মুখে চেয়ে বললেন—পারবে না তো কী ! পারতেই হবে। আমি মানুষকে সাধারণত তুমি করে বলি না। তোমাকে বলছি। জেলার লোকাল পেপারে বিজ্ঞাপন দিয়েছি, যাতে ক্যান্ডিডেটের চাপ না বাড়ে। তোমাকে আমরা লোকালের মধ্যে ধরছি। কিন্তু ডোনেশন তো লাগবে।

—আমি কোথা থেকে পাব স্যার !

—দ্যাখো, তা হলে আমার ওপরে ব্লেম দিও না। আমি সেকেন্ড ক্যান্ডিডেট ধরছি।

—আমাকে ভাবতে দিন স্যার !

—জমি-জিরেত আছে কিছু ?

—তা আছে সামান্য। নদীর ধারে। ভাঙনে খেয়ে যাচ্ছে স্যার।

—বেচে দাও।

—তাতে কি অত টাকা হবে !

—কত করে বিঘে ? ক বিঘে সাকুল্যে ?

—পাঁচ ছিল। এখন নেই।

—আচ্ছা। আমিন দিয়ে মাপাও। আমিন দেব ?

নির্মলার মৃত স্বামীর দাদা ছোট নিমাই আমিন। চেন ফেলে যখন খাতায় হিসেব লিখে কাঠা-কালি করছে, সেই তপ্ত দুপুরে কখন মঙ্গল চুপ করে ঝোড়া-খুপড়ি নিয়ে খাঁড়ির তলায় নেমেছে। কোপ মারতেই ধরিত্রী দুলে উঠল।

সে-ও এক দুঃখের অনলে পোড়া অমোঘ চৈত্র মাস। বর্ষায় ভাঙতে ভাঙতে থেমে পড়া সুবৃহৎ কাঁধালে ফাট ধরে নদীর পথের সীমানা ছাড়িয়ে কখন অজ্ঞাতে নাম মদনের জমির একটি বড় অংশ অবধি সেই

ভাঙন-ফাট প্রসারিত হয়েছে। রবিশস্যের ঝুনো সফল ঝাড়ে সেই ফাট ছিল ঢাকা, চেন এই ফাটের উপর দিয়ে টেনে বেড়াল মদন, একটু আগে।

সেই ফাট বুকের উপর চড়তে চাইল মঙ্গল পালের। মঙ্গল দেখল মাটি দুলে উঠে তার দিকে সরে আসছে। যেন পাহাড় সরে আসছে। মঙ্গল প্রথমে বুঝতে পারে না, মাটি এ ভাবে সরে আসে কেন। অথচ চৈতন্য চমকায়, মাটিও প্রাণী বিশেষ, তার গা নড়ে ওঠে, সেও হামলায়।

হালদারপাড়ার সুখদেব গাড়োয়ান সহসা দূরের বাঁক থেকে খাঁড়ির তলায় মাটির সঙ্গে যুদ্ধ করা বেকুফ মঙ্গলকে দেখতে পায়—ওরে, বেচারি মুখ্যুটা করে কী ! সুখদেব তড়াক করে লাফিয়ে নেমে একখানি প্রকাণ্ড বাঁশ হাতে করে ছুটে আসে। হাহাকার করতে করতে পাড়ের খাঁড়ি ধরে নীচে নেমে সুবৃহৎ চাঙড়ের গায়ে বাঁশটি লাগিয়ে হেঁকে ওঠে—পালাও, সরে যাও, আহ্, করছ কী ?

মঙ্গল দু হাত দিয়ে চাঙড় ঠেকানোর চেষ্টা করছিল। চাঙড় ক্রমশ মঙ্গলের উপর চেপে এসে তলায় ফেলে মেরে ফেলতে চাইছিল। সুখদেবের হাঁকে এবং ধাক্কায় মঙ্গল নড়বড় করতে করতে সরে গেলেও এবং বাঁশের গোঁজে কিছুটা সামাল পড়লেও ঘটনা সহজ হল না।

চাঙড়ের তলায় কী করে মঙ্গলের পা দুখানি আটকে গেল। ততক্ষণে পালপাড়ার বউঝি আর পুরুষরা আর বাচ্চারা ছুটে এসেছে। সবাই ধাক্কাতে শুরু করেছে, বাঁশ দিয়ে সুখদেব ঠেলছে। মঙ্গলের বাহ্যে-পেচ্ছাব হয়ে গেল কাপড়ে, জিভ বেরিয়ে গেছে ভয়ে। ওর হাত ধরে টানছিল ওর বউ, কে একজন তাকে সরিয়ে ঠেলে হেঁচকা টান দিল দু হাত ধরে। এক সময় বিস্তর চেষ্টায় মঙ্গলের ছেঁচে ছিড়ে ছড়ে যাওয়া পা বার হয়ে এল।

তখন সেই চাঙড় গিয়ে নদীর জলে মোষের মতন ভোঁস করে ঝাঁপ দিল। মনে হল, মাটিও প্রাণী। সবই অবাক ব্যথায় দাঁড়িয়ে লক্ষ করল নাম মদন। মাটিতে সে একফোঁটা হাতও লাগাল না। স্পর্শ করতে ইচ্ছে হল না তার। এই রকম রোদের তাতে পোড়া, শুকনো মাটি আশ্চর্য করে ধসে গেল। চৈত্রে এমন ভাঙন বিশ্বাস করতে চায় না মন।

পালপাড়ার রাস্তার নিমতলায় মঙ্গলকে তুলে নিয়ে গিয়ে উপুড় করে ফেলে রাখা হল। মাথায় জল ঢালা হল, তালপাখার বাতাস দেওয়া হল, ওই দিকে আমগাছের বোলে গুটিতে তখন ঘোর গুঞ্জন করছে মৌমাছি।

ছোট নিমাই বলল—ফিরে মাপ লাগাও মদন। কুড়বা কুড়বা কুড়বা

লিজ্জে/ কাঠায় কুড়বা কাঠায় লিজ্জে। একেই বলে ভাগ্যের দোষ। সাড়ে তিন এক্ষণে সোয়া তিন হয়ে গেছে কি তারও কম। ফটিক চক্রবর্তী যখন জানবে, চৈত্রেও ধস হয়, তখন দর কতটা দিবে ভেবে দ্যাখো!

দ্বিতীয়বার জমি মাপতে মাপতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। তখনও লেংটিপরা মঙ্গল উপুড় হয়ে নিমতলায় পড়ে আছে। মদনের অন্তরে অগ্নিবৎ হিংসো উদ্গত হচ্ছে, ওই শালাটা মরে গেল না কেন!

তবে নিশ্চয়ই খুব ভাল হয়েছে যে, মেটেলের অত বড় চাঙড় তপ্ত মোষের মতো নদীর জলে ডুবে গেল! নইলে পাড়ের গা-লেগে দাঁড়িয়ে থাকলে পালেরা হামলে পড়ত শকুনের মতো। লাইন দিয়ে ঝোড়া বইত; তাদের মচ্ছব হত খুব। 'আমার গেল, তোরাও পেলি নে—খাসা একটা ব্যাপার হয়ে গেল মঙ্গল।' মনে মনে এ কথা ভেবে, ছোট নিমাইকে সঙ্গে করে নাম মদন রাতে জনার্দনের বৈঠকে উপস্থিত হল।

জমির হিসেব দাখিল করে ছোট নিমাই বলল—মাপে এক দানা গলতি নেই ঠাকুর!

জনার্দন বললেন—তোমার মাপই তো শেষ কথা নয় নিমাই। বাবা! ভগবানের মাপই আসল। পালপাড়ারই একজন এসে বলে দিয়ে গেল, চাঙড় ভেঙে পড়েছে, ফের চেন ফেলতে বলবেন।

—ফেলেছি আজ্ঞে! বলল ছোট নিমাই।

জনার্দন বললেন—আবার কালই যদি চাঙড় ধসে? শুনলাম, জমিতে আরও ফাট আছে। পালেরা মাটি কম চেনে না নিমাই। কাজ করো, তারা পালকে বেচে দাও, তারা টালির ভাঁটায় খাইয়ে দিক।

—না, জ্যাঠা। অমন বলবেন না, আপনি চাষি, আপনার দরদ আছে। তারা পাল দাম দেবে না স্যার। কেঁদে-ককিয়ে বলে ওঠে নাম মদন।

—কিনলে তারাই কিনতে পারে মদন। আমি ওই জমি কী করব, তোমার কাছে কিনে নদীকে খেতে দেব বাপ! চাষি তো চঞ্চল জমিকে ভালবাসে না খোকা। ওই জমির আগুনের খিদে, পালেদের দিয়ে দাও। অবশ্য তারাপদই কিনতে পারে। টালির ব্যবসা ধরেছে, কাঁচা টাকা আছে হাতে। ও আমার স্কুলের কলিগ, ওকে বলে দিচ্ছি।

—না জ্যাঠা! তারা পাল কিনবে না। অন্য পালেরা কিনতে দেবে না।

—ও! বলে অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন জনার্দন।

নির্মলার ভাসুর ছোট নিমাই নাম মদনের বক্তব্য সমর্থন করে যথেষ্ট

মাথা নেড়েছে। অর্থাৎ তারা পালকে পালেরা নদীর পাড়ের জমি কিনতে দেবে না, এ কথা শতকরা একশো ভাগ সত্যি। জাতের টান পালেদের তীব্র। কারণ এরা এ দিগরে সংখ্যালঘু। তারাপদ অর্থবান এবং প্রাথমিক শিক্ষক। টালির বড় ব্যবসা তারই; অন্য পালেরা গরিব, ছোট ভাঁটা চালায়। অন্যদের অন্নে মারার মতলব তারা পালের নেই।

তা ছাড়া নদী নিজেই যখন পাড় ধসিয়ে পালেদের জন্য মাটিকে ঝোড়ায় তুলে দেওয়ার বাৎসরিক ব্যবস্থা করে চলেছে, সে ক্ষেত্রে পাড়ের জমি কিনে একা সেই জমি কেটে নেবে কেন তারাপদ? চাষি মরলে তার কী? আলাদা করে নাম মদনের একার সর্বনাশ তো হচ্ছে না। হয়ই যদি তাতেই বা কী? আহাম্মক ছাড়া কোনও পাল কি এই জমি কেনে! মাগনা পেলে মানুষ নাকি আলকাতরা পর্যন্ত খায়, মাগনা জমিকে কেউ কি তা হলে বিক্রয়যোগ্য করে তুলতে চাইবে?

জনার্দন সবই জানেন। নোট বইতে বেশ খানিকক্ষণ হিসেব করে নিয়ে বললেন—জমি একটা নেশার জিনিস বাবা! কোথাও বিক্রি হচ্ছে শুনলে বুকটা ব্যথায়, আহা, নিতে পারলাম না গো! আচ্ছা, ঠিক আছে! নাম মদনের জমি দু মুখে খাচ্ছে। জলের জিভে চেটে দিচ্ছে আর আগুনের জিভ গিলছে।

—আজ্ঞে হ্যাঁ! বলে ছলছলে চোখে জনার্দনের মুখপানে চাইল নাম মদন।

জনার্দন কণ্ঠস্বরকে খানিক মলিন করে বললেন—সব জমিই নদীগর্ভে চলে যাবে ভাইপো! তুমি ভূমিহীন হয়ে যাবে বাছা!

—আজ্ঞে জ্যাঠা! তার আগে যদি চাকরিটা হয় ঠাকুর। বলতে বলতে গলার স্বর বসে গেল মদনের। জনার্দন সেই নিঃস্ব, আহত স্বর শুনে কেন যেন আনন্দ পাচ্ছিলেন।

হঠাৎ জনার্দন আপন মনে বললেন—পঞ্চায়েত ব্যবস্থা করতে পারত। জমির ভাঙন ঠেকানো দায়িত্ব। জমি না বেচে পাহারা দিয়ে রাখলে...আচ্ছা বেশ, আমি ভেবে দেখি।

—আমি পাহারা দেব জ্যাঠা, আপনি কিনুন। আমি কথা দিচ্ছি, নিজের জমি বলে পারিনি। আপনার হলে পারব।

—তা কী করে পারবে?

—সে না হয়, আপনি দেখে নেবেন! চাষিরা এখনই বলছে, আমাকেই বলে 'ওয়াচ' করতে, বলছে চাক বন্ধ করে দাও, মারো, তাড়াও, উচ্ছেদ করে দাও। পারি না, বুঝলেন!

—কেন হে?

—কী করে বোঝাব আপনাকে। দানো মদন আমার মিতে। মিনু পাল আমার মিতিন। ধর্মের সম্পর্ক করেছি। এবম্বিধ ব্যাপার আছে জ্যাঠামশাই।

—কী ব্যাপার আছে বললে ?

—এবম্বিধ।

—মানে কী।

—ইত্যাকার, নানারকম। খালি কতক বাহ্য ব্যাপার না।

—ও।

—আপনি নিন ঠাকুর। আমার উপকার হবে। বেঁচে যাব আমি।

জনার্দন শেষে কুড়ি হাজার টাকা দিতে চাইলেন নাম মদনকে। ওই প্রস্তাবে প্রসন্ন হয় না দেখে মদনকে বললেন—আমারও এবম্বিধ আছে খোকা। খালি নেশা বলে কিনছি। যাও, আর তিরিশ হাজার অন্য সোর্সে জোগাড় কর !

—কীভাবে হবে ঠাকুর।

—বরপণ নাও।

—কে দেবে ?

—কেন দেবে না ! চাকরি হবে, দেবে না ?

—কে ?

—তা-ও বলে দিতে হবে আমাকেই ? বেশ। আমি তোমাকে একটা ঘোড়া দিচ্ছি। ঘাসিপুর চলে যাবে। রাস্তা খারাপ। ডিহি ধরে যাবে, ঘোড়া না হলে পারবে না।

—আজ্ঞে !

অত্যন্ত রোগা একটি ঘোড়ায় করে পরের দিন প্রভাতে ঘাসিপুর রওনা দিল নাম মদন। জনার্দন ঘোড়ার পিঠে হাত বুলিয়ে বলে দিয়েছেন—লাকি হর্স। এর পিঠে কত বছর কেটেছে, যত জমি-জিরেত সব এর পিঠে চড়ে দখল করা, কেনাকাটা, মোকদ্দমা, সবই।

জনার্দন কি নাম মদনের সঙ্গে কোনও রসিকতা করলেন ? এমন অদ্ভুত ঘোড়া কখনও চড়ে দেখেনি মদন তন্তুবায়। হিতেন ডাক্তারের ঘোড়াকেও হার মানায় জনার্দনের পরী। মাদি ঘোড়ার একটি বেআক্কেলে নামও রেখেছেন জোতঅলা।

পিঠে চড়ার সঙ্গে সঙ্গে কেমন করে নড়ে উঠল পরী। বেঁকে পিছনে হটে চলল, যেন সে পিছনে হেঁটে যাওয়ার একটা চাল জানে। আসলে কিন্তু এই অভ্যাস একটি ব্যামো। পিছনের দু পায়ের গাঁটে গাঁটে লেগে জড়ো হয়ে কেঁপে উঠছে ঘোটকী। থরথর করে কেঁপে পিছনেই হটে

যাচ্ছে, নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না। ইচ্ছেটা যেমনটি দেখাচ্ছে তা নয়। সামনেই চলতে চায়, কিন্তু পিছনে হটছে কেমন ঘোরের মধ্যে। ওর সম্মুখ পশ্চাৎ জ্ঞান খুব অস্পষ্ট অথবা জ্বর হয় যখন-তখন। কিংবা পরীর মাথা ঘোরে।

একদল ছেলেমেয়ে পরীর কাণ্ড দেখে হইচই বাধালে, তবেই একসময় মনে করতে চেষ্টা করে, সম্মুখটা তার সামনে রয়েছে, সামাল সামাল! চলো যাই, সম্মুখে পথ। ঘাড় সটান করে পিছনে হড়কে পড়া ঠেকায় পরী সজ্ঞানে এবং মনের জোরে, বাচ্চাদের চিৎকারে এবং সওয়ারের পায়ের তলপেটে মারা চাটকিতে।

এই ঘোড়া চড়ে কোথায় চলেছে নাম মদন। পরীর গায়ে জিনের চামড়া বসানো, তারপরে রঙিন হালকা কাঁথা চকরা বকরা। চলল মদন ঘাসিপুর। জীবন তাড়না করলে এমনই অদ্ভুত ঘোড়া ভাগ্যে মেলে।

পরী দৌড় জানে না। জানে না পা পেলিয়ে দ্রুত হাঁটতে, কখনও সামান্য বেগ বাড়িয়ে ছোটে, তা হাঁটাও নয়, দৌড়নোও নয়, মাঝামাঝি একটা ব্যাপার। এই ভাবে ঘাসিপুর পৌঁছনো এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা।

পরী এনে তোলে ভবেশ মোড়লের আঙিনায়। বাবলা আঠায় আঁটা খামের চিঠি ভবেশের সামনে এগিয়ে দেয় মদন। পত্রপাঠ মেয়ে দেখায় ভবেশ। তারই মেয়ে। মেয়ের মুখে আঙুল গোঁজা, হঠাৎ ঝলক দিয়ে লালা ঝরে পড়ে বুকের কাপড়ে। কথা বলতে পারে না। কিন্তু মেয়ের চোখে নির্লজ্জ কামনা তয় হয়ে রয়েছে। মদনের চোখে চেয়ে আর দৃষ্টি ফেলে না।

আনন্দে গোঙায় মেয়ে। থুতনি নেই, উটকপালি একেই বলে কি? কিন্তু ফর্সা বেশ। চোখ আঙরা-কটা, বেড়ালের মতন শিউরোনো। কাঁধে সোনালি লোম। দু'হাতে লোম। গালের কালো জড়ুলে চুলের গুছি। দেহের গঠন কিন্তু অত্যন্ত ভাল।

নাম মদন মনে মনে ভাবল, ভালবাসতে পারলে লালাঝরা কোনও ঘৃণার বস্তু নয়। জড়ুলের চুল কেটে দেবে। হাতের লোম খুবই কি খারাপ লাগে! বোবা হলেও শরীরে কী সাংঘাতিক উদগ্র ভাষা। মদন মনে মনে নিজেকে বলল, আমি তো কামুক, নারীমাংসেই আগ্রহ, জীবনটা তা হলে চলে যাবে কোনও মতে।

সাহিত্যের প্রেম অনেক পড়েছে নাম মদন। কিন্তু মদনের প্রেম কখনও পড়েনি। পাঠকদের অভিরুচিও জানে, নায়িকা যদি বোবা হয়, তার চোখ যেন এমন খর কামে কয়রা না হয়। লালায় বুক ভিজে যায় এত কঠিন দুঃখও বোঝে না প্রায় জড়পদার্থের প্রতিমা এই কিশোরী।

এই মেয়েটার কি মন আছে মিতিন।

গ্রীবা দীর্ঘ। যেন ভাঁড়ুল ফলকে একটি শক্ত কাঠির মাথায় কেউ গুঁজে খাড়া করে রেখেছে। থুতনি থাকলে এমনটি দেখাত না।

মেয়ের হাতে সুন্দর রুমাল গোঁজা। কেন ?

বাবা বলল— মোছো মা! চিকিৎসে চলছে বাবা। লালাঝরা বন্ধ হবে। যদ্দিন না হবে, তদ্দিন আমারই দায়িত্ব। চিকিৎসের খরচ জোগাব। মোছো মা!

রুমাল দিয়ে বুক মোছে কিশোরী। মুখও মোছে কিছুটা। এই জিনিসটা শেখানো হয়েছে। বড় ভাল লাগল মদনের।

মদন বলল—টাকাটা কবে দিচ্ছেন ?

ভবেশ বলল—যেদিন চাইবে। কাল বললে কালই।

—মেয়ের নাম ?

—পরী।

নাম মদন এবার চোখ বড়ো বড়ো করে মেয়ে পরীকে দেখতে থাকল। কী আশ্চর্য, ঘোটকীর নাম পরী, কন্যের নামও পরী। কনে পরী, ঘোড়া পরী। ঘাসিপুর জায়গাটাও কী চমৎকার। জনার্দন কী গূঢ় ব্যক্তি, কী খাসা তাঁর বিষয়বুদ্ধি, কী ভাল তাঁর কৌশল।

ভবেশ মোড়ল বলল—গা-গোত্র দেখব না কারও। গরিব-দুঃখী দেখব না। দেখব মানুষের বাচ্চা কি না। অনার্স গ্র্যাজুয়েট কম কথা না। তবে বাবা, কুড়ি হাজারের বেশি দিতে পারব না। স্কুলকে বলো, চল্লিশ হাজারে কবুল করুক।

—আজ্ঞে! বলে মদন তাঁতি বাবা আর মেয়েকে অবাক হয়ে দেখতে লাগল। ভবেশ যে দর করছে, অনেকক্ষণ সে কথা বুঝতেই পারল না সে।

তা হলে ঘোড়া খেদিয়ে ফের একবার হুদো রওনা দাও। সেক্রেটারির পায়ে দণ্ডবৎ, বলো যে, দশ হাজার জোগাড় হল না।

—শরবত! বলে কেমন গোঙাল ভবেশ। মেয়েকেই যেন ধমক দিল। পরী নড়ে উঠে রেগে মুখে আঙুল পুরে চুষতে লাগল। বাড়ির কাজের খন্দ-শস্য ঝাড়া ঘোমটা টানা কামিন-বউ পরীর পাশে দাঁড়িয়ে বারবার মুখ থেকে টেনে আঙুল ছাড়ানোর চেষ্টা করতে লাগল। পরী আঙুল টেনে ফেলায় বিরক্ত হতে হতে কেঁদেই ফেলল শেষে।

—থাক, শরবত খাব না।

—সে কি হয় বাবা, খেতেই হবে তোমাকে। যাও মা পরী, নিয়ে এসো! ওরে কুসুম, ভিতরে নিয়ে যা।

মেয়ের মাকে দেখা যাচ্ছে না। মদন চেষ্টা করল ইতিউতি দিয়ে দেখার, কোনও কেউ নজরে এল না। কিছুক্ষণ বাদে করুণ-কাতর মেয়েলি একঘেঁয়ে সুর কানে আসতে লাগল বাড়ির ভিতর থেকে। সুর শুনে বোঝা যাচ্ছিল দুরারোগ্য কোনও ব্যাধির তাড়না বাড়ির কর্ত্রীকে ধরাশায়ী করে রেখেছে। বোধহয় বউটা, যে-কিনা ভবিষ্যৎ-শাশুড়ি হবে মদনের, ক্রমাগত অর্ধ-অস্পষ্ট ভাষায় নিজেরই কপালকে দুষে চলেছে।

অর্থবান ভবেশ কী রকম অর্থহীন জীবনের কষ্টে শূন্য-হাহাকারকে অন্তরে পুষছে যেন। নাম মদন ভাবল, একটুখানি দরাদরি করা ভাল। দর উঠবে। কিন্তু তার আগেই টলতে টলতে শরবত এসে গেল।

মদন বোকার মতন আগুপিছু না ভেবে কিসের তাড়সে শরবত গিলে ফেলে। তারপরই তার গা গুলিয়ে ওঠে।

নাম মদন আর বিলম্ব করে না। এক লাফে বাইরে বেরিয়ে আসে। যখন সে শরবত খাচ্ছিল, তখন কন্যে পরী 'উঁই' 'উঁই' করে আঙুল তুলে কী যেন বলছিল।

মদন শুনছে না দেখে কেমন তার চোখ দিয়ে টসটস করে জল গলে পড়ল। শরবত আর খেল না মদন।

কাচের গেলাসের গায়ে সোনালি চুল জড়ানো। চমকে উঠে তেপায়ে গেলাস রেখে উঠে দাঁড়াল মদন। পরীর চুল। শরবত নিজে করেছে বোবা মেয়েটা। এতক্ষণ মদন তা হলে কী খেল! লালা?

সমস্ত পেটভর্তি হতভাগ্য লালা এবং চুল। মদনের পেটের মধ্যে চুলের রেশম-তন্তু। মেয়েটা কাঁদে গো, মেয়েটা বড়ো কাঁদে!

ঘোটকী পরীর পিঠে চড়ে বসল নাম মদন। তার এমন বমি পাচ্ছে। দ্রুত সে এখান থেকে চলে যেতে চায়। ভবেশ নেমে এল ঘোড়ার পিছনে। তখন ঘোড়া তার কেরামতি শুরু করে দিল। ক্রমাগত নিজেকেই ঘোড়া পিছনে ঠেলছে। পিছনের দু'পায়ের গাঁটে ঠোক্কর খাচ্ছে। থরথর করে কাঁপছে। কিছুতেই সামনে এগোতে পারছে না। বমি পাচ্ছে মদনের। তার পেটের মধ্যে চুলের রেশম আর লালার মাড়। কিসের যেন মাকু চলে বেড়াচ্ছে।

মদন ভবেশকে বলল—ছেলে লাগান বাবামশাই!

—মানে?

—গাঁয়ের বাচ্চাদের ঘোড়ার পিছনে জোগাড় করে দিন। হাততালি দিক বাচ্চারা!

—তা দিচ্ছি। ওরে কে আছিস তোরা!

—হ্যাঁ, ডাকুন সবাইকে। শোর করুক, চেঁচামেচি করুক। না হলে

পরী আর যাবে না।

—খবর তা হলে পাব তো বাবা ? ওরে ! কে আছিস ! এগিয়ে আয় !

—খবর পাবেন। ফকির চক্কোবত্তি মারফত পেয়ে যাবেন।

—জনার্দন তোমার মামা-শ্বশুর হচ্ছেন বাবা মদন। আমাকে বাবামশাই বলছ, তেনাকেও সম্মান দিতে হবে।

—আজ্ঞে ! সব দেব। আগে হাততালি তো দিন।

—আমিই দেব নাকি ! বাচ্চা তো নেই।

মদন বলল—আপনিও দিতে পারেন। যে-কেউ দিতে পারে। এইটুকু বলতে বলতেই পিছনে এগিয়ে যাওয়া ঘোটকী বৈঠকখানার থামে এসে পশ্চাতে ধাক্কা খেয়ে থামল। ইটের নগ্ন নড়বড়ে গোল সরু থাম। চালা টালির। কিছু অংশে মরচে পড়া টিনের ঢাকনি। ভবেশ অর্থবান কিছুটা, ফের কাঙালও বটে। বাড়ির ভিতর ধানের গোলার চূড়াও দেখা যাচ্ছে। চূড়ায় নধর মেঘালি পায়রা হরদম ডুকরোচ্ছে, সঙ্গম করছে কিছু চড়ুই।

ধাক্কা খেল দেখে বাচ্চারা জড়ো হয়ে সত্যিই এবার আপনা থেকে হাততালি দিয়ে উঠল। তখন ঘোড়া কাঁপুনি থামিয়ে খানিকটা সিধে হল এবং মাথা নেড়ে গলার ঘন্টি বাজিয়ে এক ধাপ ফেলল সমুখে। মদন চলল ঘাসিপুরের ডিহির বাগে। গলায় আটকানো বিবমিষা।

ডিহিতে উঠেই মদন বমি করে ফেলল হড়হড় করে। পেট খোঁদল হয়ে গেল বারবার। সারা শরীর ছিঁড়ে যেতে লাগল নাম মদনের। সব তন্তু যেন উগড়ে ঠেলে বার হয়ে আসতে চাইছে।

ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে পড়তে পারলে বমি করার সুবিধা হত। কিন্তু নেমে পড়লে যদি পরী আর চলৎশক্তি না পায়, কেউ নেই মাঠে। সূর্য ঢলেছে এদিকে। কিসের উৎসাহে, কিসের করতালে চলছে জীবনটা ; এই পরীর বেঁচে থাকাটা কী বিস্ময়কর ধর্মনারায়ণ !

ঘোটকী পরীর লেজ অর্থাৎ বেলেচির রঙ সোনালি। কন্যে পরীর চুলও সোনালি। হর্সটেল মানে কখনও বা নারীচুলের দোলা। চৈত্র হাওয়ায় ঝলমল করছে ডিহির দিগন্ত। ভাবতে ভাবতে মদনের পশ্চাৎ নাচতে লাগল।

ছন্দটা চলেছে কাঠা-কালির তালে। ঘোটকী মর্দানি করে এগোচ্ছে হে। তার ক্ষুরে কুড়বা কুড়বা কুড়বা লিজ্জে/কাঠায় কুড়বা কাঠায় লিজ্জে। পশু পরী হয়ে গেল মানুষ পরী। নাম মদনের ভাল লাগছে, এক ধরনের মৌন-আনন্দও হচ্ছে তার। ওই দিকের মাঠে পলাশের আলো। জনার্দনের ভাগ্নীর পিঠটা যেন নরম করুণ কান্নার মতন

দোলায়িত। সেই ছন্দকে ছাপিয়ে ডেকে উঠল সেই পাখিটা।

—হুদো, হুদো, হুদো!

কালই তা হলে হুদোয় যাচ্ছে নাম মদন।

॥ ৩ ॥

চাকরির জন্য ছ'মাস ঘুরেছে মদন। তাঁতের কাজ বন্ধ থেকেছে দিনের পর দিন; মাঝে মাঝেই। হুদোয় গিয়ে শুনল, ইনজাংশন হয়েছে ওই পোস্ট নিয়ে, পরে শুনল, না, সে সব কিছু নয়; তফসিলি ক্যান্ডিডেটের নাম এসেছিল এক্সচেঞ্জ থেকে। সেই নাম কাটিয়ে জেনারেল বা নরম্যাল সিলেকশন করাতে সেক্রেটারিকে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হচ্ছে। কীভাবে নাম কাটানো যায় যে সব শোনার আগ্রহ মদনের না থাকলেও শুনতে হল সেক্রেটারির বৈঠকে বসে।

ডি আই-এর সঙ্গে স্কুলের পরিচালক সমিতির মন কষাকষি চলল কিছুদিন। তারপর ডাক পেল মদন। জনার্দন মদনকে চড়ে যাওয়ার জন্য পরীকে আবার দিলেন রসস্থ মুখে। এই ঘোড়ায় আর চড়েন না জোতদার, কাউকে মাগনা দিয়ে দিতে পারলেই যেন বাঁচেন।

সেক্রেটারির বৈঠক যেন হাওয়াখানা। পিলারের উপর বসানো বাড়ি। একখানাই বৃহৎ ঘর এই হাওয়াখানাটি। সিঁড়ি ভেঙে উঠতে হয়। বৈঠকের তলে গরুর খোঁয়াড়। খোঁয়াড় সামলায় ঝুলো নিবিড় গোঁফঅলা একজন লোক। থুতনিতে ডাকাতদের মতন খাঁজ। হেড-কিষেন পৈলান।

সেক্রেটারির সঙ্গে কথা বলার সময় সহসা লক্ষ করে মদন লোকটাকে। কটমট করে চেয়ে রয়েছে মদনের দিকে। হাতে প্রকাণ্ড হেঁসো। ইস্পাতের চেয়ে উজ্জ্বল, ধার যেন লকলক করছে। বাবলার বেলেটে অর্থাৎ ব্লেডে বালি ঘষে হেঁসোয় ধার দিতে দিতে পৈলান চোখে আগুন জ্বেলেছে। এত হিংস্র চোখ সচরাচর দেখা যায় না।

পৈলানের চোখে চাইতে পারে না মদন। ঘোড়া চেপে মাঠ দিয়ে আসার সময় এই লোকটাকেই দেখেছে সে। হাতে একটি ছোট তৈলাক্ত পাচন বারবার উঁচিয়ে তুলছিল মাথার উপর আর একটি পূর্ণ গর্ভবতী ছাগীকে দড়ি ধরে হিড়হিড় করে টেনে ছুটে যাচ্ছিল। পিছনে দৌড়ে ছুটে চলেছিল তেরো-চৌদ্দ বছরের বালক। নরম সুন্দর মুখখানি ছেলেটার। পরনের ইজের বারংবার পেট থেকে কোমরে নেমে আরও তলে খসে পড়তে চাইছিল।

খালি গা, নাঙা পা বালকটি ইজের সামলে ছুটে এসে গর্ভবতী ছাগীকে জড়িয়ে ধরে কেড়ে নিতে চাইছিল কতবার। পারছিল না। কেন পারবে ! বালকের গায়ে কত জোর থাকে !

ছাগীকে বুকে জড়িয়ে সুন্দর ফর্সা পিঠ পেতে দিচ্ছিল। ভেবেছিল পৈলান নিশ্চয় তাকে মারবে না। পৈলান বালককে ছাড়িয়ে ঠেলে ফেলে দিয়ে প্রথমে একবার লাথি মারে। কোঁৎ করে শব্দ করে ছিটকে পড়ে যায় ছেলেটা। তবু আব্দেরে সুরে প্রার্থনা করে—আর মুখ দেবে না কাকা ! ইবারের মতন পণ্ডে দিও না।

পণ্ড অর্থাৎ খোঁয়াড়। গর্ভবতী ছাগী পৈলানের খেত খেয়েছে। মেহনতের ফসল ছাগী খেয়ে গেলে অন্নে টান পড়বে, পৈলান কেন সইবে !

—বেশি সুর করবি তো পাঁটির গাভলা ফেলাব শালার বেটা শালা ! বলেই বালকের পিঠে পাচনের বাড়ি মারল সরোষে পৈলান। বালকের পিঠ বেঁকে গেল।

বালক জানে, পণ্ডে গেলে ছাগীকে ছাড়ানোর টাকা-পয়সা লাগবে। গরিব বিধবা মা দিতে পারবে না। মুরগির ডিম বেচা পয়সায় সরষের তেল কিনে ফেলেছে। তিন চার দিন ডিম না জমলে পণ্ডের জরিমানা জোগাড় হবে না। বালক ক্লাস সিক্সে পড়ে।

মার খেয়েও বালক আবার ঝাঁপিয়ে পড়ে ছাগীকে ধরতে। এই ছাগীও অন্য গেরস্তের কাছ থেকে পোষানি অর্থাৎ পুষ্যি নেওয়া। দুটি বাচ্চা হলে একটি তাদের হবে। জোড়া খাসি হলে হিসেব সহজ হয়। পাঁঠি আর খাসি হলে গেরস্ত খাসিটাই চাইবে। পাঁঠি নিলেও লোকসান নেই, ছাগীর বংশ বাড়বে। তিনটি বাচ্চা হলে হিসেব জটিল হয়। তৃতীয়টা খাসি হলে, বড় করে বেচে টাকার আধাআধি ভাগ হবে।

মা বলেছে, খাসি বেচে চড়াতোলা জুতো কিনে দেবে বালককে। পৈলান গাভলা করে দিলে মরা বাচ্চা বিয়োবে ছাগী। ভাবতে পারে না বালক। ছাগীর পেটের বাচ্চা স্পষ্ট নড়ে বেড়াচ্ছে। হাত দিয়ে ছোঁয়া যায়। গাভলা হল গর্ভপাত ; মেরে পেটেরই মধ্যে জীবকে নষ্ট করে দেওয়া।

—তুমি কমরেড, তুমি গাভলা করবে কেন কাকা।

—কেন করব ! কমরেডি মারিয়ে দিন চলে নাকি রে। কে কাকে দেখছে, আমার বড়শালা নমিনি মারাচ্ছে, দেখছে আমার বেকার গবাকে ! আমি এক ভাঁটা ইট দিব স্কুলকে, তাও বুলে কি, আমার গবা যুগ্যি না। কিসে যুগ্যি হয় জানি। যা শালা, হট্ !

পরীর পিঠে চড়ে মাঠ দিয়ে আসতে আসতে এই দৃশ্যের সামনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল নাম মদন।

মদনেরই চোখের সামনে ছাগীর পেটের পর্দার আড়ালে প্রাণের আন্দোলন চলছিল। একটি মাথা ঠেলে উঠেছিল। প্রসবের হয়তো আর দেরি নেই। সেই ছাগীকে মাটির উপর তুলে আছাড় মারল পৈলান ওরফে পিলু চাষি। কী বিষম আঘাতে ছাগীর গর্ভের জলের আবরণ ছড়ে গেল। ভয়ানক চেরা গলায় কেঁদে চেঁচিয়ে উঠল ছাগী। সহজে উঠে দাঁড়াতে পারল না। ছাগী বুঝতেই পারছিল না হঠাৎ এ কী হল তার!

ক্রমাগত চেঁচিয়ে অবশ হয়ে পড়ে থাকল উঁচু ভিটেটার উপর। নিষ্ঠুরতা সম্বন্ধেও কোনও উপলব্ধি নেই লোকটার। কোনও কষ্ট নেই। গর্ভ নষ্ট করা কোনও ঘটনা নয়, এমনটি কতবার করেছে পৈলান।

মাঝে মাঝে কত ছাগীরই 'গাভলা' হয়ে যায়; মরা বাচ্চা বিয়োতে বাধ্য হয় ছাগীরা। মৃতবৎসা কাঁদে। মদন তো স্বাভাবিক এই হিংসার মধ্যেই মানুষ। গ্রাম এই রকমই হুদো পাখির দেশ, এই রকম মৃতবৎসার ধরিত্রী আর এই রকম কমরেড পৈলানের জায়গা।

—ওঠ্ মাগি! বলে ছাগীর গলার দড়ি অর্থাৎ গলতানি ধরে টানে পৈলান। ছাগী আর উঠতে পারছে না। এখন কি পৈলানকে হঠকারী আহামক বলে মনে হচ্ছে? মুখটা কি কিঞ্চিৎ অধিক ছুঁচলো দেখাচ্ছে। থুতনির খাঁজে কী একটা হলুদ ফুলের পাপড়ির রেণু লেগে রয়েছে লোকটার!

মাগি আর উঠবে কি! ওর হয়ে গেছে। সমস্ত শরীর সামনে পিছনে দুলে দুলে ধোঁকাচ্ছে। ছাগীর গলায় ক্ষুদ্র বাঁটের মতন নুড়নুড়ি ঝুলছে। যেন ছাগীর অলঙ্কার। দুগালের নীচের কিনারে থুতনির তলায় যেন দুটি দুল। কী সুন্দরী এই জীবটা! গায়ে যেন পয়সা-ফুলের চাকা।

পগুে ঢোকানোর আগে ছাগীকে টেনে হিঁচড়ে যখন পারল না পৈলান, তখন সে দুই বাহুতে উঠাল গাভলা পড়া গর্ভিনীকে। পেটের তিনটি মরা বাচ্চা, সদ্য যারা মরে গেছে, মরে গর্ভ-বারিধিতে ভাসছে, তাদের একটি রঙিন লোমশ করুণ চামড়ায় ঢেকে যেন পৈলান গোপনে চলেছে খোঁয়াড়ে। পিছু পিছু সুর করা কাঁদুনে বালক, ইজের খুলে পড়া বালক।

মাঝে মাঝে গুমরে গুমরে কাঁদছে ছাগীর চেরা গলা। দুই বাহুতে বসে সে তার জন্মের পৃথিবীকে দেখছে। সে অনুভব করতে চাইছে পেটের সন্তানকে। পেটের জলের বিছানা ছিন্ন হয়ে গেছে। ছাগীর পুষ্পিত যোনি-পরাগের পথে নিঃসৃত হচ্ছে প্রাণের শুচিময় রস। সেই

রসে ভিজে যাচ্ছে পৈলানের লোমশ হাত, পায়ের আঙুল আর ধূলা।

মদন মনে মনে বলল—ছাগলে কী না খায়। এবং তারপর বলল—সব খেও, চাষির মেহনতের ফসল খেও না। ওই তো তোর মরা বাচ্চার মুখটা দেখতে পাচ্ছি রে পাখরি! কেন দেখতে পাচ্ছি? আমাকেই কেন দেখতে হবে এই সব?

পিলু পিলু বলে লেজ নাচিয়ে একটি পাখি ডাকছে বিলের ভাসমান পানার আসনে, ঠোঁটে ধরা ছিল একটু আগেই সাদা কুচো মাছ। খেয়ে গায়ে জল ছিটিয়ে এখন হৃষ্টসুর ছাড়ছে। পৈলান শুনতে পাচ্ছে না। শোনে না পৈলান চাষি।

সেক্রেটারির বাড়ির বালাখানার সামনে শক্ত উঁচু মাটিতে নামিয়ে রাখল ছাগীকে, তারপর খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে কোমর সিধে করে দম নিল। বালকটি তখনও কাঁদছে। জীবকে খোঁয়াড়ে ভরার এক ধরনের আনন্দও তো আছে, গাভলা হয়েও ছাগীকে সেখানে ঢুকতে হবে।

মাটিতে রস ঝরে পড়ে শুকনো তাতালো মাটি ভিজে গেল। গলায় দড়ি পড়ল ছাগীর। তারপর পৈলান বেলেটে বালি দিয়ে প্রকাণ্ড হেঁসো শান দিতে শুরু করল, তার মুখে কোনও পাপ নেই। শরীরে শুধু ঘাম। কপালে ঘাম। থুতনিতে পরাগের দাগ। ভুরুতে একটি পাপড়ি লেগে। ঘেমো পিঠে হলুদ ফুলের কুঁড়ি। অড়হরের পাতার ঘ্রাণ।

হেঁসো ঝিলিক দিয়ে প্রবল হিংসায় চমকে উঠছে ক্রমান্বয়ে। কুচি কুচি আগুনের দিকে চেয়ে থেকে নাম মদন সেক্রেটারি-সমাচার শুনে চলেছে। সে দেখছে বালি আর বাবলার কাঠে ঘষালাগা আশ্চর্য হিংস্র আগুন এবং হুদোর বাচ্চারা আশ্চর্য ঘোড়াটিকে দেখছে। একটা বাচ্চা পাটকাঠি দিয়ে ঘোড়ার পশ্চাতে কাঠি দেবার চেষ্টা করছে। পরীর কাতুকুতু নেই, তার নামানো ঘাড় লতপত করছে, চোখে পিচুটি আর দার্শনিকের নিরাসক্তি। কাঁধের কাছে ছালওঠা ঘা, মাছি বসে। ওই ঘায়ে মদন ঢোল কোম্পানির মলম লাগিয়েছে, আমছালের আঠার মতো গাঢ় গোলাপি রঙ।

গবা হল মদনের প্রতিদ্বন্দ্বী ক্যান্ডিডেট। গবার বাপ পৈলান চাকরির ডোনেশন বাবদ স্কুলকে প্রকাণ্ড একভাঁটা ইট আর পাঁচটা কাঠাল গাছের তক্তা দিতে চায়। সেক্রেটারির হেড-কিষেন বটে, তবে তার কাজ পার্টটাইম, কাজ বাদে সে স্বাধীন জমি-জিরেত করে। জমি-জিরেত সামলে কমরেডি করে বেড়ায়। ঝাণ্ডা সম্পর্কে অশেষ শ্রদ্ধা। পার্টি-অফিসের নেড়া ছাদে দাঁড়িয়ে স্লোগান হাঁকলে নাকি দুর্বল ছাগীর গর্ভপাত পর্যন্ত হয়ে যায়, এমন একটা প্রসিদ্ধ হাঁকের কথাও শোনা গেল

সেক্রেটারির এখানে বসে থাকতে থাকতে।

—গবা কে ?

—নন্দবাবুর দূর-সম্পর্কের ভাগনে।

মদন মনে মনে ভাবল, এটিই তবে গবার এক্সট্রা কারিকুলাম।

—আমার কী হবে স্যার ?

—হবে। তোমারই হবে।

—দশ হাজার আমি আর জোগাড় করতে পারিনি স্যার।

—তবু কনসিডার করব আমরা। তবে তিনদিনের মধ্যে হার্ডক্যাশ কোমরের জালিতে বেঁধে আসা চাই। আমরা পৈলানকে ভয় পাচ্ছি। বললেন নন্দবাবু।

—আমার তো জালি নেই স্যার।

—আহা! নেই যখন, খুঁতিতে বেঁধেই এনো। পারবে তো ?

—খুঁতি!

—পাতলা চট বা পুরু ; যা হোক। ঘোড়া কেমন চলে ?

—চলে না স্যার, চালাতে হয়। ইন্‌স্পিরেশন দিতে হয়, একটু এনথু। এনারজেটিক ঘোড়া তো নয়। তা ছাড়া মাদি।

—ইন্‌স্পিরেশন কী রকম ?

—এই আপনার, 'বাচ্চা লোগ তালি লাগাও' ধরনের। একটু বাদেই দেখতে পাবেন।

—ও, আচ্ছা, ইন্টারেস্টিং। তুমি কি তা হলে ঘোড়া করেই যাবে আসবে—মানে অ্যাবজরভড হয়ে গেলে, মানে আফটার ইয়ে...

—চাকরিতে ঘুঁষে যাওয়ার পর, বলছেন ? না স্যার। তখন তো বাবার সাইকেলে করে যাব আসব।

—ঘুঁষে যাওয়া শব্দটা একটু অশুদ্ধ মদন। তা যাই হোক, বলছি কি, পাকা রাস্তার পর স্কুল পর্যন্ত অনেকটা পথ কাঁচা। বর্ষায় কী করবে ?

—আমার বাইক আলাদা। মাডগার্ড নেই, কাদা ধরে না।

—ধরবে।

—ধরবে ?

—হ্যাঁ, এঁটেল মাটি তো! ন্যাড় হয় খুব।

—ন্যাড়, এটাও অশুদ্ধ স্যার! আচ্ছা, আপনাদের এখানে চন্না, মানে ধরুন চন্দন মাটি হয় না ?

—না, সব কালো। আঠা খুব।

—আপনাদের সঙ্গে আমার তা হলে বেশ প্রেম হবে একটি। টাকাপয়সা হাতের ময়লা স্যার! কিছু না।

—আমরা চাই আদর্শ শিক্ষক।

—হ্যাঁ স্যার।

—মন দিয়ে পড়াবে। টিউশনির ব্যবসা এ দিকেও চালু হয়েছে। ওই জিনিসটা ভাল নয়।

—না স্যার, ভাল নয়।

—স্কুলে পলিটিক্স করবে না। তবে মেম্বার হলে ওই...

—হ্যাঁ স্যার।

—ভোট দিলে...

—হ্যাঁ স্যার। তা ছাড়া আমি স্যার নিরপেক্ষ।

—আমি নিরপেক্ষতা পছন্দ করি। তবে নিরপেক্ষতা বলে কিছু হয় না। সপক্ষের শক্তি আর বিপক্ষের শক্তি, দুটি শিবির। তাই না ?

—হ্যাঁ স্যার। শিবির কথাটাও ভুল স্যার। কারণ আপনি তো অজাতশত্রু।

—হেঁ হেঁ। তবু...

—আজ উঠি স্যার।

—সাবধানে যেও। আমরা ভয় পাচ্ছি তো। চাকরি বলতে তো এই স্কুল, গাঁয়ে আর তো কোনও চুষিকাঠি নেই বেকার ভাইদের জন্য। আমাদের হল লোকাল ব্যাপার।

—গাঁয়ে 'লোকাল' ব্যাপারটা এখনও খুব ইম্পর্টেন্ট স্যার। এ দেশে সব কিছুরই লোকালাইজেশন হয়। লোকালিজম রক্তের মতো খাঁটি জিনিস। আর হয় স্যার লুম্পেনাইজেশন। ভাল।

—কী ভাল ?

—ডিসফিগারেশন অফ লাইফ। কানা ভেঙে ফেলা। বিভূতিভূষণেরও লোকালিজম ছিল। যেমন নিশিন্দিপুর।

—মানে কী ? বাংলা করে বলো। সাহিত্য-ফাহিত্য অত বুঝি না।

—বাংলাটা আরও কঠিন স্যার।

—তাইই বলো শুনি ; বাংলার টিচার তুমি।

—হইনি।

—হবে, হবে। তোমারও লোকালাইজেশন হবে।

—হ্যাঁ স্যার। হয়েই গেছে। আমি স্যার বলতে পারি না, 'আই শাই ফর দ্য অ্যালবিয়ান ডিসট্যান্ট শোর।' আমি টেমসের তীরে বসে কবিতা লেখার কথা ভাবি না। আমি ভাবি ভৈরব গুমানির কথা। এই দীর্ঘশ্বাস ফেলি মেটেলের জন্য।

—কবিতাও লেখ তুমি, স্বাভাবিক। মেটেল কী ?

—ওটা এঁটেল হবে স্যার। বর্ণ-বিপর্যয় হয় আমার। যেমন রিকশাকে আমি রিস্‌কা বলি।

—ও, আচ্ছা। ইন্টারেস্টিং। তা হলে তোমারও লুম্পেনাইজেশন হবে।

—হ্যাঁ, স্যার। আমারও টাডা হবে। মানে হল গিয়ে, আমি লুম্পেন।

—লুম্পেন !!!

—হ্যাঁ। লুম্পেন প্রোলেটারিয়েট, কিন্তু কাওয়ার্ড।

—তাই বলো, আমরা কিন্তু পৈলানকে ভয় পাই। তোমার প্রতি সমীহ্ হচ্ছে এখন।

—জানি। আচ্ছা, চলি স্যার !

—চলি বলতে নেই। বলো, আসি।

—হুদো, হুদো, হুদো !

চমকে উঠল মদন। তারপর বলল—শুনে মনে হল স্যার। পাখিটা দুগ্গা, দুগ্গা, দুগ্গা বলছে।

—আসতে বলছে।

—হ্যাঁ স্যার। বলছে, আয় তোকে খাই।

হতভম্ব হয়ে গেছেন সেক্রেটারি। নন্দবাবুর মুখ ছুঁচলো হয়ে গেছে। কী বলবেন ভেবে না পেয়ে একদণ্ড পর বলে উঠলেন —ছিঃ। অমন করে বলতে নেই মদন। বালাই ষাট।

— তা নেই, তবু বলছি। আপনি আমাকে পছন্দের কথা শুধালেন ইন্টারভিউতে। নাকি ?

— হ্যাঁ।

— আমার পছন্দ দুর্বোধ্যতা।

— কী সর্বনাশ !

— হ্যাঁ স্যার। ফুলের মধ্যে বকফুল। তা দিয়ে সুন্দর বড়া হয়।

— তা-ও হয় নাকি ?

— হতে পারে। মে বি। তবে ফুলের নিশ্চয়ই বড়া হয়। বকফুলের না হতে পারে। খেয়েছেন ?

— না।

— মিতিন আমাকে খাইয়েছে।

— কে ?

— আমার জন্ম-জন্মান্তর স্যার !

— বিয়ে করছ যাকে ?

— পরী ? যাক গে। আসি তা হলে। কথা হল ডিসফিগারেশন অফ লাইফ ইজ এ সোস্যাল প্রসেস। প্রসেস মেক্স্ এ ম্যান।

— বাংলা ?

— মানুষের বিকৃতিকরণ। জৈবে এবং যৌনে। চাকায় আর চাকে, বুঝলেন ?

— বুঝলাম না। মাথার উপর দিয়ে চলে গেল হে!

— যায়। আমারও যাচ্ছে। আমিই কি বুঝি। যথা...

— যথা ?

— যথা, মেরেছ কলসির কানা, তাই বলে কি প্রেম দেব না ?

— ইস্।

— কলসির কানা আর প্রেম মিলল কী করে ? কবি মেলালেন বলেই তো ! কিসে আর কিসে, তামা আর সিসে। তাই না ?

— হ্যাঁ।

— তা হলে, দুর্বোধ্য, অথচ বুঝতে পারলেন।

— পারলাম।

— কেন পারলেন ? না, আপনিও দুর্বোধ্যতা ভালবাসেন।

— ঠিক তাই কী ?

— কতকটা তাই। যেমন হেঁসো আর ফেঁসো।

— কী বলছ তুমি ? পাগল নাকি ?

— আপনি ভয় পাচ্ছেন পৈলানকে, আমি বলছি, আপনারা পাগল।

— না, না, ভয় পেতেই পারি।

— দুর্বোধ্য।

— তোমাকে সব বলা যাবে না।

— অথচ বুঝতে পারছি। ফলত দুর্বোধ্যতা এক ধরনের বর্ম।

— বর্ম ? আশ্চর্য ! এক্ষেত্রে বর্ম, ঢাল, তলোয়ার —এসব আসছে কেন ?

— হেঁসো আসছে বলে।

— খুবই ভয় পেয়েছে ছেলেটা, তাই না সেক্রেটারি ! হেঁ হেঁ। যাও, সাবধানে যেও বাছা। আমরা তোমার জন্য অপেক্ষা করব। খুঁতি ভর্তি টাকা এনো।

— কিছু মনে করবেন না স্যার। অনুগ্রহ করে একটু হাততালি দেবেন। বলে নাম মদন সিঁড়ি ভেঙে মাটিতে নেমে দেখল বেলেটের কাছে পৈলান নেই।

নীচে থেকে গলা চড়িয়ে মদন বলল —ছাগ-নন্দিনী উদরে বিকৃত

হয়ে মরেছে স্যার। এত বড় দুর্বোধ্য কিছু হয় না। চলি। বলে পরীর পিঠে লাফিয়ে চড়ে নিজে নাম মদন তুড়ি বাজাতে লাগল দু'হাতে। পরীর পেটে পায়ের চাটকি মারল সজোরে।

ক্ষেত্রফল বিষয়ক শুভংকরী আর্যার ছন্দ প্রয়োগে চলেছে নাম মদনের পরী। ক্ষুর করে কুড়বা কুড়বা। ক্ষুর অতঃপর কুড়বা লিজ্জে। তারপর সামান্য তেজে কাঠায় কুড়বা কাঠায় লিজ্জে। এভাবে যেতে যেতে যেতে যেতে কোথায় চলল নাম মদন ? মাত্র হাতে তিনদিন সময়। কাঠায় কাঠায় ধুল পরিমাণ। গেল মাত্র পাঁচশো বিঘত এবং দু'মাইল তমাল খর্জুর বীথি, তাল, পাকুড়, আম, বহেড়া, দেবদার...

তারপর শুরু হল মহানিবিড় পাটশস্য শাসিত নীলিমা প্রাপ্ত সরু সরণি। দু'পাশে পাট। যে দেখেনি সে কুত্রাপি বুঝবে না নিবিড় শব্দের মহিমা, পাট বিশেষ উচ্চ, বিশেষ সবুজ, পথ বাস্তবিক সংকীর্ণ, ঘোড়া টেরে গেলে পাটে ঢুকে জড়াবে আর মুক্তি হবে কঠিন।

নাম মদনের ভয় করছিল। অতি বিস্তৃত পাটরাজি। পাটমধ্যে অধিকাংশই তোষা, কিন্তু তদ্ভিন্ন মেছেতাও কিছু রহিয়াছে। পাটের মাথায় মাথায় পাতায় পাতায় মিশামিশি হইয়া অনন্ত ভূক্ষেত্র চলিয়াছে। যেন বা বিচ্ছেদশূন্য ; এইরূপ পল্লবের অনন্ত সমুদ্র। ক্রোশের পর ক্রোশ ; পবনে তরঙ্গের উপরে তরঙ্গ বিক্ষিপ্ত করিতে করিতে চলিয়াছে। নীচে মধ্যবর্তী শীর্ণ পথ। মধ্যাহ্নের আলো অস্ফুট নহে, কিন্তু ভয়ানক। তাহার ভিতরে কখনও মনুষ্য যায় না বলিলে ভুল হয়। পাতার মর্মর বলিতে বাতাসে হেলিয়া শাঁই শাঁই ব্যতীত অন্যবিধ শব্দ উৎপন্ন হয় না, কেবলি ঘুঘু ডাক পাড়িতে থাকে এবং বন্য পশুপক্ষীর আরও দু'একটি কখনও ডাকিয়া উঠে।

এই পাটমধ্যে কিছু স্থান ফাঁকা পড়িয়া লুকাইয়া থাকে, সেস্থানে নারীরা বাহ্যে করিয়া যায় ; গাড়ু বা বদনা হাতে ঝুলাইয়া আসে। পথিক একা সন্ধান পাইলে বলাৎকার করে। মদনের মনে হল, নারী পাইলে ভাল হইত। নারীকে লইয়া সে জন্মজন্মান্তর খেলা করিতে পারিত।

চাকুরি হইলে সব হইবে। ভাবিয়া নাম মদন আপন মনে কহিল— আমার মনস্কাম কি সিদ্ধ হইবে না, হে ঠাকুর। বলিয়া সে পাটমধ্যে পবনের আলোড়ন দেখিল। তারপর সবই নিস্তব্ধে ডুবিয়া গেল, তখন কে বলিবে যে, এ পাটমধ্যে অশ্ব ও মনুষ্যশব্দ শুনা গিয়াছিল ?

পরী হঠাৎ থামিল। পরী আবার চলিতে লাগিল। কাহাকেও করতাল বাজাইতে হইল না।

— মনস্কাম কি পূর্ণ হইবে না ? দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার বলিয়া উঠিল

নাম মদন।

তখন কেহ পাটমধ্য হইতে জাগিল। দেবতাই বুঝি হইবে ; পাটমধ্যে পতিত ছিন্ন মেঘচ্ছায়া হইয়া সরিয়া যাইতে যাইতে কহিল— তোমার পণ কী ?

নাম মদন অবশ্যই বলিল —বরপণ।

— তুচ্ছ। ইচ্ছা করিলে যে কেহ উহা পাইতে পারে। উহা মানুষকে গছাইয়া দেওয়া হয়।

— আর কী দিব ? আর কী আছে ? তা হলে জমি।

— জমি তুচ্ছতর, উহা সহজেই ধসিয়া যায়।

— তাহা অপেক্ষা আর কী আছে আমার ?

তখন উত্তর হইল— অণ্ডকোষ।

সম্মুখে দৃপ্ত ভয়াল অযুত কিরণময়, তীব্র— হেঁসো বাহির হইল। পৈলান হেঁকে উঠল— শালা বাঁচতে চাস তো ই হুদোয় আসিস না।

নাম মদন পরীর পিঠ থেকে কাঁপতে কাঁপতে পড়ে গিয়ে বলল— আমাকে মেরো না গো দাদা। আমি গরিব।

মদন তন্তুবায় জোড় হাত করে কেতরে পড়ে রইল সংকীর্ণ পথের মাটিতে। পৈলানরা বস্তুত আল ঠেলাঠেলি করা লোক, পগার কাটা লোক। আল ঠেলা হয় কিভাবে ? লাঙলের ফলা দিয়ে মাপকরা আল উপড়ে ফেলে আধ বিঘত ঢোকানো হল পাশের জমিতে। প্রতি সন চেষ্টা থাকে আধ বিঘত, সিকি বিঘত প্রতিবেশীর জমিতে ঢোকা, যদি সে সহোদর ভাই হয়, তা-ও জমি গ্রাস করার এ প্রবৃত্তি কমে না। তখন ভাইয়ের রোখ হয়, ভাই বলে, আয় পিলু তোর ডবডবি ফাঁসিয়ে দিই। অর্থাৎ হেঁসো মেরে পেট কাটি।

গাঁয়ে এভাবে পেট ফাঁসানোর ঘটনা আশ্চর্যের নয়। অন্যায় দখলদারি অনেক চাষিরই রক্তের নেশা। অন্যের জমি, অন্যের মেয়ে, বউ দখল করাও আদি আধিপত্যের নিদর্শন ; আদিম আনন্দ, এ থেকে নিস্তার কোথা। আল ঠেলে না এমন চাষি কম, অন্যে ঠেলে আসবে ভেবেও নিজের আল অন্যের দিকে ঠেলে বাঁচতে হয় চাষিকে।

হিংসার প্রয়োগই জীবন। হিংসাই প্রতিরোধ। হিংসা ঢাল এবং তরবারি। আল হল অধিকারের সীমা ; সীমা রক্ষা এবং সম্ভব হলে সীমা বাড়ানোই সংগ্রাম। কিনে বা ঠেলে।

হেঁসোটা মদনের পেটে নেমে এলেও হুদোয় খুব একটা বিচিত্র হবে না। নাম মদন পৈলান নামক জীবেদের এক রত্তি, এক ধুল বিশ্বাস করে না, এক কাটিম সুতোও বিশ্বাসে জড়ায় না জীবন।

মদনের অকস্মাৎ মনে হল, এ লোক যদি তাকে কেটে ফেলে, এই অনন্ত পাটরাজির নিস্তব্ধে কী এমন আলোড়ন হবে! আকাশচুম্বী চিৎকারেও গলবে না প্রকৃতির দেবতা। চিৎকারে আকাশ চুম্বনের অত বৃহৎ জিহ্বা, মুখ-বিবর ও হাঁ নেই মদনের। সে ক্ষুদ্র।

যৌন-আক্রমণই এ লোকের ভাষাদোষ এবং তেজ। বিকৃতকামী যৌনতা-দুষ্ট ভাষাকে এরা মর্দানি রূপে প্রয়োগে কুশল। হেঁসো অস্ত্র, ভাষা শস্ত্র।

— আমার চাকরি দরকার পিলু!

— গবার দরকার নাই? এ চাকলায় আসবি তো 'বগলি-ঠাপ' খাবি। এতকাল কমরেডি মারাচ্ছি কেনে রে।

অবধিহীন বিস্ময় আর অভাবিত যাতনায় কুঁকড়ে গেল মদন। এক আশ্চর্য ঘৃণা গরলের মতো ভরে গেল আর ভয় হল তীব্রতর। পৈলান মদনের দেহে বিকৃতকাম চরিতার্থ করতে চাইছে, শরীরে কুকুরের বমি মাখিয়ে দিচ্ছে লোকটা। পরীর লালাকে এখন অনেকটাই সুন্দর মনে হচ্ছিল মদনের।

চোখ ধাঁধিয়ে গেল ছটায়। আকাশ থেকে যেন হিংসার সৌর-কিরণ পোড়াতে থাকল নাম মদনকে। সে একটু একটু পাগল হয়ে যেতে লাগল। কান্না পাচ্ছিল তার। মিতিনের মুখটা মনে পড়ছিল। মা আর নির্মলার মুখও। ঝলমল করছে হেঁসো। এখন তার তাঁতের রেশম মনে পড়ছে।

সে তার শরীরের ভিতরে ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। একটি শিক্ষিত বেকার যুবাকে মানুষের মুখের ভাষা যেভাবে অপমানে ভাঙে, যেভাবে নোয়ায়, হীন করে, তা কোনও তন্তু-গহ্বরে জমা হয় নিশ্চয়। এখন নাম মদনের গহ্বরে ঢুকে আত্মরক্ষার ইচ্ছে হয়। সে আর হুদোয় আসবে কী করে?

ভয় দেখায় পৈলান, কিন্তু ভয়ই কি দেখায় শুধু? কী নির্দয় ওই মুখ, কী বিকৃত! কী কঠিন জিঘাংসা শাণিত। কোনও আর প্রতিবাদ না করে মদন মাটিতে পড়ে ঠকঠক করে কাঁপতে থাকে। যেন সে বাস্তবিকই কদর্যভাবে ধর্ষিত হয়েছে।

হঠাৎ পাটমধ্যে হেঁসো ঢুকে যায়। পরী নেই।

কোথায় গেল পরী? নাম মদন অপমানে, তীব্রতর যন্ত্রণায় পাটের নিবিড়ে একটি আমগাছের শিকড়ের দিকে ঢুকে পড়ে।

পাটের অনন্ত মধ্যে কোথায় পরীকে খুঁজবে নাম মদন? মদনের সমস্ত ক্রোধ গিয়ে পড়ছিল অদৃশ্য জন্তুটার উপর। তাকে একবার খুঁজে পেলে

কাঁচা কঞ্চি দিয়ে মারবে যতবার মন বলবে। কিন্তু মন বলছিল পরীকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। ঘৃণায়, ক্রোধে, অপমানে আর বিষণ্ণতায় মন বড়োই আচ্ছন্ন হয়েছে। ক্লান্ত লাগছে মদনের। ঘুম পাচ্ছে।

অনন্ত পাটমধ্যে একখণ্ড গহ্মার ভুঁই। একটু তফাতে গোচর হয়, পাট নিবিড়তার জটিল ফাঁকে। গহ্মা গো-খাদ্য। ছেলেবেলায় মদন কিছু বিভ্রান্ত ছিল। সে গহ্মাকে ইক্ষু ভাবত। বা বলা যায়, ইক্ষু আর গহ্মার পার্থক্য সহজ করতে পারত না। এমনকি চাষিবাড়ি গিয়ে খিদের সময় গহ্মার গাড়াশা কাটা ছোট টুকরো চুষত। মিঠা লাগে। কবীর চাষি তা দেখে বলত— গরুর খোরাক বাপ। চুষে পেট ভরবে না।

গহ্মা-টুকরোয় কুয়োতলার মৌমাছি উড়ে এসে বসত। গহ্মা থেকেও মধু সংগ্রহ করত মৌমাছিরা। মদন ভাবত, সে তবে মধুই খাচ্ছে।

গাড়াশা দিয়ে কোপ মারলেও কি মদন মরে যাবে? গহ্মা মধু নয় মানুষের, গহ্মা বিষ হয় কুঁড়িতে, গহ্মার ট্যাঁক খেয়ে ছাগল মরে যায়। বকনা মরে যায়। কুঁড়িতে বিষ, বাড়লে মধু। কিন্তু গহ্মা-ভুঁই খরিসের জায়গা। গহ্মা-খরিস সাদা। ফ্যাঁস করে ফণা তোলে। দংশালে এক দণ্ড নেয় মরতে। বাপায় কেটেছিল কাল-খরিসে।

বাবা! তুমি আমাকে কোন গহ্বরে রেখে গিয়েছ? হুদোর দেশে তোমার ছেলে কী করতে এসেছিল দ্যাখো!

ঘুম এল মদনের। সন্ধ্যা হল। মাঠের পাট ঠেলে ঠেলে কত আর খুঁজতে পারে পরীকে মদন? গা ছড়ে যায় তোষার গায়ের খসে, মেছেতার পাতার শক্ত আঁশে, জ্বালা করে। রাত হলে মাঠের মধ্যে একখণ্ড হালকা জলভেজা চাঁদ ওঠে একা। তারা কম।

মদন উৎকণ্ঠা, উদ্বেগে ডাকাডাকি করে— পরী! পরী! পরী!

রাত পুইয়ে আসার আগে জোড়া জিয়ালার ফাঁকে পরীকে দেখতে পায় মদন। সরু পথে রাত অবধি, রাত বাড়লেও কারা সব অচেনা হেঁটে গেছে। পরীকে কারা শক্ত করে দড়ি দিয়ে বেঁধেছে। মুখটা পর্যন্ত কঠিন করে দড়ি দিয়ে বাঁধা, যাতে পরী ডেকে উঠতে না পারে।

কেন এমন হল! কারা কী করে গেছে পরীর? দড়ি দিয়ে বেঁধেছে কেন?

দড়ি খুলে দিতে অনেকটাই সময় লাগল মদনের। গিঁট খুলতে দাঁত ব্যবহার করতে হল। খুলতে খুলতে বারবার তার চোখ চিকিয়ে উঠল। পরীর গায়ে ছিপটির দাগ। মেরেছে, তারপর কী করেছে সাহস করেও চিন্তা করতে পারে না নাম মদন।

জোড়া এই গাছ। এভাবে প্রকৃতিকে ব্যবহার করে মানুষ, অথচ এই জোড়া জিয়ালাকে ঋত্বিকের ক্যামেরা কিভাবেই না ব্যবহার করতে পারত! ঠিক এই দিন থেকে মদন প্রকৃতিকে কঠিন সুন্দর দেখালে অসহ্য যন্ত্রণায় চিৎকার করে ওঠে।

মদন আর নিগৃহীতা পশুর পিঠে চড়ল না। হাঁটিয়ে নিয়ে এবং নিজে হেঁটে এল মস্ত পথ। হাঁটতে হাঁটতেও পরী দু'একবার হড়কে পড়ে যাচ্ছিল, টাল সামলে বেঁচেছে। ভৈরবের তীরে এনে গণ-ধর্ষিতা পরীকে ছেড়ে দিল। জনার্দনের সঙ্গে আর দেখা করার প্রবৃত্তি রইল না তার।

জনার্দন ফের বললেন— কেন হে?

নাম মদন বলল— আজ্ঞে। ঘাসিপুর থেকে ফিরে আমার হাম হয়ে গেল কিনা।

— হাম। এতবড় ছেলের হাম?

— আজ্ঞে তাও হয়। ভাগ্য খারাপ হলে মাগের হয় বিটি আর গাইয়ের হয় এঁড়ে। আমার হয় হাম।

— কথাটা মিলল না হে বাবা মদন!

— ধরুন, যাদের সব কথা মিলে যায় তারা তো মানুষ না। দয়া করুন জ্যাঠা।

কিন্তু জমি আর কী করবেন জনার্দন চক্রবর্তী? জমির নেশা ভাল, তবে সেই জমি আগলানো কঠিন। বিস্তর হাঙ্গামা আছে।

জনার্দন বললেন— তা হলে কথা দিতে হবে, তুমি পাহারা দেবে।

— দেব আজ্ঞে! সব সময় সিধে করে রাখব পালেদের।

— তা হলে তুমি আজ থেকে হলে আগলদার নাম মদন। শোনো, আমি যদি ইলেকশনে দাঁড়াই, মাটির লোভে নিশ্চয় পালেরা আমাকে ভোট দেবে।

— আজ্ঞে, আমাকে আগলদার বহাল করলেন, তাইতে হল কি, চাষার ভোটও টানতে পারলেন। শাঁখের করাত, যেতেও কাটে, আসতেও কাটে।

রাজনীতিতে প্রবেশের এমন চমৎকার পথ! জমি এক আশ্চর্য মহিমা। মেটেল আর এঁটেলের এমনই গুরুতর দ্বন্দ্ব, এ কখনও ভেবেও দেখেননি জনার্দন। কিন্তু ওই সামান্য জমিতে কি রাজনীতি হয়? পাড়ের বিপুল অংশ না কিনতে পারলে চৌকি ফেলে লাভ নেই।

জনার্দন তবু বললেন— বেশ। ভেবে দেখি হে আগলদার। সংখ্যালঘুর ভোট, কম কথা নাকি!

— কবে আসব?

— দু'দিন বাদে ভেবেচিন্তে এসো।

নাম মদন ঘুরতে লাগল। ঘুরতে ঘুরতে এক সময় তার হুঁশ হল, জনার্দন রাজনীতির আলোচনা করতে ভালবাসেন। গালগল্পের নেশার মতন। আলবোলার নলের ধোঁয়া গিলে বুঁদ হওয়ার মতন। আকবরি গুড়াখুর দন্ত-মজ্জন যেমত নেশা, সেই রকম।

হঠাৎ তিনি একদিন বললেন— কিন্তু বাবা নাম মদন, সংখ্যালঘুর পার্সেন্টেজ কত ? দ্যাখো ব্যালেন্সড ভোট না হলে, না শুধু ব্যালেন্সড নয়, কথাটি হচ্ছে পার্সেন্টেজ এমন হওয়া দরকার, যাকে আমরা বলব ফ্যাক্টর। ব্যালেন্সিং ফ্যাক্টর। তাই না ?

— আজ্ঞে !

— কিন্তু পালেরা ?

— খানিকটা ব্যালেন্সড, খানিকটা...

—ক'ঘর পাল, হিসেব লাগাও।

— ন'ঘরী আজ্ঞে।

— তা হলে এ কোনও ফ্যাক্টরই হল না নাম মদন। ওদের ভোটে কিছুই যায় আসে না।

— তা হলে কি হবে জ্যাঠা।

— আগলদারি কড়া হাতে করতে হবে বাবা। কাউন্ট করতে হবে চাষার ভোট। কথা হল মেন্টালিটি, মেজরিটি কী চাইছে।

— ঠিক কথা ঠাকুর।

— তোমাকে এই জন্যই ভাল লাগে মদন। চা খাও। গল্পগুজব হোক, তারপর দেখা যাচ্ছে। আমরা তা হলে নদীর ভাঙন রোধের কথাই ভাবব।

— ঠিক।

জনার্দন এইভাবে একটি কাল্পনিক কর্মসূচি পেশ ও আলোচনা করতেন নাম মদনের সামনে। নাম মদন ভাবত, এইভাবে তার জমি চক্রবর্তীর কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। দামে বিকোবে।

কেনার প্রকৃত আশ্বাস পেতে অনেকদিন কাটল। অবশেষে কুড়ি হাজার টাকা দেবেন বলে ঘোষণা করলেন ফকির। সেই দিনই দানো মদনের দাওয়ায় খুঁটিতে হেলান দিয়ে নাম মদন খানিকটা নিষ্ঠুর চোখে মিতবউকে দেখতে দেখতে চায়ে চুমুক দিয়ে বলল— পাকা কথা দিলেন চক্কোত্তি, বিশ হাজারে তয় হন শেষে। আর না, এবার হাত ধোব, নির্মলার বিয়ে হয়ে গেলে মন দিয়ে মাকু চালাব মিতে।

— বিশ হাজার। বলে কোমর ধসা দানো কেমন মুখ কালো করে

চাইল। মিনুর মুখ এতটুকু হয়ে গেল। এই মাটির জন্যই সম্পর্ক হয়েছিল। সেই সম্পর্ক কি তা হলে ঘুচে যাবে!

— ভালই করলেন! বিধবার বিয়ে বলে কথা! বলে লেই মাখতে থাকল মৃন্ময়ী। এবং হঠাৎ-ই বলে ফেলল— নদী ইদিকে কোমর মুচড়ে তেড়ে আসছে, বুঝলেন মিতে, যা হওয়ার হবে।

— কী হবে! মাটির জন্য ভাববেন না!

— না, ভাবি না তো! চাষিরা বোঝে, এ জমি থাকবে না। এই তো আজই বারুইদের, অর্থাৎ, নশিপুরের বারুইদের জমির তলা থেকে তিন ঝোড়ো মাল খুঁটরে তুলে আনলাম, বারুইদের সেজ ছেলে চেয়ে চেয়ে দেখল, একটা কথাও বলল না। বলবে কেন, নদীর ধর্ম নদী করে যাচ্ছে, তা বলে তো আত্মহত্যা করা যায় না। নদীও থাকবে, আমরাও থাকব। জমির জন্য মায়া করে লাভ নেই।

কথা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেল নাম মদন। কী যেন ইঙ্গিত করতে চাইছে মিতবউ।

— আর মাটি! বলে ফের একটা দীর্ঘশ্বাসও ফেলে মৃন্ময়ী। তাতে এক ধরনের ঠাণ্ডা অসহ্য রাগ হয় নাম মদনের। কিন্তু চুপ করে থাকে।

— একটা মিঠে মউরির পান চাই আপনার। দাঁড়ান দিচ্ছি একটু বাদে। হাত কাদা করেছি কিনা! বলে কাদার আঙুলের চিমটি ধরে মাথার ঘোমটা আলতো টেনে ছেড়ে দিল মিনু পাল। ঘোমটা উঠল না। কাঁধে পড়া ফাঁসের ঝুঁটিতেই আটকে রইল কাঁধে।

— খালি মাটিই না, সব কাঁথালে মাটি নেই। শিষেপাড়ার ওদিকে শুধু বালি। তো কাঁথাল বেছে তবে, এই একটা ফের। হল কি রতনের জমি থেকে নিই, ও কিন্তু ভারী লাজুক। সত্যি বলতে কি মিতে, আপনার জমির উপর চোট হত খুব।

— আর হবে না বলছেন তো মিতিন।

— সেই কথাই তো বলছি! আর দেখুন, পোন সাজাতে কত কষ্ট। কাঠের জন্য ঝোপঝাড়ে হাত দেওয়া যায় না। ভাঙা কোমর নিয়ে আপনার মিতেকে পিটিলির ঝাড় খুঁজতে হচ্ছে।

— হবে। আরও কত কিছু হবে। আমি তো আর ডাইরেক্ট রইলাম না, ইনডাইরেক্ট হয়ে গেলাম।

— কী রকম?

— জমি আমার থাকছে না। কিন্তু পুরো আগলদারি আমার উপর বর্তাচ্ছে। জমি এবং জমির ফসল, সবই দেখব আমি। জনার্দন চাষিদের বলে মাঠ-আগলদারি আমাকে দিচ্ছেন।

— ও !

— হ্যাঁ গো মিতিন। আপনি এত অল্পে ঘাবড়ে যান। আমি আছি, আমি থাকব।

— কখন করবেন ?

— কী ?

— আগলদারি। তাঁতের কী হবে ?

— ভূমিহীন হয়ে যাচ্ছি, সবই পারব তখন। সারাদিন নাকি আগলাব ! ফ্লাইং গার্ড চলবে বাইকে করে !

— ও, আচ্ছা ! বলে কেমন কিছুক্ষণ হাত থামিয়ে কাহিল করে হেসে মিঠে করে চাইল নাম মদনের দিকে মিনু পাল।

— জমি গেলেই কি মানুষ জমির সম্পর্ক ত্যাগ করতে পারে। মিতের হল তাই। বলে উঠল দানো মদন।

কিভাবে নাম মদন আগলদারি করবে, এ প্রশ্ন তোলার মানেই বা কী ! আগলদারি বল, নজরদারি বল, সে তো রাতে। দিনের বেলা তাঁত ঠেলে, রাতে বাইক তাড়িয়ে এসে মেটেলভর্তি ঝোড়া আটকানো কঠিন কিসে !

ফসলের আগলদারি করার জন্য একটি বাচকা ছেলে লাগাবে নাম মদন, পালপাড়ায় তলার জমি বান-ডুবানি, নদীর বালি-পলির রেত ফেলা জমিতে ফসল হয় উনঝুন, সার ফেলতে পারলে অবশ্য কানায় কানায় ভরে যায়, গোসার লাগে।

ভাঙনের জমিতে সার ফেলতেও চাষির মন টাটায়। চোত-বোশেখে গরুগাড়িতে বাঁশ-বাখারি-বেড়ার চাঁচা বা ঢাঁসা লাগিয়ে গোসার ফেলার দৃশ্য এই পালবাড়িতে বসেও দেখা যায়। নাম মদন কারও গো-গাড়ি-বলদ চেয়েচিন্তে ঢাঁচাবাঁধা ঘেরে করে তাদের গাইগরু লক্ষ্মীর গোবর-পচানি সার ফেলেছে বছর বছর, সেই আস্তি করা জমি আজ জনার্দনের কব্জায় তুলে দিতে হচ্ছে।

কাহিল করে হেসে ওঠা মিতিনের মুখটা ক্রমশ শুকনো হয়ে গেল। এই মুহূর্তে নাম মদন স্পষ্ট বুঝতে পারছিল, মিতবউ তার থাবার বাইরে চলে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করে। ধর্মের কোনও বাঁধনকে মনে মনে বিশ্বাস করে না হয়তো। আবার নাম মদনের জমি চলে যাচ্ছে শুনে, রতনের জমির আশ্বাস প্রকাশ করেছে, বারুইদের জমির কথা পেড়েছে, মানুষ যে ফিকির ছাড়া কিছুই বোঝে না, মিতিনের গভীর সৌন্দর্যের মধ্যেও সেকথা ছুপে রয়েছে। ফের দ্যাখো, আগলদারির কথা শুনে এই মেয়ে মোটেও সন্তুষ্ট হল না।

দানো মদনের কথাও কি ভাল। একটুখানি বেঁকাও কি নয় ? সব

সময় কথার ভিয়েনে পাকা রস টসকাতে চায় মানুষটি, 'জমি গেলেই কি মানুষ জমির সম্বন্ধ ত্যাগ করতে পারে।' পাকা ভিয়েনের কথা একটু বেঁকেই যায়। টু এক্সপ্রেস সামথিং ইন এ রাউন্ড আবাউট ওয়ে, দ্যাট ইজ ভিয়েন— ভাবল, সাহিত্য পড়া মদন। কথার ভিয়েনে সাহিত্য, মাটির ভিয়েনে মৃৎপাত্র।

আপন তালে আবার কথা বলে উঠল দানো— কথা কি। জমি গেলেও সম্বন্ধটি থাকবে। কারণ কি, রাঙার সম্বন্ধ বসুনে জলের সম্বন্ধ মিতে। সহজ নয়। অনেক থিতিয়ে থিতিয়ে তবেই না, এক মণ রাঢ়ের রাঙা মাটি বসুনে জলে গুলে রাঙা পাই দশ কেজি। রাঙা কাঁড়তে টাইম কত লাগে বউ ?

হাতের লেই করা থামিয়ে চুপ করে রইল মৃন্ময়ী। একটি নাদার দিকে, তন্ময় হয়ে চেয়ে রইল অনেকক্ষণ। ওই নাদায় ধরা হয় বসুনে জল। অর্থাৎ বর্ষণের জল। অন্য জলে, এমনকি নদীর জলেও বীরভূম বা রাঢ়ের রাঙা মাটি ভেজানো ও গলানো ঠিক না। নাদা পেতে পেতে ধরো বসুনে জল। তাতে ফেলো রাঙা মাটি।

— গাদ হয় খুব। অর্ধস্ফুট ভাষে বলল মিনু পাল।

— হয়। বলে সমর্থন করল নাম মদন।

জলে ফেলা রাঙা মাটি নাদার তলায় থিতিয়ে গাদ হয়ে জমে। উপরের জল তুলে নিয়ে শুকিয়ে নিলে সরের মতন মিহি রাঙা মেলে। এক মণে দশ কেজি। তাকে ভিজিয়ে ফেঁসোয় নেয় মিনু, এইই হল তুলি। পাটের ফেঁসোর এমন তুলি যেন মাটির পাত্রের গায়ে সুবচনী সুরের মতন লাগে। চুড়ি ঠুনঠুন করে। রাঙামাটি এক টিন ৭/৮ টাকা। মণের হিসেব বেশ চড়া।

বারবার দানো সম্বন্ধ পাকা করতে চায়। দু'জনের রাঙার সম্বন্ধ স্মরণ করায়। মিনুর মনের গতিক বুঝেই সম্বন্ধের ভনিতে গাওনা করা। ধর্মকে টানা।

— বসুনে জল সবচেয়ে সাদা, শুদ্ধ জল মিতে। রঙ ধরে ভাল। শিব মাথা নাড়লে যতটুকুনই ছিটিয়ে পড়ল তাইই হল বসুনে। গড়িয়ে গলে নামলে নদী। তাই না ?

বউ লেইকে পিটিয়ে বেলে নেবে, রাত্তিতে চটি মাটি হবে। রুটির মতন করতে হবে। মাটির রুটি। আথালে বসবে হাড়ির উপর ভাগ, মাটির রুটি ভাঁজ করে গলিয়ে তলায় ফেলে ভিতরে গোটা আর বাইরে পিটনির প্রহার দিয়ে হাঁড়ির তলা তৈরি হবে জোড়ে জোড়ে।

শ্রম এবং খাদ্যের এই সরাসরি সম্বন্ধ অবাক করে দেয় নাম মদনকে।

বিশ্বকর্মার এই ছেলেরা, বাস্তুকার বল, কর্মকার বল, চর্মকার বল, স্বর্ণকার বল, কুম্ভকার বা তন্তুকার বল সবাই মিশিয়ে দেয় কাজের সঙ্গে আহারকে। 'আহার'— এই শব্দ তাঁতির তাঁতের অঙ্গাঙ্গী। কথাটি বোঝো হে সাহিত্যের পাঠক মদন তাঁতি। বোঝো হে সাহিত্যের ছাত্রছাত্রী, কবিতামণ্ডলি, পদ্যকর্মীগণ, আলোচক-মিত্র-দুর্বাশা, আহার বিহনে চাক ঘোরে না কখনও, তাঁতের সনার ঘা, ঝাঁপের ঝাঁপানি, আহার খাওয়ালে হয় কাপড়ের গতি। ভাতের মাড়ই হল মটকার আহার, রেশমের পিপাসা মেটে হালকা মাড়জলে। মাটির রুটিতে পড়ে গোটা ও পিটুনি।

কথাটি পদ্যের মতন সাজাতে বসে নাম মদন আপন মনে। বাসন্তী টানার মতন রোদ লেগেছে মিতিনের থুতনিতে। কী আলো! কী শোভনমান নিষ্ঠুর হৃদয় কেশবতী। মিতিন তুমি কোথাকার মেয়ে গো।

খাদ্যের সৌরভ নইলে ভিয়েন কি হয়? সাহিত্য মজে না জানি, জীবনও খরাণি। দূরের নদীর মতন সুদূর-পিয়াসি ওই মিতিনের চোখ। জানি, জানি! কী সর্বনাশ, কী ভাঙন সেখানে এখন!

এ হেন কথাটি তুমি বোঝো হে মদন
আর শোনো ছাত্রছাত্রী, কবিতামণ্ডলি
গদ্যে গাদ হতে পারে—
রাঙা হোক পদ্যকর্মীগণ।
সাধু-সুধী-সুহৃদ্ যত
আলোচক-মিত্র-দুর্বাশা
আহার বিহনে চাক কখনও ঘোরে না—
তাঁতের সনার ঘা, ঝাঁপের ঝাঁপানি
হয় কাপড়ের গতি আহার খাওয়ালে।
সুঅন্নের মাড় হল মটকার আহার,
রেশমের পিপাসা মেটে হালকা মাড়জলে।
মাটির রুটিতে পড়ে গোটা ও পিটুনি
বৈশাখ ধর্মের মাস, হেন মর্তে গদ্যে পদে
চলেছে খরাণি।

বড্ড তেষ্টা পেল মদন তন্তুবায়ের। একদিনই ঝড়জল হয়েছে, তাতেই নাদায় বসুন ধরেছে মিতবউ। নামের ইচ্ছে হল সব স্বচ্ছ বসুনে জল শুষে নেয়। এ যে কেমন খরাণি কেউ বুঝবে না। এই বসুনে জল নদীর কাঁধে ফাট হাঁ করায়।

মাটি আর তাঁতকে এভাবেই চিনেছে নাম মদন। সে প্রকৃত জানে

মাটির রুটি আর মটকা রেশমের আহারের ব্যবহার। মটকা হল তুঁতগেলা পলু-কীটের গুটি ছিন্ন করা সুতো। গুটি ছিঁড়ে রেশম কীট বেরিয়ে চলে গেলে সে সুতো আর রেশম হয় না। গুটির ভিতরে কীট থেকে গেলে সেই গুটিকে গরম জলে সেদ্ধ করে সুতো টেনে গুছিয়ে তুলতে পারলে তাকেই বলব রেশম। যেমন করে কীট লালা দিয়ে বুনেছে তার গুটি, উল্টো পাকে সেদ্ধ জল থেকে তাকেই গুটিয়ে অবিচ্ছিন্নভাবে টেনে তুলতে পারলে রেশম, গুটি কেটে গেলে মটকা। রেশমের মল হল মটকা। মটকা রেশমের তুলনায় আহার অর্থাৎ ভাতের মাড় খায় বেশি। মটকার এই গুটিই হল লাট। লাটকাটনি মেয়েরাও থেলোতে জলে ভিজিয়ে তকলি ঘুরিয়ে সুতো কাটে। সুতো কাটার সময় থেলোর জলে লাটের আহার দেয়— বেসন। তাতে সুতো রঙদার আর কিছু ভারী হয়। এক কিলোগ্রাম লাটের সুতো ৬০০ গ্রাম হবে। যারা গ্রামে গ্রামে লাট দেয় সুতোর জন্য মেয়েদের, সেই লেটোরা এক কিলোগ্রাম লাটের ৬০০ গ্রাম সুতো ওজনে বুঝে নিতে চায়।

তাইই সই। সুতো-কাটনি লেটোর নিক্তিতে ৬০০ গ্রামই দেবে। কিন্তু তার মধ্যে আহার দেবে ১০০ গ্রাম। সুতোয় সূক্ষ্ম হয়ে মিশে থাকবে পেঁপের আঠা বা খেসারির বেসন। এই সুতো যখন তাঁতে চড়বে, তার আগে গরম জলে খারি করতে হবে। অর্থাৎ সেদ্ধ করলে ওই একশ গ্রাম আহার গলে বেরিয়ে যাবে। ৬০০ গ্রাম হয়ে যাবে ৫০০ গ্রাম। এই পাঁচশ গ্রামকে তাঁতি তাঁতে ভাতমাড় খাইয়ে ফের ৬০০ গ্রামে ওঠাবে। দেখা যাচ্ছে, এই একশ গ্রাম হল সুতো- কাটনি এবং তাঁতির অতিরিক্ত নাফা। সুতো-কাটনির মজুরির অতিরিক্ত ওজনে ভারানো নাফাই হল জীবনের চাতুরি, মদনেরও তাই। নাফায় নাফায় সঙ্গত হলে তবেই ঘোরে চাকা।

মদনের হাসি পাচ্ছিল। এক বছর সে মাস দুই লেটো বা লেটের কারবার করেছে। লাট দিত গাঁয়ে গাঁয়ে মেয়েদের। অতি চালাক এক কাটনির ঘটনা শোনো। লাট দিয়ে ওজন করে সুতো নিতে গেলে সেই কাটনি বলল— সুতো হয়নি দাদা গো।

— কেন ?

— বতকে খেয়েছে।

কী আশ্চর্য ! বতক অর্থাৎ পাতিহাঁসে থেলো থেকে ভেজা লাট খেয়ে গেছে। তাইই কি হয় নাকি ! আজও মদন জানে না, বতকে লাট সত্যিই খেতে পারে কিনা। নাকি মানুষ নিজেই লাট খেয়ে ফেলে।

মদন পালের ছোট জানলা দিয়ে নাম মদন চেয়ে থাকতে থাকতে

হঠাৎ তড়াক করে লাফিয়ে নামল উঠোনে। তারপর হনহন করে ছুটে এল নদীর কাঁধালে। ঢাঁসা ফেলে রতন কোদাল টেনে গোসার ফেলছিল জমিতে। গাড়িতে লাফিয়ে তেড়ে উঠে রতনের হাত থেকে কোদাল কেড়ে নিল নাম মদন।

রতন হতভম্ব। নাম মদন বলল—কেন রে! এত কিসের দহরম মহরম। কাকে তুই খেতে দিচ্ছিস। এই জমিকে তুই বিশ্বাস করিস রতন! নিয়ে যা। এখানে সার ফেলতে হবে না। যা। চলে যা। বলে জোর করে গাড়ির জোয়াল বলদের কাঁধে তুলে দিল।

রতন বুঝে ওঠার আগেই কাতুকুতুতে তড়পানো বলদ দিগ্‌ভ্রান্তের মতন নদীর সরণি ধরে ছুটে চলল ঊর্ধ্বনিঃশ্বাসে। ন্যাজা মুচড়ে, পাচন মেরে লাল বলদটাকে ক্ষেপিয়ে দিয়েছে নাম মদন। রতন আর বলদকে বাগেই আনতে পারল না রাশ ধরে। এই কাণ্ড ঘটিয়ে হাসতে হাসতে দানো মদনের উঠোনে ফিরে এল নাম মদন।

সে আর জমিকে খেতে দিতে চায় না। অগ্নিভুক মাটিকে আগুনই দিতে চায় বটে।

নাম মদন বলল—এত তোষামোদ কিসের। আহার! তাই না! মাটির খোরাকি! কেন দেব? দেব না। কিছুতেই দেব না। এত জুগিয়ে জুগিয়ে খাওয়াতে হবে কেন? কখন যে হড়কে চলে যাবি, কখন টুঁট ভেঙে পড়বি ঠিকানা নেই। আমি সইব না মিতিন, কিছুতেই সইব না।

—আপনি কি পাগল হয়ে গেলেন মিতে! এমন কেন করছেন! বলে নরম করে মিনু পাল নাম মদনের মুখের দিকে চাইল। তারপরই বলল— মাথা ঠাণ্ডা করে বাড়ি যান। বোনের বিয়ে দিন তাইতেই মঙ্গল।

—রতন আমার কথা শুনল, দেখলেন তো!

—ভয়ে।

—আগলদারের কথা শুনতেই হবে। আমার উপরই সব বর্তাচ্ছে কি না। আমি থাকছি, আমি কোথাও যাচ্ছি না। বলি কি পিটিলি পাবেন, আমার ভিটের পাশের বন কেটে নেবেন, মদন স্বর্ণকারের একপাশ আছে, ভয় করবেন না। আমার আঁচলা কাটবেন, তার আঁচলাও কাটবেন।

—মাটির কাজ হালকা কাজ মিতে। কাজ হালকা, লকড়িও হালকা। বাবলা, নয়তো পিটিলি। অন্য কাঠ চলে না। আপনি তো সবই জানেন। সেই জন্য এখান ওখান ঘুরে বন কাটা। জঙ্গল সাফ করি, তবু মানুষের সয় না।

—সইবে কেন। পিটিলি আঁটি করে বেচলে পয়সা তো কিছু আসে। ইটভাঁটায় জ্বালানি হয়। লোকে ইদানীং কিনছে।

—সবই আজকাল দরের জিনিস হয়ে গেল মিতে। আগে মোড়লদের নদীর মেটেল কাটলে কীই বা বলত তারা! বড়জোর দু খানা থেলে বা একখানা কোর কি ঝাঁঝরি চাইত আহ্লাদ করে। ব্যস! আর এখন?

—সময় বদলাচ্ছে।

—আমরা কি আর বাঁচব? টাকা-পয়সা থাকলে, টালির কাজ ধরতাম। কল বসিয়ে ব্যবসা করতাম। জঙ্গল-ঝোপ কাটতে গিয়েও কত অপমান, এ কি জীবন হল মিতে!

—হল না।

—অভিশাপ তো আছে, নাকি! একটা পুজোর ঘট মাটিকে লাথিয়ে তৈরি হল! তাইতে প্রণাম করছে মানুষ। মানুষ যাকে প্রণাম করবে, সেই প্রণামের মাটিকে কী করে গড়তে হয় আমাকে! আমি মাটির জাত মেরে খাই। সেই পোড়া মাটির পতন হয় লক্ষ বছরে। কী আস্পদ্দা আমার!

—আর বলবেন না, সবই বুঝি!

—অপঘাতেই মরব। বড়ো বাবার কথা মনে আছে? কথায় বলে, মরণের সুদ চরণে জানে/ যেখানের মরণ সেখানে টানে। মানুষকে হেঁটে গিয়ে মরতে হবে। কোথায় যেতে হবে, তা আমার জানা কথা।

এ কথায় চমকে উঠে স্বামীর মুখের দিকে চাইল মৃন্ময়ী। এমন ছাঁদের কথা কেন শুনতে হচ্ছে তাকে! সহসা আজ তার মনে হল, নাম লোকটাই তার স্বামীর সামনে যেন মৃত্যুর মতো বসে রয়েছে। নাম কোনও প্রেম নয়, স্নেহ নয়, কোনও মিত্রও নয় মোটে।

হঠাৎ-ই দানো মদন আজ চিৎকার করে উঠল, কী বিকার হল কে জানে! বলল—আমি কুম্ভকার। মিতে! আমি দরকার হলে আপনার মেঝের মাটি কেটে আমার ঝোড়া ভরব। কুমোরকে দিতে হবে। দু ঝোড়া মাটি আপনাকে দিতেই হবে। বেশি তো চাইছি নে। আর নদীর মাটি, পাড়ের সরণি আট হাত সরকারি—এ আমি কাটব। দুইখানি বলদের গাড়ি পাশাপাশি গেলে যতটা পথ পড়ে, সেই তক নদীর কাঁখাল আমার। আমি নেব। আগলদারির ভয় দেখাতে আসবেন না। যান চলে যান। বলে কেমন দুর্বোধ্য স্বর করে গুমরে উঠল দানো মদন।

অতি চরম বিস্ময় নাম মদনের চোখে। দানোর এই কণ্ঠস্বর, এই উচ্চকিত নিনাদ বিশ্বাসই করতে পারছে না নাম। মাটির মেঝেয় লেটিয়ে কোমর মুচড়ে একটু দুলে দুলে পাছা হিঁচড়ে চাকের কাছে যায় মদন

পাল। মাটির দেওয়ালে দুখানি বাঁশবাতা পোঁতা, তার উপর চিমড়ে গা-চেরা-চেরা ভুসো হয়ে আসা অসার কাঠের তক্তি। তার উপর বসানো শিব। এ শিব মূর্তি নয়, শিবলিঙ্গ কল্পনা করা যেতে পারে। আসলে নিজেরই হাতে গড়া মাটির চাকের পাহি ঘুরিয়ে দেওয়া অর্থাৎ চাকের মতন বেড় দিয়ে দিয়ে ওঠা মন্দিরবৎ একটি ক্ষুদ্র বস্তু। ইনিই শিব। সাদা চুনের রঙ মাখানো।

চাকের উপর লেই ঘুরিয়ে ওঠালে যে রকম চুড়ো হয়, তারই আদলে এই শিব, তিনি অতএব লিঙ্গ রূপেই রয়েছেন ধরা যেতে পারে। প্রকারান্তরে কুমোরের চাক, চাকের কর্তব্যাদিসহ যে চাক, তা শিবলিঙ্গই। সেটির প্রচ্ছায়া নিয়েই যেন গড়ে উঠেছে পুজোর শিব। তক্তিতে রাখা শিব। শিবের পাহিতে মিহি বকুলের ঝুনোটে হওয়া মালা জড়ানো, কবে যেন পরানো হয়েছে। জষ্টিতে এই শিবেরই পুজো হয়।

কিন্তু প্রতিদিনই চাকে বসার আগে মদন পাল এই শিবে প্রণাম দেয়, দু হাত কপালে ঠেকিয়ে। ধুপ-ধুনোও করে নেয়। কোথাও একটা অভিশাপ দুর্নিরীক্ষ মহাকাশে নীহারিকার মতন ছড়ানো আর অতর্কিত মৃত্যুর রূপটি তবে কোনও সমকামী পুরুষের মতন।

মৃত্যু সম্বন্ধে এ একটি অনুভূতি মাত্র, নাম মদন সাহিত্যের প্রসিদ্ধ মৃত্যুর কথা মনে করে। 'মরণ রে তুঁহু মম শ্যামসমান'—এমন চমৎকার মৃত্যু কেবল পড়া যায়, পাল মদন অবশ্য পায়ে হেঁটে মৃত্যুর কাছে যেতে চাইল, তারপরই মাটির দাবি তুলল। এবং অভাবিত ভাষায় ফেটে পড়ল। কী করে পারল মিতে ? মাটিতে লেটিয়ে চলা ধসা মানুষ, তার মিতে, কেন নাম মদনকে এমন করে বলতে পারল। কিছুতেই ঘটনাটি বিশ্বাস হচ্ছিল না।

তাড়িয়ে অবধি দিল। এ অপমান কী করে সম্ভব হল। সাহস কোথা থেকে হল। নাকি স্বামীকে ক্ষেপিয়েছে মিতিন। সেদিনের হাত ধরার কথা বলে দিয়েছে! জমি আর থাকছে না, তাই শুনেই অপমান করার সাহস পেয়ে গেল পাল ? অবশ্য মানুষ মরিয়া হয়েও কি এমনটি ক্ষেপে যায় না!

অন্যের মেঝে থেকেও মাটি চেঁছে নেওয়ার অধিকার আছে কুমোরের। কি স্পর্ধা ভাবো। নদীর পাড়ের আট হাত সরণি সরকারি। অতএব সেই মাটি কাটবে পালেরা। তাইই যদি সত্য, তা হলে এত ভয় পাস কেন ? চুরি করে কাটিস কেন। তোর সঙ্গে আমার মিতে পাতা কোন স্বার্থে বুঝি না।

এখন যদি আমি এই জমি জনার্দনকে বেচে না দিই ? মিতে ভেবে

দ্যাখো, আমি এখনও একজন জমিদার। অন্তত আড়াই বিঘের জমিদার। জমিটুকু না থাকলে, তবে কি সত্যিই আমি থাকব না। আমি মিনু পালের জীবনে অস্তিত্বহীন হয়ে যাব ?

কিন্তু কুড়ি হাজারে জমি বেচে না দিলে নির্মলার বিয়ে তো হবে না। বোনটিকে যে বড়ই ভালবাসে নাম মদন। কবে থেকে ? সেই কবে থেকে। শৈশবে একবার কী করেছিল বোনটা। বাবা তাঁতের জন্য ভাতের মাড় মাকে গেলে দিতে বলছে বারবার। মাটির ছোট গামলায় মা গরম ফেন গেলে দিয়েছিল। সেই ফেন মুখপুড়ি কোন ফাঁকে গিলে ফেলে।

চুরি করে ফেন খেয়েছে নির্মলা। বাবা গামলা খালি দেখে অবাকই হল না, তার মুখটা ধীরে ধীরে কেমন অসহায় হয়ে উঠল। বাবা অত্যন্ত আস্তে আস্তে কথা বলত। নরম সুরে বলল—টানাভরনায় আহার না দিলে এই গুটির সুতো মানুষকে আহার দেয় না। তাঁতির কাপড় আহার যেমন খাবে, তেমনি আহার দেবে। আমি এখন কী খাওয়াব মা রে। ফেনটুকুও তুই পড়তে দিলি নে মুখপুড়ি !

মা কেমন চমকে উঠে বাবার মুখের দিকে চাইল। হেঁশেল থেকে তেড়ে এল মেয়ের দিকে। ছোট মেয়ে নির্মলা সেই শৈশবে সেদিন বুঝেছিল, সে মাড় গিলে কত অন্যায় করেছে !

—কাপড়ের আহার মানুষ কেন খাবে ? আবার মানুষের আহার সুতোকে কেন দিতে হবে ঠাকুর ! বলে বাবা আপন মনে কেমন অদ্ভুত করে হাসল। রাগলে বাবা এমন করেই হাসত।

বাবা বলল—স্বর্ণকারের বাড়ি যাও সাবিত্রী। দ্যাখো পাও কি না।

ফেনের জন্য এখন প্রতিবেশীর বাড়ি গামলা পেতে দাঁড়ানো কম কথা ! মা জানে স্বর্ণকারের বউ বিমলা কেমন করে খোঁটা দেবে। সেই কথা বাবার সামনে উচ্চারণ করে শোনাল মা। বলল—ফেনের যদি এত দর বউ, ফেন সামলে কেন রাখো না ! এমন করে ছুটে এলে যেন দেশে দুর্ভিক্ষ লেগেছে ! পরের ঘরে ফেন চায় কারা বল তো ! আজ বলবে কুকুরে খেয়ে গেল, কাল বলবে হেন হল, তেন হল, কী বুদ্ধি তোমার সাবিত্রী ! মেয়ের মুখ সেলাই করে দাও না কেন।

ভারী লজ্জা করছিল মায়ের। নির্মলা মুখ সেলাই হওয়ার ভয়ে এতটুকুনই হয়ে গিয়েছিল। ঠিক সেই সময় নাম মদন ছুটে গিয়ে 'আর খাবি' বলে বোনের পিঠে দুম করে কঠিন একটি কিল বসিয়ে দিল। ছোট্ট মেয়েটি দম আটকে পড়ে গেল মাটিতে। কিছুক্ষণ কোনও সাড় নেই। বোনটা কি তা হলে মরে গেল ! মা কী বুঝে মেয়েকে বুকে টেনে

নিয়ে চিৎকার করে উঠল ভয়ে—এ তুই কী করলি খোকা।

নির্মলাকে নেড়ে চেড়ে বিষম বেদনায় ডুকরে উঠল মা। তখনই ছুটে পথে নামল নাম মদন। ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাতে থাকল পোকাপড়ার বিলের ওদিকে। সারাদিন আর বাড়ি ফিরতে পারল না। সে কি আর বাড়ি ফিরে বোনকে দেখতে পাবে! বোনকে কি তা হলে চিতা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হবে! কখনও আর নির্মলা কচি কচি হাত দুটি তুলে তার কোলে চড়ার জন্য ছুটে আসবে না! দাদা দাদা বলে ডাকবে না কখনও?

আহার শব্দের এমন কঠিন অর্থ কেন কিল মেরে বোনকে বোঝাতে চেয়েছিল নাম মদন। আজ জীবন তাকেই ক্রমাগত কিল মারছে, লাথি মারছে, পাগল করে দিচ্ছে। বোনটার গায়ে আর কখনও হাত তোলেনি মদন তন্তুবায়।

আজ খুব ভোরে ভোরে সেই বোন নির্মলাই মাটির উনুনে রান্না চড়িয়ে আহার প্রস্তুত করে। মাড় গেলে গামলায় ভরে দেয়, কাঠের তক্তি চাপিয়ে তার উপর আধলা ইট বসিয়ে রাখে। বাড়ির উঠোনে কোনও হাঁড়িখোর কুকুর দেখলে লাঠি হাতে তেড়ে চলে যায় রাস্তা অবধি। কুকুর চেনে নির্মলা। হাঁড়িখোর দেখতে কেমন তা দাদাকে সুন্দর করে বুঝিয়ে দিয়েছে। মুখের দু পাশে থ্যাবড়া করে টানা দুটি কালো ভারী পোঁচ থাকে, ধূর্ত আর লম্বাটে মুখ এবং বেশিরভাগ খেঁকি। তার কুকুর তাড়ানো দৃশ্যে মজা পায় প্রতিবেশিরা। অনেকে অনেক সময় পাগলি বলে খেপায় নির্মলাকে। কত দূর তেড়ে চলে যায় কি না। কোনও কিছুর অতিরেক হলে তা হয়তো পাগলামির পর্যায়েই পড়ে।

কেন এমন করে নির্মলা? তার কি এখনও শৈশবের ঘটনা মনে আছে, ভুলতে পারে না! মনে থাকারই কথা। তার অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার ঘটনা এখনও এ বাড়িতে গল্প হয়ে রয়েছে। মদনের নিষ্ঠুরতাকে নির্মলা ক্ষমা করে দিলেও, মদন সে কথা ভুলতে পারে না, তা এখনও গল্প হয়ে রয়েছে বলেই। গল্পটা মা চর্চা করে মদনের সামনে জাগিয়ে রাখে।

কেন? ওই গল্পের তাড়সে যেন ন্যুব্জ থাকে মদন। যেন বোনের জন্য মায়া না ফুরায়। মানুষের কাছে মায়া-দয়াও নিষ্ঠুরভাবে আদায় করে নিতে চায় সংসার। খারি করে নির্মলা। ভোরে ফেন গালে। কারণ আগে তাঁতের আহার দরকার। অন্নের চেয়ে ফেন আহার হিসেবে খাটো নয়। মানুষের মুখ-গহ্বরের চেয়ে তন্তু-গহ্বর অধিক হাঁ করে রয়েছে।

খারি করে নির্মলা। গরম সোডাজলে, লঘু অ্যাসিডে সুতো-কাটনির লাটের নাচি বা ফেটি সেদ্ধ করে স্টেনলেস স্টিলের বগনেয়। বগবগ করে ফোটে লাটের তন্তু। খারি করে শুকালে ১ কেজি সুতো হয় ৫০০

গ্রাম। খারির পর লাটানো। লাটাইতে জড়িয়ে নেওয়া। লাটানোর সময়ও আহার খাওয়ানো হয়। হাল্কা মাড়জলে ভিজিয়ে নেওয়া হয়। তারপর রোদে শুকিয়ে চরকায় চড়িয়ে নলি করা হয়। নলি হল কঞ্চির ববিন।

মাকুর ভেতরের খাঁজে থাকে নলি। সুতো জড়ানো ছোট ছোট নলি। নলির সুতোকে বলে ভরনা। ভরনার সুতো সাদা। এতে রঙ করে না তাঁতি। টানার রঙ হয় বাসন্তী। একই সুতো রঙে টানা, বিনে রঙে ভরনা।

মাকু ভরনার সুতো মুখে করে ছোটাছুটি করে, কাঠের মুঠো আর মেড়ার ধাক্কা ও তাড়নায়। মাকু যায় রেলপাতের উপর দিয়ে। তাকে বলতে পারো আল।

জীবন মাকুবৎ, ভাবল নাম মদন। সুতোকে আহার গেলানো, খারি করা, লাটানো বোনটাও যেন মাকুর মতো মাথা ঠুকছে, দাদার সংসারে কেমন জব্দ হয়ে রয়েছে। রেলপাত ভেঙে কোথাও বেরিয়ে চলে যেতে পারছে না।

আল।
আল দিয়ে শেয়াল যায়
পেটে করে ছা।
পেটের ছেলে গান গায়
তাইরে নারে না।

শেয়ালটাই তো মাকু হে মদন। পেটের ছা হল ভরনার নলি। মাকুর তাড়ায় নলি সুতো ছাড়লে সুতোর গান বাজে, তা-ও কি শোনোনি নাম মদন ? তাঁতের গান, মাথা ঠোকার গান।

এ ফটকি-ছড়া গেয়ে ওঠে চরকা ঘোরাতে ঘোরাতে পা মেলে বসা গালে টোল পড়া নির্মলা। তারপর তার সে কি হি হি হাসি ! স্বামীখোর বোনটি আমার, এত হেসে ওঠে কেন ! এত খাটুনির দেহ এখনও এমন করে বেজে ওঠে কেন ! স্বামীর সঙ্গ করা বোনের কামনাকে তার জীবন প্রতিহত করেছে, তার অবদমনে কোনও খরতা প্রকাশ পায় না। শরীরের অবাধ্য ঢেউ তার সকাতর মর্মে আছড়ে পড়ে চোখের সামনে এলিয়ে ভেঙে নিঃশব্দে কেঁদে চলেছে।

লোকে ভাবে, নাম মদন বোনের বিয়ের জন্য চেষ্টা করে না খাটিয়ে নেবে বলে। শ্রম নিংড়ে নেবার জন্য বিধবার ছুতো দেখায়। এমন রোজগেরে বোনটার কি বিধবা-দশা ঘোচানো যায় না ?

বোন তার দাদাকে ছড়া-ফটকি করে—ভোঁ ভোঁ করে, ভ্রমর নয়।

গলায় পৈতে, বামুন নয়।

বলো তো কী ?

—চরকা।

—আচ্ছা, বলো, তেল মাখে চান করে না।

—মাকু।

—হিহি।

হেসে নিয়ে রেলপাতে এবং মাকুতে সরষে-কেরোসিনের তেল মাখানোর জন্য খুরি এগিয়ে দেয় নির্মলা।

মা বলে—আর একটু চেষ্টা কর বাবা। বিধবা বলে কি বিয়ে হবে না ?

—হবে না।

—জমি বেচে দে।

—কে কিনবে ?

—তা হলে মিনু পালের গর্ভে সব দিবি খোকা।

যেই এ কথা বলা তাঁত-গহ্বরের পাশানড়িতে লাথি মেরে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে কোমরে গামছার ফাঁস কষে বেঁধে চিৎকার করল মদন—মা!

মা ভয়ে সিঁটিয়ে গেল মুহূর্তে, নির্মলার ঠোঁট থরথর করে কাঁপতে লাগল। মদন তাঁত ফেলে চলে এল এবং এক সময় দেখল অসহ্য মিতিনের অদৃশ্য টানে, তার কাছে কিছুতেই যাবে না ভেবেও ভৈরবের চুঁটে এসে দাঁড়িয়েছে।

নারীগর্ভ বিষম বস্তু। প্রেমকেও কি মানুষ মাকুর গর্ভে নলির মতন মুখে করে ছুটে বেড়ায়! মদন অবশ্য প্রেম বোঝে না। ও মোটামুটি জানে, সে কামুক। কামতাড়িত স্বর্ণগোধিকা, যার গায়ের রঙ তসরের মতন আশ্চর্য। সবচেয়ে দুর্বল একটা জীব, তাকে বধ করা কঠিন নয়।

অতিদ্রব অপমান কী যেন বুনে যাচ্ছে তার মধ্যে। জমি বেচে দিলে তার সব শেষ হয়ে যাবে। আর পাত্তা দেবে না মিতিন। একবারও আর ছোঁয়া যাবে না তাকে। শ্রমজীবী মানুষের প্রেমও থাকে পেটের মধ্যে। গর্ভেই থাকে তা হলে!

নদীর কাঁধালে চুঁটের উপর দাঁড়িয়ে সূর্যের অবসান দেখছিল দিনের শেষে নাম মদন। বারবার সে ঘাড় ঘুরিয়ে দানো মদনের বাড়ির দিকে চাইছিল। যদি কেউ আসে। মিনু পাল এসে যদি বলত...

এমন সময় ওপারের চরে সেই হুদো পাখিটা ডেকে উঠল—হুদো, হুদো হুদো!

কী অভিশপ্ত কণ্ঠস্বর ! এমন পাখি কেন জন্মায় ভারতের চরে ! এত কষ্টকর ডাক ! এত হুতোশ, এত ভয়াবহ ! এই ডাকে কত মানুষ পাগল হয়ে গেছে। ওই পাখিই যেন নদীকে তাড়িয়ে এনেছে ওপার ভরাট করতে করতে, এ পার ভেঙে ভেঙে। এ পার তবু পালের ভাষায় নিরেট। কেন না এ পারে মেটেলের ধমনী বেড়ে রয়েছে নদীর কুক্ষি।

আসবে না কেউ। চুঁটে লাথি মারে নাম মদন। ভেঙে ধসে যায় উচ্চ স্কন্ধ। একটু হলে মদন নিজেই চাঙড়ের সঙ্গে নদীর তলে চলে যেত। হঠাৎ খেয়াল হল, এ চুঁট তারই জমির কিনারা। কে বলেছে, আট হাত সরণি সরকারের ! এমন কি আইন হয় নাকি ! বছর বছর ভাঙছে আর হরসন পথ পড়ছে পাড়ে। সঙ্গে সঙ্গে সেই পথ হয়ে যাচ্ছে সরকারের ? পথ যদি না পড়ত, তা হলেও সরকারের হত কিনারার আট হাত ?

এ তোমার বানানো কথা দানো মিতে ! অস্তিত্বের মিথ্যে আইন। এ মাটি আমার ! আমি তোমাকে ঝোড়া ভরতে দেব না।

অভিশপ্ত সূর্যাস্ত এখন। সেই আলোয় লাল মোটর-বাইকের শব্দ। চমকে বাঁ কাঁধের সরলরেখায় চাইল তন্তুবায়। জনার্দন আসছেন। যেন শব্দের বিভীষিকা ছুটে আসছে।

—কী করছ এখানে ?

—আজ্ঞে, এই আমার জমি।

—বেশ। সংগঠন গড়ে তোলো। জে এল আর ও অফিসে চাষিদের ডেপুটেশন তোমার কাজ। আমি এ জমি নিচ্ছি। কুড়ি হাজারই দেব। কাল দেখা করবে। কিন্তু ডেপুটেশন মাস্ট। জমির ভাঙন রোধ করা আমাদের জাতীয় কর্তব্য। সব সময়ই দেখবে মেন্টালিটি অফ মেজরিটি। তুমি কে ? চাষি নও, তবু তুমিই চাষির বন্ধু। তুমি মেটেলেও আছ, এঁটেলেও আছ। তুমি বন্ধু, তুমিই মিতে। তুমি নিরপেক্ষ।

—আজ্ঞে হ্যাঁ !

বংশী মদনের বাঁশি বাজল তারপর। মিষ্ট হিংসায় মেতে উঠল হাওয়া। বাঁশি বাজাতে বাজাতে চলল গ্রামের আর্টিস্ট, খেয়ালি বিধাতার মতন সুন্দর। নির্মলার হব হব করা বরের দেশ জিৎপুর। সেখানে চলে গেল বাঁশি। নির্মলার গর্ভদোষে বিয়ে ভেঙে গেল।

তারপর থেকে সাত সাতটি মেয়ের বিয়ে ভেঙে দিল নাম মদন। মজা এই, সেই দোষ গিয়ে লাগল বংশী মদনের আড়ে। আর্টিস্ট মদন বাঁশিতে ভাঁজে, হায়! বাঁশি কেন গায়/ আমারে কাঁদায়!

নাম মদন কাঁদে আর বিয়ে ভাঙে। বিয়ে ভাঙে আর কাঁদে। কাছিমবৎ সিটে চড়ে কত সহজে কাম ফতেহ্ করে আসে সে। মানুষের যৌনহিংসা শীতল সরীসৃপের মতন নিঃশব্দগামী। মানুষ বলেই সে নামের আড়ালকে ব্যবহার করে। সাত সাতটা বিয়ে ভাঙার পর প্রত্যয় জন্মায়, তাকে কখনও কেউ ধরতে পারবে না। পারেও না বটে। শিমুল জানবে না, তার সর্বনাশ প্রকৃতই কার বাইকের কাজ। কেন না তার বাইকের ঝুলন্ত ব্যাগে রয়েছে একখানি আড়বাঁশি—যা সে বিয়ে ভাঙার সময় মানুষকে দেখায় কোনও না কোনও ছলে।

হুদো পাখির পৃথিবী এক আশ্চর্য জায়গা। এখানে নারীর গাভলা হয় ডাক্তারের হাতে এবং সেই খবর বইতে পারলে বিয়ে বানচাল করা যায়। মানুষ নারীর যৌন অবৈধতার ভ্রূণ-পিণ্ড পাতে আগ্রহী এবং সহজেই বিশ্বাস করে।

—কে মাটি কাটে এত রাতে?

—নাম মদন।

—কার ঝোড়া?

—মৃন্ময়ীর।

—কেন?

—মিতিন কিনা।

—ওটা কী?

—কোনটা?

—ওই যে কালো মতন, জলের ধারে ধারে চলে যাচ্ছে।

—ওহো! বটে তো।

—কী জিনিস?

—সারমেয়।

—ধর্ম এসে তোমার সিট মুখে করে তুলে নিয়ে পালাচ্ছে। খাবে। খেয়ে ফেলবে। ধরো, তেড়ে ধরো।

—ধর্ম মানুষের পাপ খায়। আমি ধর্মের শিকার। আমাকে খেয়ে শেষ করে দিক। আমি যাব না। তেড়ে ধরব না সারমেয়কে। ওই সিটের উপর বসে আমি সমস্ত পাপ করেছি।

আপন মনে বিড়বিড় করতে করতে হুহু করে কেঁদে ফেলল নাম মদন। মিতিনের ঝোড়া ভরে দিতে দিতে মাটির সঙ্গে, গুহার কন্দরে কত কথা হয়ে গেল। কুকুরটা নদীর জলের কিনারে সিট মুখে করে ছুটে বেড়াচ্ছে চামড়ার গন্ধে ; কখনও মুখ থেকে নামিয়ে জলের ধারে রেখে খাওয়ার চেষ্টা করছে, ফের মুখে করে দৌড়ুচ্ছে। খেতে পারছে না। কেবল চিবিয়ে চলেছে।

যাদের বিয়ে বানচাল করেছে, তাদের কারও কারও ফের বিয়েও হয়ে গেল ইতোমধ্যে। যেদিন ওই অমুকের বিয়ে হয়ে যাচ্ছে শুনতে পায়, সেদিন কী সাংঘাতিক চাপ হয় মনে, কেমন পাগল পাগল লাগে, কথা বলতে পারে না। তাঁতের কাজ ফেলে রাখে সে।

কেউ বোঝে না কী চলে নাম মদনের মনের ভিতর। মদন দেবনাথ ঝোড়া করে গভীর রাতে নিজের জমির মাটি কেটে কেটে দানো মদনের উঠোনে ডাঁই করে রেখে এল নিঃশব্দে। মোটা বালির ঝোড়াও রেখে এল।

যে মেয়েটার বিয়ে হয়ে যায়, তার কনের বেশে চন্দনলিপ্ত মুখটা দেখতে বড় সাধ হয়। কিন্তু ভয়ে বিয়ের আসরে যেতে পারে না। নির্মলার মুখের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে ডুকরে কেঁদে ফেলে নাম মদন।

কত বার যে নির্মলার বিয়ে ভেঙে গেল। লাগে, ভেঙে যায়। এ দেশে চাকরিও হয় না, বিয়েও হয় না। এমন একটি ধারণা করতে পারত নাম মদন। কিন্তু বস্তুত বিয়ে হচ্ছে, হঠাৎ কেউ এক টুকরো দৈবলভ্য চাকরিও পেয়ে যাচ্ছে। কিন্তু নির্মলার বিয়ে তো হচ্ছে না। নাম মদন আর চাকরির কথা ভাবতে পারে না।

দেওয়াল লিখনে বেকারের সংখ্যার উল্লেখ দেখে নাম মদন কেমন করে। মন দিয়ে তাঁতের কাজ করতেও পারে না সে। রাজনীতির প্রতি আগ্রহ নেই। কখনও মিছিলে যেতে ইচ্ছে করে না। তবে জনার্দনের সঙ্গে রাজনৈতিক আলাপ বেশ জমে উঠেছিল।

বিয়ে ভেঙে দেওয়ার ঘটনা এখন তার নেশার মতো হয়েছে। বিয়ে যে দিন সে ভাঙে, সেইদিনই রাত্রে ফিরে ওই ঘটনা একটি ডায়েরিতে লিখে রাখে। তারপর প্রত্যেকটি মেয়ের বিবরণ লেখে। সেই সব মেয়েদের দেখতেও যায়। কথা বলে আসে। মেয়েদের খেদের ভাষা, আপন কপালকে কী ভাবে দুষছে, সেই ভাষা এবং মদনকে বা অদৃশ্য কাউকে কেমন করে অভিশাপ দিচ্ছে মেয়ের অভিভাবক, সবই লেখে নাম মদন।

বিয়ে ভাঙার কৌশল সম্বন্ধে উল্লেখ থাকে ডায়েরিতে। কোনও কোনও বিয়েতে, সাত সাতটা বিয়ের কোনও একটা বা দুটিতে সে মেয়ের প্রেমিক সেজেছে। প্রেমপত্র অবধি দেখিয়ে এসেছে, নিজেই মেয়েলি ছাঁদে চিঠি লিখতে পারে।

কুঞ্চির বিয়ে সম্বন্ধে কী কথা লিখেছিল নাম মদন ? লিখেছিল, কুঞ্চি আমার বোন। আমার ইচ্ছে, ওর কলেজ-পড়া বন্ধ করে দেওয়া হোক। কারণ, ফিলজফি অনার্সের এক পয়সা দাম নেই। অবশ্য এক পয়সা বলে কোনও পয়সা ভারতে দেখা যায় না। মিতে আমার কথা শুনলেন না। তর্ক করে বললেন, পড়াশুনার এখনও দাম আছে। আমি বললাম, নেই। উনি বললেন, আছে। তখন আমার রাগ হল।

রাগই অসুখ। বললাম, অযথা কেন তর্ক করছেন মিতে। বরং কুঞ্চিকে মাটির কাজ শেখান।

—শিখবে না। ধিঙ্গি মেয়ে কিছুই শিখবে না। যা করছে করুক। কলেজ বন্ধ করে বসিয়ে রাখলে বয়েস আরও বেড়ে যায় মিতে।

এই সব কথা শুনতে শুনতে আমার ঘেন্না হচ্ছিল। লেখাপড়া সম্বন্ধে এই কুম্ভকারের শ্রদ্ধা রয়েছে ভেবে রাগ দ্বিগুণ হয়ে উঠল। রাগ চতুর্গুণ হল যখন শিমুল গেলাসে করে জল দিতে এলে ওর একটা হাত ধরে সস্নেহে নিজের দিকে আর্কষণ করায় সে কেমন একটা সলজ্জ নরম ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিয়ে উঠোনে নেমে গেল। এমনই ভঙ্গি, যেন আমি তাকে কুপ্রস্তাব দিয়েছি। মিতিনের চোখে সন্দেহজনক ভ্রুকুটি। কেন ? আমাকে বিশ্বাস করে না কেউ।

এইটুকুই ঘটনা। চা দিতে এল মিনু পাল। হঠাৎ চাপা গলায় বলল— আপনার রুচি দেখে মরে যাই মিতে। মেয়েমানুষের বাছবিচার করেন না ? সম্বন্ধ মানেন না ? ও ভাবে হাত ধরে টানলেন, বোনটা কী মনে করল !

রাগ দশগুণ হল। তবু হাসি হাসি মুখ করে বললাম—আমাকে শাসন করছেন নাকি ! বলে চা না খেয়ে মিতের বাড়ি ছেড়ে চলে এলাম। মিতিন হাহাকার করে উঠল, এ কী ! চলে যাচ্ছেন কেন ? চা খেয়ে যান !

নাম মদন লিখেছে, এই অপমানের শোধ নিতে হলে কুঞ্চির কী করা উচিত ; এমন কিছু যাতে মিতিনও জব্দ হয় ? জব্দ হয় মিতে দানো মদন ?

রাত পুইয়ে আসতে দেরি আর কতই বা ছিল। পুব আকাশে শুকতারা জ্বলজ্বল করছে। আর কত ঝোড়া টানবে নাম মদন ! এ বার

নদীর জলের কিনারা থেকে সিটটা কুড়িয়ে তুলতে হবে। ধর্মের কুকুরটাকে আর দেখা যাচ্ছে না। ওটা ধর্মনারায়ণের কাছেই ফিরে গেছে। বড়ো বাবার বৈঠকে বাবার পাশে বসে জিভ বার করে ধোঁকায় জীবটা। এত কুচকুচে কালো আর টকটকে জিভ যে ভয় করে, আকৃতিও বিভীষিকার মতো।

সিট কুড়িয়ে নিয়ে বাবলা গাছের কাছে চলে এল নাম মদন। টুপির মতন বসিয়ে নিল। হ্যান্ডেলের ঝুলন্ত ব্যাগটা একবার দেখল, আড়বাঁশি আর ডায়েরি ঠিক আছে কি না।

মাটি কোপানোর সময় কেমন একটা ঘোড়া ঘোড়া গন্ধ। অশ্বগন্ধার শিকড় কেটেছে খুপড়িতে ; কি ভাবে ছিল ওই মূল ! নদীর কুক্ষিতে এমন একটা ঘটনা ! অশ্বগন্ধার দেখা পেয়েছে নাম মদন। ভেবেছিল, গুহার কাছে মিনু পাল আসবে ! সর্বরোগহর অশ্বগন্ধা, আশা পূরণের মূল। গুহাকে বলেছে তন্তুবায়, মিতস্ত্রীর শরীরটা তার চাই। আর চাই রাগের অসুখ থেকে মুক্তি, নেশা থেকে মুক্তি, ধর্মের শাসন থেকে মুক্তি, দারিদ্র থেকে মুক্তি, বেকারত্ব থেকে মুক্তি এবং আরও চাই কিছু, মুখ্যত নির্মলার বিয়ে। আমাকে একটা চাকরি দাও হে অশ্বগন্ধা !

নাটুকে গলায় নাম মদন নিজেকে বলল—ঘোড়া ঘোড়া গন্ধ, বুঝলে হে ! এ হল আসক্তির ঘ্রাণ, চৈত্রবায়ু একে বয়ে নিয়ে দাঁড়াশের শরীরে বইয়ে দেয়। দাঁড়াশ ! সে কি মানুষ, নারীর বুকে মুখ দিতে আসে। পাকে পাকে জড়াতে চায় ! কেন ? মাথা তুলে দাঁড়ানো মস্তিষ্কে কি কোনও বুদ্ধি ও আসক্তি কাজ করে ? মাথা নাড়ার মধ্যে, দুলে দুলে ওঠার মধ্যে ? মরণ হোক তোর, মরে যা। তোর কঙ্কাল পড়ে থাক মাঠে।

বড়ো সাধ কঙ্কাল হয়ে পড়ে থাকি হুদো পাখির চরে ! মিতিন তখন কি আমাকে চিনতে পারবে ! চৈত্র-জোনাকি উড়বে সেই কঙ্কালকে ঘিরে, সাপের কঙ্কাল !

তাই হল। বংশী মদনের বাঁশি আর গলা চেরা লাশ পড়ে রইল মৈত্রদের হ্যাজাক-জ্বলা চরে। কী করে হল ?

উত্তর সহজ। ত্রিমোহনীর সরকারবাবুদের মেয়ের বিয়ে ভেঙেছিল বংশী মদন। অথচ এ আশ্চর্য মিথ্যা।

জীবনটা গল্পের মতন কুহকময়। শুধু কতকগুলি মদন গাব্বু খেলে চলেছে। কে কী করছে কেউ জানে না।

ভোরের খারি করা উনুনে নাম মদন তার আড়বাঁশিকে বগনের বগবগ করা ফুটন্ত আগুনে নিঃশব্দে ভরে দিল। তারপর কোথা যায় কাহিনীর নায়ক মদন তন্তুবায় ? মদন যায় ত্রিমোহনী। কেন যায় ?

—বলেন, কেন যায়! সবাই তো শুনছেন ভাইয়েরা, বোনেরা, মাতারা, বাবারা। কেন গেল মদন ?

—যাবে না ? তাকে যে নেশায় টানছে গো !

—না।

—না ?

—না। মদন যুগির নেশা ভঙ্গ হল ইবার। কেমন করে হল ?

শোনো শোনো বন্ধুগণ, শোনো দিয়া মন,
আশ্চর্য তাঁতির আখ্যান করি গো বর্ণন।
রাত আসে বাঁশি শোনে সুধী জনগণে,
পাপের গেন্ডুয়া খেলে মদনে মদনে।

—তারপর কী হল গো কথক ঠাকুর ?
কখন পৌঁছাল মদন রাত না দুপুর ?

—পৌঁছল মদন নাম অপরাহ্ন কালে
মাইক বেঁধেছে সরকার গোরুর গোয়ালে।

—সে কি !

—হ্যাঁ গো মশাইরা। গোয়ালের চালে শোয়ানো মাইকে গান বাজছে আর ছাঁদনাতলায় বিয়ে হচ্ছে সরকারের মেয়ের। কী ঘটনা ? না, বিয়ে ভেঙে গিয়ে আবার জুড়েছে ঘটকের তালে। শুধু কি না বরপণ আরও বাড়াতে হয়েছে দশ হাজার। সেই ক্ষোভে বংশী মদনের প্রাণটা চলে গেল বাবারা। সরকার গুমখুনের জন্য লোক ফিট করেছিল।

—তারপর ?

নাম মদনের চোখের উপর থেকে মৈত্রদের চরে পড়ে থাকা গলাকাটা বংশী মদনের লাশ কিছুতেই নড়তে চাইল না।

মৈত্রদের চরে দলে দলে লোক ভেঙে পড়ল গলাকাটা বংশী মদনকে দেখতে। মাডগার্ডহীন, বেলহীন, প্যালানো রিম, ফোকলা ব্রেক, ঘন ঘন চেন পড়ে যাওয়া সাইকেলে চড়ে ত্রিমোহনী থেকে ফিরল নাম মদন। চরের সিঁথিপথ ধরে এসে দাঁড়াল নিঃশব্দে খুন হয়ে যাওয়া বংশী মদনের সামনে।

সইতে পারল না নাম মদন। সবাই ঝুঁকে ঝুঁকে দেখছিল, আফসোস করছিল, চুকচুক করছিল জিহ্বায়। মেয়েরা কেউ কেউ হাহাকার করছিল খুবই। কেউ বা এমনও বলছিল—কাঠ খেয়েছে আঙরা হাগবে না ? কেউ বা বেদনায় ঘুলিয়ে তুলেছিল গলা—অকালে জেবনডা গেল গো।

গাঁয়ের অনেক খুন এমত উন্মুক্ত-গোপন হয়ে থাকে। সবাই জানে, আবার কেউই যেন জানে না। পুলিশ কোনও কিনারা করে না। লাশ

পড়ে থাকে আপন মনে। চোখ খোলা, যেন বংশী আকাশ দেখছে, ভয়ে ঠেলে উঠেছে দৃষ্টি। কত বড়ো পাপ করেছিল লোকটা ? কত বৃহৎ, কত কালো ? কত জটিল ?

নামের মনে হল, বংশীই যেন সে। গলা ছিন্ন করে শুয়ে আছে আলের উপর, বৈঁচির ফল ঝরে পড়েছে মুখে। তারই তো শুয়ে থাকার কথা আর বাঁশি বাজিয়ে চলে যাওয়ার কথা লাশটার। কিন্তু খেলাটা কেমন যেন হল।

যেই এমত বিষম ভাবটি গড়ে উঠল মনে, এতদিনের তন্তুবায় সমস্ত ক্রোধ থেকে মুক্তি পেয়ে গেল, মোচড়াতে থাকল হৃদয়, ক্রমাগত। কেউ জানে না, কেউই জানবে না।

—নাম ডেকেছিল বংশী তোমার, নাম ডেকেছিল খুব। পাপের গর্জন বড়োই ভয়ানক হে ! মনে মনে বিড়বিড় করল নাম মদন।

—কিন্তু আমি কিভাবে বাঁচব, আমার উপায় কী জীবনের ? কাউকে তো বলতেও পারব না। এ কথা ভেবে চোরের মতন পালিয়ে চলে এল চর ছেড়ে নাম। কোথায় নিজেকে লুকাতে হবে। কে শুনবে কথা, কেই বা ক্ষমা করবে তাকে ?

নাম মদন ভাবল, কী ছিল বংশীর মনে ? এ কথার উত্তর দিল না কেউ কিন্তু এক গভীর রাতে নির্মলা আশ্চর্য তীক্ষ্ণভাবে ফুঁপিয়ে উঠল কেন ?

—এ আমরা কী করলাম মা। বলে কেঁপে উঠল নির্মলা।

মা নির্মলার পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে নরম সুরে সান্ত্বনা দেবার জন্য বলল—অমন করে কাঁদে না মা ! ছিঃ। লোকে কী ভাববে।

—আগে বুঝিনি মাগো ? বেচারি অমন করে মরবে।

—ওই বংশী তোর অত সুন্দর সম্বন্ধ ভেঙে দিয়ে গেল। কার জন্য কাঁদছিস মুখপুড়ি ! চুপ কর, মদন শুনতে পাবে। ওটা কি মানুষ ছিল নাকি ! কী করে কেটে ফেলে দিল ! দেবে না। সইবে কেন ? একি যেমন তেমন ফ্যামিলি, আমার মতন কাঙাল নাকি সরকাররা ! সাবড়ে দিল, কেউ টেরও পেল না।

—আমার কি পাপ হল মা !

—এখন ভেবে কী হবে বাছা, আগে একথা ভাবলেই পারতে। তুই তো ঘৃণাই করেছিস, এখন পস্তালে কী হবে। তা ছাড়া দাদার নামে নাম বলে...

হ্যারিকেনের শিখা কমানো অস্পষ্ট আলো, আলোর চেয়ে ছায়া বড়ো, তাইতে মায়ের কালো চোখ দেখতে পাচ্ছে নাম মদন। তাঁতের কাছে

মাটির বারান্দায় মাদুর পেতে শুয়েছিল মদন। ভাতঘুম এসেছিল, কিসের চটকা লেগে চেতন হয়, অমনি ফোঁপানি আর অদ্ভুত সংলাপ কানে আসে।

চোখে চোখ পড়া মাত্র থাবা মেরে মেয়েকে ঠেলে বালিশে ফেলে দিয়ে মা হ্যারিকেনটা নিবিয়ে দিল। ঘর অন্ধকার হয়ে গেল। সব চুপ।

আবার ঘুমিয়ে পড়ল মদন। ঘুমের মুখটার কাছে শেষ রাতে আকাশের চাঁদটা যেন মুখ দেখার জন্য ঝুঁকে নেমে এল। গায়ে সিরসিরে হাওয়া লাগে। ঘুম ভেঙে যায়। মদনের মনে পড়ে ফোঁপানি, নির্মলার চাপা তীক্ষ্ণ স্বর হঠাৎ মনে আঘাত করে, কখন একথা শুনল সে, স্বপ্নেই কি শুনেছে ? বাস্তবে এমনটি শোনার সম্ভাবনা বিশ্বাস করা যায় না। কখনও ঠিক নির্মলা বংশীকে পছন্দ করত নাকি!

দুর্বোধ্যতা ভালবাসে নাম মদন। আজ তার হঠাৎ মনে হল, জীবনটাকে সে একেবারেই চেনে না।

বিয়ে যেদিন বাঁশি বাজিয়ে ভেঙে দিয়ে এল বংশীমদন, সেদিন দুর্ভাগা বোনটার মুখের দিকে চেয়ে কী তীব্র যন্ত্রণা যে হয়েছিল, নির্মলার মুখটা আমনের ভাতের মাড়ের মতন শাদা হয়ে গিয়েছিল। সেই বোন বংশীরই জন্য কাঁদে এখন, হঠাৎ সে আবিষ্কার করে বসে, বংশীকে সে ভালবাসত!

বোনেরই উপর কেমন ঘৃণা হচ্ছিল নাম মদনের। ফের মায়াও হচ্ছিল। বংশীর জন্য কতটা যন্ত্রণা সহ্য করা উচিত হিসেব করতে পারছিল না। তবে কেন যেন হঠাৎ-হঠাৎ মনে হচ্ছিল, বংশীকে নামই মেরে ফেলেছে।

ডায়েরিটাকে বালিশের তলায় রেখে রাত্রে শোয় নাম মদন। সব সময় চোখে চোখে রাখে। যদি নির্মলা জানতে পারে, নাম তন্তুবায় বংশীকে গলার নলি কেটে মেরেছে, তা হলে!

নাম মদন অতএব হিংসার ব্যবহারও জানে না। নিজেকে কষ্ট দেওয়ার যুক্তিও হারিয়ে ফেলে সে। সহসা মনে হয়, বোনটা কী বোকা! তার হেসে ফেলতে ইচ্ছে করল। আপন মনে হেসেও ওঠে নাম মদন।

বোনটা বিকৃত। এর আর বিয়ের দরকার নেই। সাব্যস্ত করে নাম। এমনই সময় এক হাতে লাঠি, অন্য হাতে রামদা, কৌপীনমারা দানো সামনে এসে দাঁড়ায়। চোখ তুলে দানোর দিকে চেয়ে প্রবল ঘৃণা হয় নামের। কী আর বলবে সে!

যেদিন ভোরে বংশীর খুনের খবর এল, সেই ভোরে দানো পিটিলি

কাটতে এসেছিল নামের ভিটেয়। প্রায় আধেক সাবাড় করে আঁটি বেঁধে রেখে গেছে। আজ এসেছে বাকিটা সাবাড় করতে। বংশীর ওই রকম নিদান শুনেও এতটুকু বিচলিত হয়নি দানো। দেখতেও গেল না। পিটিলির ঝাড় পেঁচাতে থাকল।

এ লোক সহজেই মাটি পায়। ভাঁটার ভরনার খড়ি পায় হৃষ্টচিত্তে। ভরনা। দ্যাখো হে নাম, কুমোরেরও ভরনা আছে।

কত মিল এই জীবনটায়, কত অমিল। তুমি শিল্পী, আমিও। ভরনার সুতোর জন্য লাটের বাজারে ছুটতে হয় নাম মদনকে, যেতে হয় সমিতির কাছে, রেশমখাদি সমবায় সমিতির দ্বারে দ্বারে, মহাজনের কাছে, খোলা বাজারে, দর করতে হয়। মাগনা এক নরি লাটের সুতো মেলে না।

আর তোমার বেলা ? অন্যের ভিটে সাফ করে নিয়ে যাও ভরনার লকড়ি।

—কাটি তা হলে ?

—কে মানা করছে আপনাকে !

—আপনি কি অসুস্থ মিতে ?

—না।

—কষ্টে আছেন। এত কষ্টে থাকেন কেন ?

—আপনার ঝোড়া ভরতে কষ্ট হবে কিঞ্চিৎ, মানুষ তো আমি ! যান, কাজে লাগুন।

—রাগ করছেন !

—না। রাগ কেন করব, সত্য যা তাই অকপটে বললাম। আগলদারি করতে যাব ভেবে ভয় পেয়েছিলেন। ভয় নেই মিতে ! জমি আমি সত্যিই বেচে দিতে চেয়েছিলাম। হল না। ভাগ্য। ভাগ্যই বলছি। জমিজিরেত আমার মতন তন্তুবায়ের সাজে না, বুঝলেন ! মাটি আমার কোনও কাজে লাগল না।

—আপনি একটু মিতিনের কাছে যান, মন ভাল হবে !

—মাটি চলে গেলে, সত্যিই কি সম্পর্ক থাকে মিতে।

—আজ আপনার কী হয়েছে, বলুন তো।

—কাজ করুন। আপনি বুঝবেন না। বলে দৃষ্টি দিয়ে নির্মলাকে খুঁজতে থাকে নাম মদন।

—এমন অকাট্য করে বলছেন যে, সত্যিই বোঝা যায় না ! বলে মন্তব্য করে দানো।

মাথা নিচু করে আপন মনে নিঃশব্দে হাসে নাম। তারপর হঠাৎ মুখ তুলে বলে ওঠে—আজ কেন যে দু'টি রসের কথা কইতে সাধ হয়, বুঝি

না।

—বলুন। অবাক হয়ে দৃষ্টিতে আগ্রহ জাগিয়ে তোলে বারান্দায় উঠে বসা দানো। পাশে মাটিতে রেখেছে রামদা। দু'পায়ের ফাঁকে ধরে আছে হাঁটাচলার নড়ি। সেই লাঠি বারান্দার নীচে মাটিতে খাড়া। মুঠো খুনতির কাছে।

নাম বলল—ঝোড়ার মেটেল দেখে বোঝা কি যায়, বলুন ?

—কী ?

—মাটির অন্তরটি কোথায় ! যায় না তো ?

—বটে !

—সেই মাটিতে জল দাও, বালি দাও, লাথি মারো। লেই করে চালে চড়াও। ছেনে ছেনে লেই যখন চাকে পাক খেয়ে ওঠে, আঙুলে দেবে, ফুসলে খাড়া হয়ে মুখ তোয়ের হল, মুখে চাপ দিলে তখন বুক পেট অন্তর, তাই না ? অন্তর জেগে উঠতে কত লাথি, কত প্রহার, কত খিঁচুনি, কত গোটার ঘা, পিটনির মার। অন্তর যখন হল, তখন কাঁদতেও হবে, বাজতেও হবে !

এবার দানো মদনের চোখ ছলছল করে উঠল। নিহিতার্থ বাদ দিলেও মাটির কবিতার সাধারণ ক্ষমতা আছে মানুষকে আঘাত করে কাঁদানোর। প্রসঙ্গ ছাড়াও মাটি মানুষের আপন, প্রসঙ্গ বংশী এখন সরাসরি নামকে ঘিরেছে, একথা দানো জানে না, তবু তার চোখে জল এল। প্রসঙ্গ তুচ্ছ, অনুষঙ্গ তুচ্ছ, মাটি সর্বব্যাপিনী, কারণ গল্পের মানুষরা জানে, মানুষ মাটিরই পুত্তলি। ভূমিহীনও সেই জন্য মাটির প্রসঙ্গ বুঝতে পারে।

একমাত্র মাটিই হিংসাকে হজম করতে পারে। লক্ষ বছর হলেও পোড়া মাটিকে মাটি আত্মগত করে নেয়। মৃন্ময়ী, মিতিন। তুমি কি পার না ? তোমাকে দ্রব করার প্রেম যে আমার জানা নেই। বাঁশি নেই আমার। আবার নির্মলার দিকে চাইল নাম। মনে মনে আর্ত হয়ে বলল—কী ভুল বাঁশি শুনেছিস তুই নির্মলা !

মৃন্ময়ী। তুমি কি একবার একটি মাত্র ভুলও করতে পার না ! প্রেম হল মানুষের অন্ধ স্বার্থ ! হিংসার মতোই অবিবেচক। আবার আড়বাঁশির মতন যুক্তিহীন।

আচমকা দানো মদন দু'হাত বাড়িয়ে নাম মদনের পা স্পর্শ করল। তারপর বাড়ানো হাতের উপর কপাল রেখে অবাধ্য আবেগে কাতরে উঠল—আমাকে ক্ষমা করুন মিতে। ক্ষমা করুন ! আমার বিকার হয়েছিল !

দানোর এই রকম পাগলামি দেখে সাবিত্রী এবং নির্মলা বড়োই আশ্চর্য

হল। অবশ্য তারা জানে, এই ধরনের পাগলামিই মিতেতে মিতেতে স্বাভাবিক, অত্যন্ত তুচ্ছ ব্যাপারেই দুই মদন কান্নাকাটি করতে পারে। আগেও করেছে!

গামলায় বাষ্প-ওড়ানো মাড় ঢালছে নির্মলা। সেই বাষ্পের দিকে চেয়ে দানোর কাঁধ দু'টি ধরে ঠেলে তুলতে তুলতে নাম বলল— আজ ভোরে আমার অন্তর জেগেছে মিতে! আমাকে বিশ্বাস করেন না?

—কেন করব না? আপনি ছাড়া কে অত সহ্য করে বলুন। সংসারকে তো দেখছি। গত কাল, নদীর চারটে বাবলা আমি কেটেছি।

—ও, আচ্ছা! তা-ও কেটে নিলেন।

—না হলে ভরনার লকড়িতে কুলোচ্ছিল না।

—বেশ। একবার দেখে আসি তা হলে। সব নেড়া হয়ে গেল।

—তা হল!

সাবিত্রী আর সইতে পারল না। ফস করে বলে ফেলল— মিতে বলে এত করে নিতে হবে বাছা! এই জন্য এতক্ষণ কান্নাকাটি করলে। বছর বছর বাবলা ঝুড়ে কাটলে তার কি ছ্যা বাড়ে। আমাদের কাঠ লাগে না? তুমি পিটিলি নিচ্ছ, বাবলা নিচ্ছ, সবই নেবে? কিছুই রাখবে না।

—মা!

—আমি খারি করব কিসে। নদীতে হাত দিয়েছ, এবার ভিটেতে কোপ দিলে।

—মা! চুপ কর, তুমি কথা বলতে জানো না! বলে সাইকেল নামায় উঠোনে নাম মদন।

—ওহ্, কথা বলতে জানি না বইকি। যত জানো তুমি। ভাল ভাল কথায় সংসার চলে না; অন্তর জেগেছে তোমার। এতকাল কি অন্তর ঘুমিয়ে ছিল নাকি! অন্তর যত দেবার বেলা জাগে, নেবার বেলা তো জাগতে দেখি না।

—মা! চুপ করবে?

—কেন করব! কী দিয়েছে ওই দানো, মিনু পাল কী দিয়েছে তোকে, শুধু কথা ছাড়া। কথার বাঁধনের কি এত জোর খোকা। কিসের ভিতরে ঢুকেছিস তুই, বেরিয়ে আয়।

—না

—বোনের বিয়ে হল না, তুমি নিজে বিয়ে করো।

—না।

—কী করবি তা হলে তুই?

—জানি না। বলে সাইকেল গড়াতে গড়াতে পথে নেমে আসে নাম

মদন। মা সাবিত্রী তীর বেগে ছেলের পিছু ধেয়ে আসে রাস্তা অবধি।

—কোথায় যাচ্ছ! তাঁতে বসবে না? তোমার বোন কিন্তু পাগল হয়ে গেছে। তিনটি ক্ষুদ্র বাক্য, তাতে দু'টি ক্ষুদ্রতর বিরতি। শেষের বাক্যটি গোপন ভয়াবহ তথ্যের মতন উদ্যত হয়ে চেপে বসে যেতে চাইল নামের জেগে ওঠা অন্তরে।

মায়ের তিনটি বাক্য শোনার পর নাম তার সিটটার মতো কাত হয়ে বেঁকে গেল। যেন সে পড়ে যাবে। কাত হয়ে রাস্তা থেকে সে ভিটের পিটুলির ঝোপের দিকে চাইল। প্রচণ্ড অপমানিত দানো বসে বসে রামদা চালাচ্ছে। ধসা কোমর, পেট ফুঁসছে জীবন্ত গোসাপের চামড়ার মতো।

শেষে তা হলে নির্মলা পাগল হয়ে গেল! সইতে পারল না, বইতে পারল না। পাগল যে হল, তা-ও বিধবা বোনটি জানে না। ওর পাগলামির লক্ষণ বোঝা যাবে যখন রাতের কোনও বাঁশি শুনে উৎকর্ণ হবে এবং আপন মনে ফিকফিক করে হাসবে। কী যেন মনে করতে গিয়ে পারবে না, বলতে গিয়ে ভুলে যাবে কথা, হঠাৎ ঝরঝর করে কেঁদে ফেলবে। হাঁড়িখোর কুকুরটাকে তেড়ে তেড়ে যাবে এবং কত দূর চলে যাবে। গাঁ পেরিয়ে চলে যাবে।

হঠাৎ গরম ফেনে হাত পুড়িয়ে ফেলবে। গরম এবং ঠাণ্ডার অনুভূতি তার কমে যাবে। রাগ কমে যাবে, রাগ দিয়ে কাউকে সে আর আগের মতন লক্ষ্যভেদে পীড়িত করতে পারবে না। হাত-পা একটু একটু কাঁপবে, মাথাটা সামান্য কেঁপে যাবে। ছোট শিশিটায় বড় শিশি থেকে রান্নার জন্য তেল ঢেলে নিতে গিয়ে ফেলে দেবে। মেঝেয় কেরোসিন ফেলে মাটিকে মাতাবে। চুল বাঁধবে ফিতে দাঁতে কামড়ে এবং কতক্ষণ চিরুনি চালাবে পেছনে হাত চালিয়ে চুলের ঢালের তলায় ঘা মেরে মেরে। যেন তাকে কোনও বিয়ে-ভাঙানিয়া বংশী দেখতে আসছে বিয়ের জন্য।

মায়ের কথা শুনবে না, দাদার কথা শুনবে না। যেন সে শুনতে পায় না। শুধু বলবে—দাদার নামে নাম তো, তাই বিয়েটা হল না।

—সেটা কোনও বাধা নয়।

—তোমাদের না হতে পারে, আমার বাধা।

—খুব তো কথা!

—বিয়ে হয়নি বলে কি কথাও বলব না দিদি!

—বিয়ে হলে কি আর বরকে দাদা বলে ডাকতিস নাকি! ওগো, শুনছ! বললেই তো হত।

—হত বুঝি!

—হত না ?

—আমার যে বড়োই বাধা দিদি, কাউকে ওগো বলতে পারি না।

—ওগো বলার লোক কোথা। কেউ আছে নাকি!

—নইলে আমার পেট হল কেন। বলো, বলো, বলো! তোমাকে ছাড়ব না। বলে কোনও এক পাড়ার দিদির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে গাল কামড়ে দিল নির্মলা।

নেড়া বাবলার ঝুটো আকাশে চেয়ে নাম মদন চটকা ভেঙে কেঁপে উঠল।

কী ভয়াবহ কল্পনা! কিন্তু কল্পনা কি শুধু কল্পনার তৌলে কাঁটা হয়? কাঁটা হওয়া মানে ওজন হওয়া। কল্পনাকে তৌল করতে অন্য পাল্লায় চাপাতে হয় হুদো পাখির দেশের মাটি আর মেটেলের ঝোড়া আর লাটের বাটখারা। নির্মলাকে সখেদে নিমি বলে ডাকা হয়। নিমি কি কোনও দিদির গাল এভাবে কামড়াবে! এটা কী? বিকৃত অবদমিত কাম? মেয়ে মেয়েকে কামড়াচ্ছে :

নেড়া বাবলার দিকে চেয়ে মায়ের ডাক মনে পড়ল— 'কিসের ভিতরে ঢুকেছিস তুই, বেরিয়ে আয়!'

আর যে বেরুতে পারবে না নাম মদন, আর যে পারবে না। সাইকেল খেদিয়ে মিনু পালের সামনে এসে দাঁড়ায় নাম সেই ভোরে, রোদ চড়ে ভোর আর নেই। সকাল হয়েছে অল্প অল্প।

—আপনি! বলে ভয়ে কেমন হকচকিয়ে ওঠে মিতবউ। হাতে ওর গোবর-ন্যাতা। কেউ নেই বাড়িতে। কুঞ্চি ভোরের কৃত্যে মাঠে গেছে। রোদ চড়লেও এখনও হয়তো বাবলার দাঁতন করে বেড়াচ্ছে পথে পথে। হাতে গাড়ু। বা নদীতে শৌচ করেছে। বাড়ি থেকেই কলেজ করে কুঞ্চি।

—কেন, আসতে নেই ?

—তা কেন! বসুন। অনেক দিন আসেন না। কী হয়েছে আপনার! কেমন যেন লাগছে!

—চান করেছেন! তারপর গোবরজল করছেন ?

—তাই তো করি, সাবধানে। চাকের এইটুকুনই শুচি করে রাখতে হয় কিনা! চানের পর এইটুকুনই আলাদা করে করি। আর যা করি চানের আগে। নিন, মোড়াটায় বসুন। বাঁ হাতে করে দিলাম। বলে বাঁ হাতে ধরে আথালের সমান উঁচু, অনেকটা আথালেরই মতো দেখতে মোড়াখানি নামের সামনে রাখল মৃন্ময়ী। একটা ঢোকচার উপরই যেন বসতে হবে কাঙালের মতো। তাই তো বসে আসছে এতকাল নাম মদন। চাষি

বেল্টের ক্ষুধার্ত লোকেরা যেমন বসে লেলিয়ে চেয়ে থাকে। চেনা লোকের বেশি কীই বা মর্যাদা পেয়েছে তন্তুবায়।

সাইকেলটা পেয়ারা গাছে হেলান দিয়ে রাখতে গিয়ে লক্ষ করে নাম, গোছা গোছা করে বাঁধা বাবলার ডাল গাছের গোড়ায় চমৎকার সাজানো।

—আপনারই গাছের মিতে, অমন করে দেখছেন কী! বলল মৃন্ময়ী। তারপর হাতের ন্যাতা উঠোনের এক কোণে ফেলে হাত ধুয়ে এল সামনের চাক ঘরের ছায়ায়। এসে দাঁড়াল সমুখটায়। খুঁটিতে হাত ধরে দাঁড়াল। কপালে মস্ত লাল টিপ ফর্সা মুখে টকটক করছে। গায়ে ফিকে সবুজ ব্লাউজ। টান টান হয়ে শরীর কামড়ে রয়েছে।

—আমার ভিটের পিটিলি কাটছেন মিতে।

—জানি। বলে খুঁটির গোড়ায় বসে পড়ে মিনু পাল।

—বললেন, মিতিনের কাছে গিয়ে গল্প করে আসুন, মন ভাল হবে।

—সত্যিই, কী হয়েছে আপনার! কেমন যেন লাগছে!

—আবার বলছেন! সত্যিই কি কেমন লাগছে আমাকে?

—সত্যিই!

নাম মনে মনে ভাবল, অন্তর জাগলে মানুষকে সত্যিই কেমন দেখায়। আলাদা কেউ? অচেনা কেউ? নতুন কেউ, অথচ গভীর এবং আপন?

—অনেক দিন হল, তাই না? বলে উঠল নাম।

—কী?

—আমাদের সম্বন্ধ!

—হ্যাঁ, হল!

—লোকে জানে কত কী!

—কী সেটা?

—বলতে পারব না। তবে বড়ো বাবাকে কথা দিয়েছিলাম, রক্ষা করব মিতিনকে। সাধ্যে যা কুলিয়েছে করেছি। আপনি জানেন, আমারও স্বার্থ ছিল। লোভ ছিল।

—স্বার্থ!

—নইলে আসি কেন! আপনি তো চান না। তবু আসি। লোভে লোভে আসি।

—কিসের লোভ আপনার।

—বুঝতে আজও কি আর না পেরেছেন। আপনার অন্তর কত সাবধানী! বলে নাম মাথা নিচু করল।

—সাবধান তো বড়ো বাবাই করে দিয়েছিলেন!

—ভালবাসতেও বলেছিলেন মিতিন। কিন্তু কি রকম দূরে দূরে রাখলেন! এই জন্মটা আমার মাটিতেই খেল। আমারই অন্তর জেগে উঠল, একা। এ বড়োই কষ্ট গো!

এমনই একটি চাপা আকুলতায় সামান্য একটু নড়ল মিতবউ। চোখে কিসের ঈষৎ ঘনতা, অক্ষি-পল্লবে ছায়া নেমেছে হয়তো। সেই দিকে চোখ তুলে চাইল নাম মদন।

—সংসারে আরও কত মেয়ে ছিল মিতে; আমি কেন; কেন আমিই?

—আমিই বা কেন, আরও কত নাম ছিল। কেন আমাকেই জড়ালেন। এ চিরকালের প্রশ্ন মৃন্ময়ী। এর উত্তর হয় না।

—হয় না। বিস্ময় আর মেদুরতা ঘনায় নারীকণ্ঠে। নাম চমকে তাকায় মিনুর দিকে সন্দেহে।

—হয় বইকি। বাইরের একটা স্বার্থপর উত্তর আছে।

—কী সেটা?

—আমি শিক্ষিত ছেলে। সর্বদা ভাবেন, আমি আপনাদের ঠকাতে পারি। কতই না ঠকেছেন! মিতে সরল মানুষ। সেই সারল্যকে সুযোগ ভেবেছি, আপনাকে দখল করব ভেবেছি। দখলের ভয় মিতিন, মাটির সম্বন্ধে সেই ভয় তো থাকেই। এখন ভাবি, মাটিটুকু চলে গেলে আর কিসের জোরে আপনার সামনে এসে দাঁড়াব।

—আপনি কি আমার উপর সেই কবে থেকে রাগ করে আছেন।

—কবে থেকে?

—সেই যেদিন আগলদারির কথা উঠল! জমি বেচে দিচ্ছেন বিশ হাজারে! জনার্দন বলেছে...

—এবার খুবই যন্ত্রণা হবে মিতিন, উঠব এখন। নদীর ডাক শুনছেন! নতুন জল পড়লে আমার ভয় করে।

—আমারও করে!

—কেন করে?

—আপনার কেন করে! সেই রকম।

—মিথ্যে কথা! প্রেমের নাকি মিথ্যা ছল দরকার হয়! শুধু এই ছলটুকুর জন্যেই কত কি হয়ে যায় সংসারে। ভাঙন তো আগে আমাকে খাবে মৃন্ময়ী!

—আবার মৃন্ময়ী! এভাবে আমাকে ডাকবেন না মিতে। আমি মিথ্যে বলিনি!

এবার খুব স্তম্ভিত হয়ে গেল নাম মদন। মৃন্ময়ী হঠাৎ দু'হাতে খুঁটি

আঁকড়ে খুঁটির গায়ে কপাল ঠেকিয়ে চোখ বুঁজল। ওর চোখ দিয়ে সহসা জল গলে বেরিয়ে এল।

হঠাৎ-ই নিজেকে কঠিন সংকল্পে স্থির করে সামলে নিল মৃন্ময়ী, দু'দণ্ডেই। তারপর নাম মদনের দিকে ঝাপসা চোখ মেলে বলল—আমাকে আর কখনও নাম ধরে ডাকবেন না। এ অন্যায়। আপনি চলে যান।

—ছল করে ডেকেছি মিতিন।

—আপনি চলে যান।

আস্তে অথচ এমনই কঠিন করে বলল মৃন্ময়ী যে, মোড়া ছাড়তে হল নাম মদনকে। উঠে দাঁড়াল সে ধীরে ধীরে। মিনু পাল আবার চোখ বন্ধ করে আঁচলে জল মুছে নিয়ে অসহায় ভঙ্গিতে কপাল খুঁটিতে ঠেকিয়ে স্থির হয়ে রইল। ওর কপালের টিপ থেবড়ে গেছে, ও জানে না।

উঠোন ছেড়ে পথে নেমে এসে, সাইকেলটা নেবার জন্য আবার উঠোনে এল নাম মদন। তারপর কী মনে করে মৃন্ময়ীর সামনে নিঃশব্দে এসে দাঁড়াল।

চোখ মেলল মিতবউ। তার চোখে অসহায়তা আরও তীব্র হয়েছে যেন সে মস্ত কিছু ভুল করে ফেলেছে। তবু সেই দৃষ্টি উন্মুখ হল নাম মদনের চোখে। নাম মদন বলল—একটা কথা মিতিন।

—বলুন।

—নির্মলা গত রাতে...

—কী হয়েছে! বলে মৃন্ময়ী সিধে হয়ে বসল।

—পাগল হয়ে গেছে। শেষে পাগল হয়ে গেল বোনটা, তা-ও একটা ছল মিতিন!

—কী বলছেন!

—হ্যাঁ। বংশী মদন মারা গেল তো...

—বংশী মরেছে তো নির্মলা পাগল হবে কেন?

—ওর আর বিয়ে হবে না। হবে? বলুন? কে করবে পাগলকে বিয়ে। বিধবা, তারপর পাগল। দাদাকে এইভাবে মুক্তি দিতে চাইছে। সব বুঝি। আমি কি ছল বুঝি না! সত্যমিথ্যা বুঝি না বলছেন! এই যে এতক্ষণ কথা হল, এত সাধু আমি তো নই! বলুন?

কথা শুনতে শুনতে বড্ড ব্যথা বেজে উঠল মৃন্ময়ীর বুকে। এক লহমা চুপ করে থেকে মিতবউ বলল—অসাধুকেও মানুষ কিন্তু ভালবাসে মিতে। গতিকে বাসে। আর কেন! এবার চলে যান। ওই দেখুন কুঞ্চি আসছে। আর দেরি করবেন না।

নাম মদন পথে নেমে আশ্চর্য কষ্ট পেতে লাগল। গতিকে ভালবাসা ! কী মিথ্যা এই জীবন ! একটু আগেই মনে হয়েছিল, মিতিনের অশ্রু কী সত্য, কী মধুর !

এই মাত্র মনে হল, সব বানানো, সবই ধাপ্পা ! বসুনে জল, রাঙা মাটি, সবই ছলনা। কেন সে পথে নেমে গিয়ে ফিরে এসে আবার দাঁড়াল মৃন্ময়ীর সামনে ? মুহূর্তেই কেমন বদলে গেল মিনু পাল ! নির্মলার কথা শুনেই কি বদলে গেল ! তা হলে কাঁদল কেন ?

সাইকেলটা আর টানতে পারছে না নাম ; পা ভারী, জিভ ধর্মের কুকুরের মতন ঝুলে পড়তে চাইছে। পা দু'খানি থপ্‌থপ্ করে ফেলছে, যেন কী একটা ডিঙোতে হচ্ছে তাকে।

—আমি মিথ্যা বলিনি ! দু'হাতে খুঁটি আঁকড়ে ধরা মৃন্ময়ী। আস্তে করে খুঁটিতে কপাল ঠেকাল, চোখ বোজা মৃন্ময়ী। কী অসহায়, কী মোহময়ী, কী রকম শুচি আর উজ্জ্বল। ঠোঁট যেন সুপ্ত আবেগে, চোরা আকুলতায় ঈষৎ কুঁচকে উঠেছে এবং টনটনিয়ে উঠেছে, মৃদু কাঁপুনি ছিল থুতনির তিলে। গলার ভাঁজের জড়ুলে হৃদয়ের তপ্ত ঘাম, নাসিকা একটু স্ফীত হল নিঃশ্বাসে।

—এত সাধু আমি তো নই !

—অসাধুকেও মানুষ কিন্তু ভালবাসে মিতে ! গতিকে বাসে। [ফেরে পড়ে বাসে তা হলে !]

ইতিহাসে কত পুরুষ এভাবে নারীকে অসহায় করে প্রেম আদায় করেছে ! দানো মদনের ধসা কোমরের কথা মনে পড়ল নাম মদনের। শ্রমে ফুলে ফুলে উঠছে গোসাপের শরীরের স্পন্দনের মতন, শ্রমে আর অপমানে। জগৎ জুড়ে চলেছে গতিকের ভালবাসা। দানো গরিব, কিন্তু নাম যে কাঙাল !

এক ভালবাসা উচ্ছ্বাসের আর এক প্রেম উচ্ছিষ্টের মতন। দানোর এঁটো অর্ধভুক্ত স্নেহ-প্রণয় তার দিকে ছুড়ে দিল মিতবউ। 'আর কেন ! এবার চলে যান।'

কোথায় যাব ? ভাবল নাম মদন। কোথায় বা যাওয়ার আছে ! এই নদী ছেড়ে, ঝোড়া-খুপড়ি-মেটেলের কুক্ষি ছেড়ে, রাঙা ছেড়ে, চাক ছেড়ে, পিটুনির ঝোপঝাড় তাঁত আর চালের গহ্বর ছেড়ে !

সে লোকাল। তার যাওয়ার পৃথিবী নেই সম্মুখে। তার হল লোকালিজম, স্থানিক-আসক্তি। তার হল হুদো পাখির দেশ, ছাগীর গর্ভনাশা সাম্রাজ্য, তার হল পরীর লালার মাড়ে মাখা বসন্ত, তার হল পরী ঘোটকীর চালে বিষণ্ণ অগ্রগতি ! সে চলেছে, কিন্তু কোথাও যাচ্ছে না।

খরানিতে পুড়ছে কবি-কঙ্কন মদনের পদ্য। তার কেবলই টানাহাঁটা করা মটকার রোদ, তার হল অশ্বগন্ধার গুহা, সে এই গুহা ছেড়ে যেতে ভয় পায়।

রোদ চড়ল। পাকুড়ের তলে দাঁড়াল দেবনাথ। নদীতে নতুন জল পড়েছে। এবার কতখানি খাবে নদী ? নদীকে কতখানি খাবে মৃন্ময়ী ? চলো হে মদন। বাইক তাড়িয়ে চলো। থেমে পড়লে কেন ?

—কে যায় ?

—নাম মদন।

—দিগরে পাঁচখানা মদন। কোনখানা তুমি ?

—আজ্ঞে পাঁচখানাই আমি।

—তা-ও কি হয় বাবা ! কোথা থেকে আসা হচ্ছে ?

—মিনু পালের উঠান থেকে বড়ো বাবা !

—ও, তাই বলো ! মৃন্ময়ীর মদন তুমি। মিনুর হল দুই মদন। কে তুমি ? কোনখানি ?

—আমি নাম।

—ওহো ! বলে ফোকলা করে হাসল ধর্ম। লাঠি বাড়িয়ে ধরেছিল। পাশে বসে জিভ বার করে ধোঁকাচ্ছে ক্রমাগত কালো কুকুর।

ধর্ম আন্দাজে পাশের কুকুরের গায়ে হাত বাড়িয়ে হাত বুলাতে বুলাতে বলল—কী যেন বললে, পাঁচ পাঁচটা মদন তুমি একা নিজেই। কী করে হল। পাগল হলে নাকি হে। আমাকে ফাঁকি দিতে চাইছ ? ধর্মকে ফাঁকি দিয়ে লাভ। ছদ্মবেশে ঘুরছ নাকি ? রূপ ধরেছ ?

ধর্মের কথায় আঁতকে উঠল নাম মদন। সেকি তবে বংশী মদনের পরমায়ু চুরি করে ঘুরে বেড়াচ্ছে না ? সেকি আর আগের মদনই রয়েছে, অন্য মদন হয়ে যায়নি ?

—সম্বন্ধ ঠিক রেখেছ ? মিতিনের ভালবাসা পাও ? দেবীজ্ঞান কর ? কর না। দানোর মৃত্যু কামনা কর, ঠিক করে বলবে !

—আমি জানি না ঠাকুর !

—দেবতারা রূপ ধারণ করতে পারত, জানো ? কত কেচ্ছা, কত কাণ্ড। এখন কোন রূপে বিরাজ করতে চাও ? পাখি হবে, ষাঁড় হবে ! মিতিনকে কোন রূপে চাও তুমি ! মিতিন কি ময়ূরী হবে ? গাভী হবে ? রাজহংসী হবে ? কী হে ছোকরা, মায়াকারগণ কী বলছে তোমাকে ? নারীর যৌনসঙ্গ করার জন্য কী না করেছে দেবতারা। বৈধ অবৈধ মানেনি। নিজে রূপ ধরেছে, নারীকে রূপ ধরিয়েছে। পশুদিগের মধ্যে কোন রূপটি পছন্দ কর ? অশ্ব ?

—পরী !

—ওহো ! পাগল ছেলে। ছেলেমানুষ। নারীকে পরী রূপে চাইলে তাকে ছুঁতে পারবে না। গাভী রূপে চাইতে পার, সেটিই সহজ হবে। কত কেচ্ছা, কত কাণ্ড ! ইন্দ্র গৌতমীর কী করেছিল ? কিন্তু তুমি কি দানো মদন হতে পার ? পার না। কেন ? না, তুমি দখল চাও। তবে, দানোর মতো রূপ ধরা কঠিন।

—কঠিন !

—কঠিন নয় ? ওর দুঃখ তুমি বুঝবে ? কষ্ট বুঝবে ! তুমি তো বাবু। তোমার ভরনা আর ওর ভরনা তো এক নয় হে !

—আমি জানি। আমাকে আর অভিশাপ দেবেন না বড়ো বাবা। আমিও তন্তুকার। হাতের কাজ করি। আমি মানুষ। আমি মৃন্ময়ীকে মাটি রূপে পেতে চাই।

—মাটি ?

—মাটির সম্বন্ধ আমাদের।

ধর্ম হেঃ হেঃ করে হেসে ফেলল। বলল—এ তো পাতানো সম্বন্ধ হে ! ভুলে গেলে ?

—কিন্তু আমার মাটি ! সেই কথা বলুন।

—আবার হাসি পাচ্ছে আমার। তোমার মাটি কে বলেছে ! তুমি কি চাষি ! তন্তুকারের ফের মাটি কিসের ! আমি কতকাল আগের ম্যাট্রিকুলেশন। শিক্ষেদীক্ষে আছে। বলি কি, তুমি যাইই মনে কর, মদন পাল কিন্তু তোমার খতিয়ানি মানে না। তুমি শতেক বার কাঠাকালি, কুড়বা কুড়বা করতে পার, তবু ওই মর্ত তোমার না।

—আমার নয় ?

—না। মদন পাল মনে মনে জানে, ও তোমার নয় বাছা। মিতিন জানে, তুমি তাদের কিছুই দিচ্ছ না। ওরা লকড়ি নেয়, মাটি নেয়। সবই শিবের মাটি। সব কাঠ পায় ওরা মহাদেবের কাছে থেকে।

—হ্যাঁ, বলেছেন সেকথা। মিতে বলেছেন বাবা, পারলে এবং থাকলে অন্যের মেঝের মাটিতেও খুপড়ি বসাবেন উনি। তা হলে আমি মৃন্ময়ীকে মাটি রূপেও পাব না ?

—তোমার বেত্তান্ত আশ্চর্যের হে ছোকরা ! অত অপমানের পরও পালেরা বাঁচে কী করে ? অন্যের মাটি, অন্যের লকড়ি যদি অন্যেরই হত, তা হলে তারা বাঁচত ?

—এ খুবই সম্ভব। কিন্তু কষ্ট কেন তা হলে ! মিতেও অপমান বোঝে ঠাকুর।

—সেটা সমাজের দোষে। যাও। নিরূপণ করো। এতকাল ধরেও মদন পালের মনটা বুঝলে না। মিতিনকে তুমি কী বুঝবে।

—আমি বুঝিনি?

—নাহ্। বলে হাতের লাঠি পথের শূন্য থেকে নিজের কোলে টেনে নিল ধর্ম। নাম মদনের পথ করে দিল।

—আমাকে কিছুই আশীর্বাদ করবেন না ঠাকুর। সাইকেল ফেলে ধর্মের পায়ের তলায় বসে পড়ল নাম মদন।

ধর্ম নারায়ণ নামের মাথায় হাত রেখে বলল—হে পরাৎপর, মাটিকে তুমি মৃত্তিকায় রাখো। তাই রাখো প্রভু। সকলকে তুমি যথাস্থানে ফিরিয়ে দাও। কিন্তু দেবতাদের আমি জানি না সম্যক। ধর্ম দুর্জ্ঞেয়। কে কোন রূপে রয়েছে জানি না। চলে যা মদন, চলে যা।

চোখে জল ভরে এল মদনের। সাইকেল তুলে নিয়ে পথে পড়ল। সে বুঝল, ধর্ম তাকে সহ্য করতে পারছে না। মনে পড়ল, ডায়েরিখানাকে আজ সে সঙ্গে নিতে ভুলে গেছে।

॥ ৫ ॥

মৃন্ময়ীর কপালের ধ্যাবড়ানো টিপের দিকে চাইল দানো মদন। চমকে উঠল। মাথায় পিটুলির বাঁধা আঁটি। ধপ্ করে ফেলে দিল উঠোনে। যেন তার মাথা ঘুরে উঠেছে। এক হাতে লাঠি ধরে মাথায় বোঝা নেওয়া দানো দৃশ্যতই করুণ। তার উপর আজকের ভোরের সাবিত্রীর অপমান জীবনের সব ব্যর্থতাকে ছাপিয়ে উঠেছে। কিছুতেই সে হজম করতে পারছে না।

ধ্যাবড়ানো টিপটার দিকে অনেকক্ষণ কঠিন দৃষ্টিতে চেয়ে রইল সে। মুখে কোনও কথা বলল না। প্রথমে ছায়া কোলে টানা মাটির বারান্দায় ঘর্মাক্ত বপু ফেলে বসে গেল দানো। মাথার বেড়ি করা বসন নাচির মতন ধরে হাওয়া দিতে লাগল নিজেকে। ক্রোধ হল। অভিব্যক্তি হল না।

হঠাৎ মেঝেয় গড়িয়ে পড়ে কী একটা দুর্বোধ্য যাতনায় কঁকাতে লাগল। মেঝেয় গা গড়িয়ে যেন শূলব্যথা দমাচ্ছে সে। স্ত্রী ছুটে এসে গায়ে হাত দিতে চাইলে অস্পৃশ্য ছুঁয়েছে তাকে এমনই আঁতকে উঠে সরে চলে গেল ঘরের মেঝের ঝাপসা আলো-আঁধারে।

বউ ঠাণ্ডা জল খাওয়াতে চাইল স্বামীকে। পারল না। কিছু মাত্রায় আশ্চর্য হয়েছে মৃন্ময়ী। কী হল লোকটার।

—কেন অমন করছ গো ।

অনেকক্ষণ উত্তর দিল না দানো । গোঙাল শুয়ে গড়িয়ে । তারপর বলল—কান্নাকাটি কেন করি মিনু ? মিতের পায়ে ধরে কেঁদেছি, এ মিথ্যা, এ চালাকি ? এত অপমান করল সাবিত্রী ! পারল করতে ?

—চুপ করো । সইতেই তো হবে ।

—বললে কি জানো, দেবার সময় অন্তর জাগে না, নেবার সময় জাগে !

—সত্যিই তো ! কেবলই নিয়েছি আমরা । দিইনি তো কিছু !

গড়াতে গড়াতে এবার দেওয়ালে মুখ গুঁজে থেমে গেল দানোর দেহ । তারপর ফোঁসানি থেমে গেল । মুখ খুলল মদন পাল—শ্বশুর হবু জামাইকে শুধালেন, শক্তিধরটি কে তোমার ?

প্রশ্নে প্রশ্নে ছলকাটাকাটি । এ প্রশ্নে একশো নম্বরে একশোই পেয়েছিল মদন । নইলে বিয়েই বুঝি হত না । শ্বশুর শুধান, জামাই হওয়ার লোভে মদন জবাব করে ।

আজ সেই প্রশ্নের দু'একটি নিজেকেই করছিল মদন পাল । কতদিন স্বামীর মুখে সেই গল্প শুনে আসছে মৃন্ময়ী । উত্তর আজ মৃন্ময়ীই দেবে ।

প্রশ্ন নং এক. শক্তিধরটি কে তোমার ?

মৃন্ময়ী জবাব দিল—দড়ি । [বাতায় ঝুলন্ত দড়ি । যাকে ধরে মাটিকে লাথায় পাল । সব শক্তি সেইই ধরে থাকে ।]

প্রশ্ন নং দুই. সারাদিন গড়ে থোও কিসে ?

মৃন্ময়ী ফের জবাব দিল—চাকের হাঁড়িতে । [ওই হাঁড়িতে কাদা মোছা তো থোওয়া, নাকি ।]

প্রশ্ন নং তিন. মাটি ক'আঙুল ?

মৃন্ময়ীর জবাব—দু'আঙুল । [দু'আঙুলে নদীর মাটি পরীক্ষা করে নিতে হয় আবোল নাকি চন্না নাকি মেটেল নাকি পলি নাকি বেলে ।]

প্রশ্ন নং চার. বালি ক'আঙুল ?

জবাব—পাঁচ আঙুল । [পাঁচ আঙুলে চেলে দেখতে হয়, নদীর বুকের মোটা বালি কিনা, বালির রকম কেমন ।]

প্রশ্ন নং পাঁচ. নড়ি ক'খানা ?

মৃন্ময়ী জবাব দিল সত্বর—তিনখানা । যথা, চাক ঘোরানো নড়ি । নাম চাকনড়ি । পোনের আগুন উসকানো নড়ি । নাম ফুলনড়ি । পোনের তলার আগুন নেড়ে দেওয়ার নড়ি । নাম পাঁজাল ।

প্রশ্ন নং ছয়. চাক মাটি ধরে রাখে, গায়ের মাটি, কী করে ? বলো মৃন্ময়ী ।

মৃন্ময়ী উত্তর দিল—নারকোলের ছোবা আর বাঁশের পাঁচখানা বাতা।

—তুই আমাকে কেমন করে ধরে আছিস বউ ? আমি তোকে কেমন করে ধরে আছি ? এই দ্যাখ্ এই হল পেটের বাতা আর এই রগগুলো ছোবা—এই দিয়ে ধরেছি তোকে।

—আমি জানি গো ! বলে প্রায় ফুঁপিয়ে উঠল মিনু পাল।

—উত্তর দে মিনু, কার জামায়, কার গালে টিপ মুছে গেছে, এ কী করে হল ! মিতে এসেছিল ?

অত্যন্ত মূক আর স্তম্ভিত হয়ে গেল মৃন্ময়ী। স্বামী কোমর লেটিয়ে উঠে বসে হাত বাড়িয়ে গোল ক্ষুদ্র আয়নাটা টেনে নিল। তারপর মেলে ধরল স্ত্রীর মুখের উপর। ঝাপসা আলোয় কপালের ধ্যাবড়ানো টিপ দেখে প্রথমে শিউরে উঠল বউ। তারপর ধীরে ধীরে ঠোঁটে বাঁকা হয়ে খেলে উঠল নিঃশব্দ হাসি।

মিনু স্বামীর হাত ধরে বলল—ও, এই কথা। এসো তা হলে। কাঙালকে কেমন করে দিয়েছি দেখবে এসো !

মৃন্ময়ীর সহসাই মনে পড়ে গিয়েছে, সেই তখন সে খুঁটিতে কপাল ঘষে কেঁদেছে। চাকঘরের খুঁটি। স্বামীর হাত ধরে হিচড়ে টেনে এনে দেখাল—এই দ্যাখো ! পোড়া কপাল এখানে ঠুকেছি। দাগ দেখতে পাও ?

—কেন এমন করলি !

—তা কখনও তুমি বুঝবে না।

—বল আমাকে !

—বলব না তো, কক্‌খনও বলব না। তুমিই মিতেকে গল্প করতে পাঠালে, আমি কি ডেকেছিলাম ?

—আমাকে মাফ করে দাও মৃন্ময়ী। কোমরভাঙার অপরাধ নিও না। মাজা ভেঙে গেলে, মানুষ আর মানুষ থাকে না !

—এমন করলে বাঁচি কী করে বলো তো ! তোমার চাকের মাটি মিতেকে ধরে নেই ?

—মিতে কী বলল ?

—দেখতে দেখতে কত বছর হল। তাই না ?

—কিসের ?

—ওর ওই কাঙালেপনার। আমাদের সম্পর্ক। বললে, নদী আগে ওকে খাবে, তারপর আমাকে।

—তুমি কী বললে ?

—সত্য যা তাই বলে দিলাম।

—সত্য কী ?

—আমাদের হল গতিকের ভালবাসা।

—দুঃখ পেল ?

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে স্বামীকে একদৃষ্টে চেয়ে দেখে মৃন্ময়ী বলল— দুঃখ পেল বলেই তো শরমে এই খুঁটির গায়ে মাথা ঘষতে হল। ছল করতে হল।

দানো মনে মনে বলল—ছল ক'রে ভালবাসা করো না মিনু।

—তারপর ?

—ছল কি এক পক্ষের নাকি! বললে, বংশীর খুনের খবর শুনে নির্মলা পাগল হয়ে গেছে। ওইটে নাকি ছল। বোঝো!

কথা আর বুঝতে পারল না মদন পাল। বারবার খুঁটির লাল দাগ দেখল। এই ঘটনার পর একটুখানি গাভীর মতন হয়ে গেল মৃন্ময়ী।

একটুখানি হল, বাকিটা তো মানুষই রইল সে। তার লজ্জা রইল, ভয় রইল, সংস্কার রইল। মানুষ তো সবখানি দেবতা হয় না।

বর্ষা এল। বান হল। নাম মদনের ভুঁই ডুবল। জল নামতে থাকলে পাড় ভাঙতে থাকল। চোখের উপর নদীর খিদে প্রত্যক্ষ করল নাম। এতই ভয় পেল সে, যেন সন্ত্রাস চলেছে মাটিতে জলে! নদী গোঙায়; নদী না মাটি, বোঝা যায় না। মনে হল, এবারই সে শেষ হয়ে যাবে।

জল যখন আরও নেমে গেল তলায়, তখন ঋতু ঘুরে গেছে। শান্ত হয়েছে নদী। নদীতে অযুত জোনাকির উৎসব। আকাশের গায়ে চাঁদের আলোর হিমানি মাখা। নদীতে নৌকো ভাসছে। কাতারে কাতারে মৃৎপাত্র রঙিন আলো ফুটিয়ে সেই নৌকোয় চড়েছে। নৌকো যাবে রামকৃষ্ণপুরের মেলায়। কালীপুজোর মেলা। কার্তিক মাস। এই মেলায় প্রচুর লাল কোর বেচে আসে মদন পাল। বউ যায় সঙ্গে। আকাশে ছেঁড়া মেঘ। দিনের বেলা শান্ত নীল, সাদা মেঘ। নৌকো যেন দিগন্তে ভেসে চলেছে। খোলা, বালুহাঁড়ি, কোর। কতকিছুই সাজিয়ে নিয়েছে মদন পাল। নৌকোর ভাড়া দেড়শো টাকা।

তার আগে সংসারে কত ঘটনা নদীর খাঁড়ির জলঝোরার মতন চুঁইয়ে নেমেছে ভৈরবের স্রোতে। পাগলি নির্মলা দাদার ডায়েরি পড়ে ফেলেছে। পড়তে পড়তে সত্যিই সে পাগল হয়ে গেছে। আর বুঝতে পারছে না মানুষের ছায়াচার, মানুষ তার কাছে মায়া মাত্র, সবাই নিষ্ঠুর, প্রতারক।

মনে হল, দাদাই তার শত্রু। একদিন বর্ষার রাতে হ্যারিকেন ঝুলিয়ে জল ঠেলে মদন পালের বাড়ি এসে মৃন্ময়ীকে বলে গেল— দাদাই কুঞ্জির

বিয়ে ভেঙেছে !

মৃন্ময়ী ভেবে পেল না, শিমুলের বিয়ে ভাঙার কথা স্বামীর কানে তুলবে কিনা। কাকে বলবে, বংশী নয়, নাম মদনই ত্রিমোহনীর সরকার বাড়ির বিয়ে ভেঙে দিয়েছিল ! সে নিশ্চিত, নির্মলার মতো পাগল কখনও মিথ্যা বলে না।

স্বামীর চেয়ে দু'এক ক্লাস বেশিই পড়াশুনা করেছিল মৃন্ময়ী। তবু তার বিয়ে হয়েছিল মাটিরই ছড়া-ফটকি করে।

একদিন আবার সে লক্ষ করল, রতনকে নাম মদন তার উঠোনে ঠেলে ঠেলে পাঠাচ্ছে। লাজুক ছেলেটা সাঁঝ-ঝুঁঝকি তারার আলোয় উঠোনে এসে দাঁড়িয়ে নরম সুরে বলল—আবার অঙ্গনা ঘোষের মাটি ঝোড়া করে আনলেন আপনারা। এত করে নেবেন না বলছি, নেবেন না। বলেই দ্রুত উঠোন ছেড়ে চলে গেল রতন।

রতনকে একদিন শিমুলেরই সামনে মৃন্ময়ী চেপে ধরল।

—আমাদের মিতে তোমাকে কিছু বলে ভাই ?

—কী বলবে, তারও যা দশা।

—তুমি সত্য বলো। আমরা মিতেকে কিছুই বলব না।

চুপ করে থাকে রতন। এই মৌনভাবটি দেখে মৃন্ময়ী বোঝে, এর পিছনে নাম মদন রয়েছে।

এ ব্যাপারে নাম মদন আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল। মাটি নিয়ে নদীর কাঁধালে, জমিতে চাষিদের সঙ্গে সংখ্যালঘু পালেদের বিবাদ একদিন চরমে উঠল। সেই বিবাদের মূলে ছিল নাম মদন। সেইই সেদিন চাষিদের ক্ষেপিয়ে দিয়ে বচসা করিয়ে নিলে, মারধরের ভয় দেখাল চাষিরা। বিবাদ মেটাতে চাষি আর কুমোর জড়ো হল জে এল আর-ও অফিসে। বড়বাবু যখন বিবাদ মিটিয়ে দিচ্ছেন, বটতলায় বসে দাঁতে নাড়ার নর টানছে নাম মদন। যেন সে কোনও পক্ষেই নেই।

এ সংঘাত মেটে না। মেটানোর উপায় নেই। দু'পক্ষকেই শান্ত হতে বললেন বড়বাবু। এর গালেও চুমু দিলেন, ওর গালেও চুমু দিলেন। চাষি এবং কুমোর, দুই দলই শিশুর মতন আচরণ করে আপন আপন চাকলায় ফিরে গেল।

বটতলার ঝুলন্ত ঝুরির তলায় ঘাসের উপর বসেছিল নাম মদন। কানের উপর ছোট রেডিও চেপে ধরে ক্রিকেট শুনছিল। সবাই ওর চোখের উপর দিয়ে ফিরছে, ছাড়া ছাড়া হয়ে। মৃন্ময়ী ওর সামনে এসে দাঁড়াল একবার, চোখ তুলল মদন। কানে রেডিও। মৃন্ময়ীর কেন যেন কথা বলতেই প্রবৃত্তি হল না। চোখের দৃষ্টি কঠিন হল মাত্র।

সামনে সামনে মৃন্ময়ী। কানে রেডিও ধরে পিছু পিছু আসতে লাগল মদন দেবনাথ। সে যেমন শুনতে চায় না, মৃন্ময়ীও বলতে চায় না।

মৃন্ময়ী মনে মনে ভাবে, এই মানুষটির অন্তর সত্যিই তা হলে কেমন। একে আর বারান্দায় নয়, মোড়াটা উঠোনে ফেলে বসতে দেওয়া উচিত। ছিঃ। এরই জন্য চোখে জল আসে তার।

বাড়িতে এসে ঢুকে পড়ল মৃন্ময়ী। পিছনে আসছে জেনেও একবারও পিছনে ফিরে চাইল না। বাড়ির উঠোনে দাঁড়িয়ে রাস্তায় চাইল। লোকটা রাস্তায় দাঁড়িয়ে বাড়ির দিকে চেয়ে আছে। হাতে রেডিও। চোখে চোখে পড়ল। চোখ নামিয়ে নিল মিনু পাল।

একবারও ভিতরে আহ্বান করল না। আবেগে তপ্ত, ভাবে বিহ্বল, মাটি না পাওয়ার ভয়ে দিশেহারা মদন পাল দুর্বোধ্য ভাষায় কী যেন ভিড়ের মধ্যে বলে গেল সারাক্ষণ। বড়বাবুর সামনে কথা আটকে গেল গলায়। গলা ছেড়ে হঠাৎ শুধু বলতে পারল, জন্ম-বিচ্ছেদ কাজ বাবু! ঝোড়া আমাকে ভরতেই হবে। মেঝের হোক, ধারির হোক, উঠানের হোক, উসরার হোক। উসরা বুঝলেন না, বারান্ডা!

এই ইস্তক বলে থেমে গেল পাল মদন। বড়বাবুর কি মনে হল, এ লোকটা শুধু চাইতেই জানে। কই, বড়বাবু তো বিরক্ত হলেন না।

নাম মদন একবারও বড়বাবুর সামনে গেল না। কোনও কথা না বলে বটতলায় চুপচাপ বসে রইল। শেষে রাস্তায় দাঁড়িয়ে রইল, মিতের উঠোনে এসে দাঁড়াতে পারল না।

রতনকে একদিন নিশুত দিন-দুপুরে ধরল মৃন্ময়ী।

—তুমি ডেপুটেশনে গেলে না?

—মদনদা বলল, তোর আর গিয়ে কাজ নেই। তাই গেলাম না।

—কেন বলল?

—মদনদার ব্যাপারই ওই রকম।

—কী রকম?

—আমাকে ভালবাসে।

মৃন্ময়ী এবার শান্ত মনে হেসে ফেলল। মদনদার ব্যাপার রতন বলতে পারে? বলল—আমরাও তোমাকে ভালবাসি রতন। আচ্ছা, কুঞ্চিকে তোমার পছন্দ হয়?

—হলে কী করবেন? মারবেন আমাকে?

—না না। তা কেন। তোমার পছন্দ কেমন তাই যাচাই করছি। কেমন মেয়ে চাও, এই আর কী।

—চাই। ধরুন, শিমুলের মতো, ঠিক আছে। কিন্তু...

—কিন্তু কী ?

—আমার বিয়ের ব্যাপারে, মায়ের সঙ্গে মদনদারই কথা হয় ! কী জানেন...

—বলো !

—মা এখনই বিয়ে দিতে চাইছে। মদনদা দেবে না, বলছে পড়াশোনা হোক আগে !

—তুমি করবে ? আমি দেব। তারপর পড়াশুনা তো রইলই। কুঞ্চি সুন্দরী। ওর বিয়ে আটকাবে না। তা ছাড়া পড়াশুনায় ভাল। তুমি কখনও বিয়ে ভাঙিয়েছ ?

—সেকি ! কেন ?

—অনেকে ভাঙায় কিনা ! এই যেমন কুঞ্চির বিয়েই ভাঙিয়ে দিয়েছে।

—কে ?

—সে তোমায় বলব না।

—ও, আচ্ছা !

—কুঞ্চি কিন্তু মোটেও খারাপ মেয়ে নয়। চাকের দিব্যি, শিমুল ভাল মেয়ে রতন !

—পাশ করি আগে, তারপর আপনাকে বলব। বলে চলে যায় রতন। তারপর একদিন সে নিজের থেকে এসে উপস্থিত।

মৃন্ময়ীকে বলল—মা জোর করে বিয়ে দিতে চাইছে, এ কেমন জুলুম বলুন তো ! এখনও মানুষই হলাম না।

—মা জোর করলে তুমি কী করবে। রাজিই বরং হয়ে যাও। নাম কী বলেন ?

—ওহ্, মদনদার কথা বলছেন !

—হ্যাঁ।

—আর বলবেন না। আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। মায়ের সঙ্গে এখন কোনও কথা হয় কিনা। সব ব্যাপারেই তো হয় !

—আমার কথা শুনতে হবে তোমাকে। যা বলব, করতে হবে তোমাকে ! বলতে বলতে পাগলেরই মতন করে বসল মৃন্ময়ী। দু'টি হাত জড়িয়ে ধরল রতনের।

—ভাই, হাত ধরে বলছি তোমাকে, তুমি রাজি হও। বলতে বলতে মৃন্ময়ীর চোখ ভিজে উঠল।

মৃন্ময়ীর মিষ্ট কণ্ঠস্বর, অত্যন্ত মায়াপূর্ণ আচরণ, গভীর সৌন্দর্য রতনকে বশ করে ফেলল। দানো মদন এক রাতে তার উঠোনে সাবধানে

গোপনে বিয়ের আসর বসিয়ে ফেলল।

বিয়ে হয়ে গেল রতন আর শিমুলের। মৃন্ময়ী জানত, অঙ্গনা ঘোষ কুঞ্চিকে বউ হিসেবে মেনে নিতে বাধ্য হবে, ভয় নাম মদনকে। আচমকা বিয়ে হয়ে গেল, দানো ওই রাতে নাম মদন গ্রামে থাকছে না জেনে নিয়েছিল। সবই মিনুর বুদ্ধিতে চমৎকার মিটে গেল।

—কুঞ্চির বিয়ে তো হয়ে গেল মিতে, আপনি খুশি ? বলে উঠল মৃন্ময়ী প্লেটে দু'টি সন্দেশ আর গেলাসে জল এগিয়ে দিয়ে। তখন সন্ধ্যাকাল। ডিবে জ্বলছে তেপয়ে।

সন্দেশ গালে পুরে জল দিয়ে গিলে নিতে নিতে নাম মদন বলল—আমি আর কী বলব মিতিন।

—আপনিই তো বলবেন। নিরাশ হচ্ছেন নাকি! বলে দানো মদন হো হো করে হেসে উঠল।

—নিরাশ কেন হব! বলে অবাক হল নাম।

—হবেন কেন ? নৈরাশার কি সর্বঘটে কারণ থাকে। নৈরাশার ঘট আপনিই ভরে। কী, ঠিক বলছি তো মিনু!

মিনু বলল— এবার আপনি নিজে একটা বিয়ে করে ফেলুন মিতে। নির্মলা পাগল। ও তো আপনাকে মুক্তিই দিয়েছে! বিয়ে করুন, এখান ওখান আর ছুটে বেড়াতে হবে না।

অপমানে সর্বাঙ্গ কাঁটা হয়ে উঠল নাম মদনের। দাড়ি গোঁফ মসৃণ করে কেটেছিল নাম, ফর্সা মুখ রক্তে ভরে গিয়েছে। সে যেন তাঁতের অতল গহ্বরে সেঁধিয়ে যাচ্ছে। পাশানড়ি আঙুলের চাপে ধরতে পারছে না।

কোথায় যেন সহসা রাঙা কোরের মৃদঙ্গ বেজে উঠল। ক্ষুদ্র হাত-ঢোলক বেজে উঠল। এ বাড়ি এখনও বিয়ে বিয়ে গন্ধে ভরা। বাতাসে ভারী হয়ে ভাসছে বৈবাহিক সুবাস। এখনও সবই আছে আস্ত শাঁসেজলে। সাবান, চন্দন, হরিদ্রা, নানা কুসুম, নতুন বস্ত্র, নানা কিসিমের রঙ, পা, হাত, নখ, ঠোঁট রাঙানিয়া সুগন্ধি রসায়ন। গত রাত্রে এখানে বিয়ে হয়ে গেছে। আজ সন্ধ্যায় রতন বউ নিয়ে অঙ্গনার উঠোনে গিয়ে পৌঁছবে বলে মাকে লোক মারফত গো-গাড়ি পাঠাতে বলে সেজেগুজে অপেক্ষা করছে। অঙ্গনা এখনও গো-গাড়ি পাঠায়নি।

মৃৎপাত্র বেচা পয়সায় তো সব করতে হল মদন পালকে। নাম মদনের মাটি, পিটিলি, বাবলা রঙ ধরালো এই নদীকূলের বসতির আঙিনায়। গন্ধ দিল, আলো দিল, সন্ধ্যাতারা জ্বেলে দিল আকাশে। জোনাকি ওড়ানো নদীর কাঁধালে, কাঁখালে, বুকে, অনতিস্পষ্ট শান্ত

স্রোতের শিরায় শিরায়।

ঢোল বাজছে চাষিপল্লীর অঙ্গন-কিনারে, বনকুসুমের সান্ধ্য তিমিরে উতলা হাওয়া গান টেনে আনে।

কেন মরতে এসেছিলাম বিহে বাড়িতে।

আমার চোখ দু'টো তুলে নিয়ে লাইট গড়াইছে।

এই সময় পাড়ার একজন গত রাতের দশোয়ালি হ্যাজাকটা জ্বেলে দিয়ে গেল। শোঁ শোঁ করছে ম্যান্টলের শুভ্রতা, কনের মুখে আলো পড়ে ঝলমল করছে অপার্থিব মুখটি, ভুরু, ঠোঁট, জড়ুল আর তিল। মাটিই এখানে সোনা হয়ে গলায় ঝুলে রয়েছে। হাতে টলটল করছে, নাকে হয়েছে মুক্তোর বিন্দু।

কেন মরতে এসেছিলাম বিহে বাড়িতে।

আমার ড্যানা দু'টো কেটে নিয়ে ব্যালন্ গড়াইছে।

একখানা খাটও যাচ্ছে যৌতুক। সেই পায়ার দিকে চাইল নাম মদন। খাটের সর্বত্র চোখ গেল। ভাঁজ খুলে খুলে রাখা।

কেন মরতে এসেছিলাম বিহে বাড়িতে।

আমার পিঠ কেটে নিয়ে তক্তা গড়াইছে।

মদন কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়াল। রাস্তায় নামল। তখনও সেই চাষিসুরে গান ভেসে আসছে।

কেন মরতে এসেছিলাম বিহে বাড়িতে।

পা দু'টো কেটে নিয়ে পায়া গড়াইছে।

নাম মদন আঁধারে মিশে গেল। রতন আর চুপ করে থাকতে পারল না। বলে উঠল— মদনদাই তো আমার বিয়েটা ইদানীং ফের দিতে চাইত বউদি। শেষের দিকে মাকে কত করে বোঝাচ্ছিল! এ তুমি কেমন করে বললে ওকে! আমার কি মনে হল, মদনদা আমাকে আর কুঞ্চিকে দেখতে এসেছিল। এখন গিয়ে মাকে বলবে, তবে মা গাড়ি পাঠাবে। এত মিষ্টি থাকতে মদনদাকে ওই দু'টো ঘুঘুর ডিমের সন্দেশ খাওয়ালে! সোনা মুখ করে তাইই খাচ্ছিল দাদা! তা-ও করলে কি, যা তা বলে দিলে! এখন কী হবে!

—হবে আর কী! বিয়ে তো হয়ে গেছে। ঘাড় গোঁজ করে বলে উঠল মদন পাল।

ঘণ্টা খানেক বাদে গাড়ি এল। গাড়োয়ান বলল— মদনদা বলেছে, বউ পাঠিয়ে দিতে। আর বলেছে, রতনকে দেখে নেবেন! ইস্। চল, চল, রাত হচ্ছে!

এরপর আরও এক ঘটনা হল। আরও দুই মদন ছিল দিগরে। ঢোল

মদন আর কাঁসি মদন। ঢোল আর কাঁসি দুই মিতে মিলে নানান উৎসবে বাজনা দিয়ে বেড়াত লোকে চাইলে। তা ছাড়া পারিবারিক বল আর বারোয়ারিই বল, পুজো বড় হোক, ছোট হোক, ডাকলেই ওরা যেত।

যখন ওরা ডাক পেত, পথের উপর দিয়ে ঢোল কাঁসি পেটাতে পেটাতে, নাচতে নাচতে চলে যেত। ফিরতও নেচে নেচে আর বাজাতে বাজাতে। লোকে ওই ধুমধাড়াক্কা শুনে জেনে যেত কোথায় কী হচ্ছে!

এক ঝাপসা পূর্ণিমা রাতে ওরা চৌমোহনীর কিসের একটা আসরে বাজিয়ে ফিরছিল। হঠাৎ কাঁসি না ঢোল থেমে গেল। কী বেত্তান্ত? না, পায়ে কাঁটা ফুটেছে। বলা কঠিন কে আগে আর কে পিছে বাজাতে বাজাতে যাচ্ছিল। মানুষ অত মনে রাখতে পারে না। রাখবে কী করে, মদন যে!

তো, ঢোল বা কাঁসি যেকোনও একটা আগে চলে গেছে! এদিকে কাঁটা ফুটলে পিছনের মদন সেই কাঁটা পায়ের তালু থেকে তুলে ফেলার জন্য থেমেছে। কোন পায়ে যেন ফুটেছে!

যাই হোক। কাঁটা তুলছে এক মদন। অন্য মদন সামনে এগিয়ে চলে গিয়েও বাজিয়ে চলেছে। ভাবছে পিছনে কিছু একটা হয়েছে, আপনিই বেজে উঠবে বাদে। দৈবাৎ হল কী, সামনের মদনকে সাপে দংশাল, বধির কোনও সাপে! সামনের বাজনা থামল তো পিছন বেজে উঠল।

পিছনের মদন ভাবল, তার বাজছে না দেখে সামনের মদন থেমেছে। ঘটনা এইই মাত্র। সাপে কামড়ালেই কি মানুষ মরে! ঝাড়ফুঁক করেই অনেক সময় অলৌকিকভাবে বেঁচে যায় মনসার কৃপা হলে।

কী হল মদনের! মদন কি মরে গেল নাকি! লোকের হয় অসুবিধা। অন্তত কোনও একটা মদনকে দেখতে ছোটে। যাদের কামড়ায়নি তারাও কিঞ্চিৎ ছোটাছুটি করে। খবর আনে। এইভাবে ঘটনা সাব্যস্ত হয়।

মজা হল, নাম মদনকে কত লোক যে দেখে গেল। তাঁত বুনতে বুনতে নাম মদনকে বলতে হল— ঢোলকাঁসিকে কামড়েছে গো। আমি মরিনি। লোকে দেখতেই পাচ্ছে বেঁচে আছে দিব্যি। তবু নামকে বলতে হল, সত্যিই সে বেঁচে রয়েছে।

চার মদনই থাকত চাষি এলাকায়। এক মদন, কুম্ভকার, সে থাকত গঞ্জের কাছাকাছি, মাঠপাড়ায়। নিয়ম যা, তাতে দানোর উচিত ছিল, কে মরেছে খোঁজ করা। কারণ চাষি অঞ্চলের কোনও এক মদনকেই সাপে কেটেছিল। খোঁজ নিল না মদন পাল।

নামের মনে হল, মিত্র মদন আর মিত্র নেই। সে সবই হারিয়েছে।

মৃন্ময়ী যথেষ্ট উতলা হল। স্বামীকে বলল— একবার খোঁজ নিলে না। যদি উনিই মরে গিয়ে থাকেন!

দানো বলল— সাপের লেখা, বাঘের দেখা মিনু। খণ্ডাবার নয়। আসলে তেনার কপালে অপঘাত থাকলে আছে! বড়ো বাবা বলেছিলেন, একজন কেউ যাবে, হয়তো একটু উল্টোপাল্টা হয়ে গেল! আমরা অত্যন্ত সুখে আছি মৃন্ময়ী! বোনটার বিয়ে হয়ে গেছে।

স্বামীর কথা শুনে অত্যন্ত ব্যথিত হল মৃন্ময়ী। সেই যে কুঞ্চির গোপন বিয়ের পরের সন্ধ্যায় এল মানুষটা, তাকে অপমান করে তাড়িয়ে দিল তারা, তারপর আর আসেনি। সত্যিই কি তবে মরে গেল! রতন এসেও বলে যেতে পারত!

মৃন্ময়ী বলল— তা হলে এতকালের সম্পর্ক আমাদের! সব শেষ!

—মানুষ মরে গেলে সবই তো শেষ হয় মিনু!

—তুমি কী করে জানলে মিতে মরে গেছে!

—মরে গেছে কখন বললাম! তুমিও যেমন, কথার মানে বোঝো না! মরলে তবে তো।

—তার মানে, মরুক তুমি চাও!

—কেন চাইব। উনি আমার মিতে।

—বাজে কথা! বলে কেমন কষ্ট বোধ করল মৃন্ময়ী। আর আশ্চর্য হল, মাটির সম্বন্ধের মধ্যে আর কোনও মায়া অবশিষ্ট নেই। কখনও হয়তো ছিল। মানুষ সম্পর্ক ফাঁদে কেন?

পরের দিন হাটবার। সরণি ধরে নদীর কাঁধাল দিয়ে যাচ্ছে লোক হাটমুখো। জনে জনে ধরে মৃন্ময়ী শুধাতে থাকল— আমাদের মিতের খবর জানো কেউ?

—কেন, মিতের কী হয়েছে!

—শুনেছি সাপে কেটেছে একজনকে! বেঁচে আছে তো?

—আছে। তবে কোন মদনকে কেটেছিল বলতে পারব না। বাঁশি বাজায় ওটা না কাঁসি বাজায় সেটা!

—বাঁশির মদন আগেই মরেছে। তুমি কিছুই জানো না।

এইভাবে খোঁজ নিল মৃন্ময়ী। কমবেশি তামাম দিন। তারপর ভাবল, বেঁচে তো আছেন তিনি। তারপরও কেন শুধোচ্ছি জনে জনে! এ কেমন মন আমার! চোখ দু'টো কি তাকেই দেখতে চাইছে। বেঁচে আছে শুনেও মন ভরছে না! এ আমি কী করলাম ধরিত্রী। কী করলাম বসুন্ধরা, মাগো!

নাম মদনের মেটেল ঝোড়ায় ভরতে ভরতে মৃন্ময়ী পাল চোখে

চিকনো জল এনে ফেলে গুহার মুখে উবু হয়ে বসে পড়ে। বুকটা কেমন টাটাচ্ছে। সে কাপড়ের তলার নগ্ন বুকে ঠাণ্ডা মেটেল দলে দলে মাটিকে শুষে নিতে চায়। কেমন আরাম লাগে হৃদয়ে।

বর্ষা-বন্যার জল নামতে শুরু করলে ভাঙন লাগে কাঁধালে। অবশ্য জলভরা নদীতেও পাড় ভাঙার কাজ চলে। তবে জল নামার সময়ই দাপানি বেড়ে যায়। বর্ষা শেষ হয়েছিল। পাড় ভাঙছে।

মৃন্ময়ী পাড় ভাঙা দেখছিল। মিতের জমির উপর নদীর চোট এবার সবচেয়ে বেশি। কী একটা অদ্ভুত আক্রোশ। কখনও কখনও নদী বিশেষ একটা জমিকে ধ্বংস করার জন্য আক্রমণ কেন্দ্রীভূত করে। অনেকটা যুদ্ধের মতো। নদী যেন সেই বিশেষ কিনারে তার অধিকাংশ সৈন্যদের পাঠিয়ে দেয়।

নদী হঠাৎ মিতের জমির বুকটা গাভলা করে চিরে দিল। চিরে ফাঁক করে ধর্ষকামী জীবের মতন তোড়ে আছড়ে আঁচড়ে ঢুকে পড়ল পালেদের রাস্তার সীমানা পর্যন্ত।

এই ধরনের ঘটনা জনগণকে বিস্ময়ে-ভয়ে স্তব্ধ করে দেয়। পাড় ভেঙে নদীর এইভাবে ঢুকে পড়াটা মেনে নিতে পারা যায় না। জমির এমন ভয়াল বিক্ষত চেহারা, যার জমি সে সইবে কী করে। তা ছাড়া, নদীই কি পালেদের এবার উচ্ছেদ করে দেবে।

জল নেমে গেলে পালেরাই দল বেঁধে গাভলার নদীমুখে অর্থাৎ এক্ষেত্রে চেরা দহের মতন মুখটায় বাঁশ পুঁতে মাটি ফেলে বাঁধ দিল। নাম মদনের জমি শেষ হয়ে গেল। প্রায় অর্ধেকটাই খেয়ে দিয়ে গেল এবারের বর্ষা। জমি যা রইল তাকে আর থাকা বলে না। চেরা জমি কেউ কিনবে না।

সকলেই মনে মনে কোনও এক অদ্ভুত অভিশাপের কথা চিন্তা করে। নাম মদন শাপগ্রস্ত। রক্ষা এই যে, এই বৎসর যেখানে যা করে গেল নদী, সামনে সন সেই স্থানকে আর ঠোকরাবে না। অবশ্য বাঁধ না দিলে ঢুকে পড়বে। সামনে বছর বর্ষায় কতটা স্ফীত হবে নদী বলা যায় না। সাধারণত একবার যে-স্থান এমন ভয়াবহ করে ভেঙে খেয়ে গেল, সেখানে ফের মুখ দেবে না, এই আশ্বাসকে বারংবার বলা কওয়া করে মানুষ মনের মধ্যে দৃঢ় করে নিতে চায়। অন্যথা হলে সেই সর্বনাশ কল্পনা করতেও পালেদের বুক শুকিয়ে আসে।

কিন্তু তার আগে সর্বসাধারণের করুণার পাত্র একজনই, শাপগ্রস্ত নাম মদন। চাষিরা কত রকম বলাবলি শুরু করে দিল। এমনকি শাপের

উৎসও নির্ধারণ করল তারা। তারা প্রায় নিশ্চিন্ত হয়ে গেল, মৃন্ময়ীর সঙ্গে নাম মদনের সম্পর্ক চোরা এবং নোনা।

কারও জমি তো এভাবে নষ্ট হয়নি। রাতারাতি এ কী হয়ে গেল নাম মদনের! একটু একটু করে এতদিন ফুরিয়ে আসছিল সে, হঠাৎ এ কী হল। একথা মদনের কানে কতভাবে বলা হতে থাকল! সাবিত্রী এসে সেই জমির কোলে দাঁড়িয়ে মুখে আঁচল চেপে ফুঁপিয়ে উঠল। দু'চোখে কী ব্যথা জেগে উঠল। কী ব্যথা, কী বিমর্ষ স্বপ্নভেজা দৃষ্টি! বুকের ভেতরটা কেমন খাঁ খাঁ করে উঠল। সঙ্গের পাগলীমেয়ে নির্মলা সুবিপুল খাদের দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল। তারপর আচমকা হিহি করে হেসে গড়িয়ে পড়তে লাগল। এ জমি বেচে তার বিয়ে হত! সাবিত্রীর বুঝতে বাকি রইল না, মেয়ে কেন ওভাবে হাসছে! পাগলই এই অবস্থায় হাসতে পারে!

সাবিত্রী যখন এইভাবে জমি দেখছে ঘোমটার আড়াল থেকে অপরাধীর মতন, শাপগ্রস্তের মতন তখন ভাঙা খাদের কিনারে দাঁড়ানো চার-বাবলার তলায় দাঁড়িয়ে রয়েছে মিনু। সাবিত্রীর চোখ যায় বাবলা গাছলার তলে দাঁড়ানো পাল-বউয়ের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে সাবিত্রীর অন্তর রি রি করে ওঠে। এই অভিশাপ কার জন্য, কে এই শাপের হেতু? ওই মেয়েই সাবিত্রীর সর্বনাশ করে ছাড়ল!

মদন সইতে পারবে না ভেবে এই ভগ্ন, খাওয়া, ভাঙনে পতিত, সর্বনাশা জমিটিকে দেখতে আসেনি। ঠেলে পাঠাতে পারেনি মদনকে সাবিত্রী। কত লোক গিয়ে বলেছে, জমিটুকুনই দেখে এসো তোমরা। এ যেন প্রিয়-বিয়োগের ব্যথার সঞ্চার করে লোকে।

মদন যেন প্রতিজ্ঞাই করেছিল দেখবে না। সাবিত্রী ছেলের মনের কথা ভেবে হিহি করে হেসে ওঠা মেয়ে নির্মলার মুখ চেপে ধরল হাত দিয়ে, আঁচল দিয়ে।

—চুপ। চুপ! হাসে না নিমি! নদী শুনতে পাবে! লোকে দেখলে হাসবে। ওই দ্যাখ, আমাদের কেমন করে দেখছে পাপিষ্ঠা! চোখ দু'টি দ্যাখ, সরু করে সাপের মতন তাকাচ্ছে! এই জমিতেও খুপড়ি মারবে দানোর মাগ। চোখ দিয়ে জরিপ করতে এসেছে। যা, যা। শাপের হাওয়া, চলে যা!

দূর থেকে দাঁড়িয়ে, অতি দূর নয়, ওই তো গাছটা, সেখান থেকে কান পেতে মৃন্ময়ী শোনবার চেষ্টা করল। চাপাস্বর শুনল, ভাষা বুঝল না। কিন্তু দৃষ্টি দেখেই বুঝে গিয়েছিল, সাবিত্রীর চোখে কত আগুন। কী তীব্র বিষ! কী কান্না!

ভয়ে মৃন্ময়ী কিসের তাড়সে বাবলার তলা থেকে সহসা বাড়ির দিকে জমির উপর দিয়ে ক্ষিপ্র বেগে হাঁটতে শুরু করল, পালিয়ে এল। মানুষকে, বিশেষ ওই মেয়েমানুষকে, সবিশেষ মেয়েমানুষের দৃষ্টিকে এত ভয় কখনও পায়নি মিনু পাল। বুকের ভেতরটা মাটির গুহার বানজলের মতন খলবল করছে, মাথা টিবটিব করছে। গলা শুকিয়ে এসেছে।

বাড়িতে পাল নেই। পিটিলির খোঁজে বেরিয়েছে। রামদা হাতে বেরিয়ে গেল, কোথায় যাবে ঠিক করে বলে যেতে পারেনি। রামকৃষ্ণপুরের মেলার পোন সাজাতে হবে। এত মাটি দিয়েছিল মিতে যে, ওই দিয়ে মেলার বাণিজ্য হয়ে যাবে। এখন সেই মাটি ছানতে গেলে মিনুর বুকটা টনটন করে। মনে হয়, মিতেকেই যেন পিটছে সে, মন্থন করছে নামের হৃদয়।

একবার যদি দেখা হত। একবার। কী বলত মৃন্ময়ী। কোনও কথাই তো বলতে পারত না।

তাঁতের গর্ত থেকে আর উঠতে চাইছিল না মদনের মন। কোথাও যাওয়ার উৎসাহ ছিল না। তাঁতের কাজের জন্য যতটুকু বাজারহাট-গঞ্জে যেতে হয়, সুতো আনতে বা বোনা কাপড় দিতে, তা-ও সে পাগলি বোন নির্মলাকে দিয়ে করিয়েছে, নির্মলা ঠকে এসেছে হয়তো, কিন্তু ঠকা-জেতা নিয়ে আর মাথায় ঘামায় না নাম।

ধর্মের কথাই সত্য। মিতে-মিতিন তার কাছ থেকে যা নিয়েছে, তাকে নেওয়া মনে করে না তারা। তারা প্রকৃতির কাছে থেকে নেয়। প্রকৃতিকে দখল করা ওরা নিজেদের অস্তিত্বের বেলা মানে, অন্যের বেলায় স্বীকার করতে চায় না। দাগ-খতিয়ান মানতে বাধ্য হয়েও ঝোড়া ভরবার সময় সেই হিসেব অস্বীকার করে।

তা নইলে ওরা বাঁচত বা কী করে। বাঁচার জন্য তাদের নিজেদের মেঝের মাটি অবধি কোপাতেও প্রস্তুত। স্বর্ণকার সোনা চুরি করবে, এমনকি পরিবারের সোনা পর্যন্ত। কর্মকার ইস্পাত চুরি করবে। চর্মকার ভাগাড় থেকে অন্যের গরুর ছাল চুরি করবে। তন্তুকার আহার খাইয়ে থান চুরি করবে। তা হলে কুম্ভকার কেন অন্যের মাটি চুরি করবে না।

এই সব করে বলেই জীবন তাদের অভিশপ্ত। তা ছাড়া মৃত্তিকা জননী, মৃত্তিকা যোনিনী, তাকে পোড়ালে শাপ অনিবার্য। এ সংস্কার দূর করা কঠিন। ভারতের শিক্ষার টিমটিমে আলো দিয়ে এ হীনতা দূর করা যাবে না। মদন ভাবল, এ দূর হলে সেইবা কোথায় যেত। হিংস্র মাটির ধমনীতে চরে বেড়ায় সে। বেকার জীবনের চাকরি এই তাঁত, এ করে জীবনকে সিধে রাখা হাস্যকর। শাপ তাকেও লেগেছে। সত্যিই তো,

সে মৃন্ময়ীকে কতভাবে পেতে চেয়েছে, কত কায়দা করেছে, নদী নিজেই লালসাযুক্ত, মানুষের বাসনা সহ্য করে না।

ভালই হল। বাসনার কী চমৎকার নিবৃত্তি হয়ে গেল! শাপগ্রস্ত, লোভী তন্তুবায়, প্রবাদ আছে, লোভেই নষ্ট সে। নষ্ট, নষ্ট, নষ্ট ; আর কিছু নয়। বাংলাভাষার প্রবাদগুলির মধ্যেও কত অপমান লুকিয়ে আছে ব্রাত্যের জন্য। অতি লোভ কি ভদ্রজনের থাকে না!

যৌন-পিপাসায় নাকি স্বর্ণনগরী পুড়ে যায়। ব্যাবিলন ধ্বংস হয়। ট্রয়ের যুদ্ধ, তা-ও যোনিনী আখ্যান, যৌনে অস্ত যায় সভ্যতার সূর্য। কী মূর্খ নাম মদন, সে তার অন্তরকে জাগিয়ে তুলেছিল।

তবু মৃন্ময়ীকে মাটি রূপে পেল না নাম মদন। তার আগেই সে শাপগ্রস্ত হল! মাটি নেই, তার আর বাসনা কিসের! কিসেরই বা মিতেলি! কিসের ধর্ম, কিসের বন্ধন। কই, সাপে কেটেছে শুনে একবারও তো দেখতে এল না মিতে!

নাম মদনের মৃত্যুই কামনা করেছে দানো মদন! চঞ্চল মাটির সম্বন্ধ ক্ষণভঙ্গুর, মৃৎপাত্রের মতন ভেঙে যায়। কখন যে ফস্কে পড়ে, কখন যে চূর্ণ হয়! মাটির কাছাকাছি থাকলেই কি মানুষ সহজ হয় নাকি!

তার পায়ে হাত দিয়ে আবেগে ভেসে কেঁদে ওঠে যে মদন পাল, তা এক মস্ত তামাশা! নির্জ্ঞান স্বার্থই জীবন। কিন্তু স্বার্থের নানান মুখ আছে, কোনওটিতে স্বার্থের এত মায়া জড়ানো যে, ভালবাসা বলে মনে হয়। মিত্র। কে মিত্র তার! পা ধরে কাঁদা লোকটা?

কেউ না। কেউ নেই। মানুষের প্রেম মাংসাশী। মিতিনকে দেবে কেন দানো? মিতিনই বা আসবে কেন? জমি গেছে, এবার শুধু সন্ন্যাস।

নদীর কাঁধালে এসেছে আজ মদন এই অপরাহ্ণে। আশ্বিনের শেষে। একটা বেশ কনকনে হাওয়া দিচ্ছে নদী। দহ পড়া ভয়াল চেরা জমির ভাঙনে নেমে নাম মদন কী করছে। জমির যেন ক্ষতস্থানে হাত দিয়ে স্পর্শ করছে বারবার। গলায়, বুকে হাত দিয়ে ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখছে। আমারই ছিল এই সব! এখনও আছে, কিন্তু মাটি আছে, জমি আর নেই। গাভলার জমি দরবিহীন, সম্মানহীন, ঝুনোট, অর্থহীন যেন বা!

এই মাটিকেও কি খাবে পালেরা? এ যে ধর্ষণের পর হত্যা! কথকতা আছে, মৃতাকেও ধর্ষণ করা যায়। লোকেরা শাস্ত্র বলে কাহিনীর ফান্দায়, কাম মৃত্যুকেও মানে না। এখান থেকে এক ঝোড়া মাটি, জোর করা, তা-ও কি সম্ভব? কে করবে? কেউই নেবে না।

সহসা ওদিকে ও কী! আগুন। মৃন্ময়ীর ঘর পুড়ে যাচ্ছে! আগুন

লাগল কী করে ! কী সর্বনাশ। লাল আগুন। রক্তাক্ত মেঘ-শোণিতের সুতীব্র আভা। গলগলে ধোঁয়া আর মহাপাবকের ধূম। চড়চড় পড়পড় করে শব্দ ভেসে আসছে ক্ষণে ক্ষণে। অভিশপ্ত নারীই তা হলে পুড়ছে। ইস্। মিতের সব গেল ! গৃহ এবং নারী। সে নিজেও কি গেল ! নাকি শুধু ঘরটাই ?

দ্রুত ছুটে এল নাম মদন দহ-পড়া ভূমি ছেড়ে ! বাড়ির মধ্যে বোকার মতন ছুটে ঢুকে পড়েই মনে হ'ল, ইস ! কী বোকা আমি ! এ তো ভাঁটার আগুন !

চিত্তের কী আশ্চর্য বিভ্রম ! নাম মদন কি জানত না এমন আগুন কী করে হলকা দেয় পালেদের পোনকে ঘিরে ! পোন-ঘরের চালা ভেদ করে অবিরল ধোঁয়া ! আগুন লি লি করে। পেঁচিয়ে ওঠে, বাতাস খেলিয়ে তোলে আগুনের তরল প্রবাহে। দেখে মনে হয় সব পুড়ে ছারখার হয়ে গেল।

পোনের ভাঁটা গোলাকার। মাঝখানে বসানো যাঁত বা শান। হাঁড়ির ভাঙা ভাঙা ছাইমাখা মুণ্ডু, যেন রাবণের দশ মাথার চক্র, দেখে ভয় লাগে। এই যাঁতকে ঘিরে গোল করে বসানো হয় মৃৎপাত্র, বাতা হওয়া মাটির পাত্র অর্থাৎ শুকিয়ে নেওয়া পাত্রগুলি, ফাঁকে ফাঁকে বসে বাবলা বা পিটুলির লকড়ি অর্থাৎ ভরনা। ভরনায় আগুন ধরে গেলে ধোঁয়া ছেড়ে আগুন ছলকে ওঠে, তখন আগুন নরকের অধিক। যেন লঙ্কাকাণ্ড বেধে ওঠে পালবাড়িতে। মানুষ দেখে ভয় পাবে, পোনের চাল, চালের কাঠামো, বাঁশ, কাঠ সব আগুনে ঝলসে গেল বলে !

অথচ পাল জানে, কিছুই হবে না। আগুনের দৌড় তার মাপা আছে। আগুনের পরিসীমা কতটা পালই শুধু জানে। তবু কখনও তারও বুঝি ভয় করে।

পোনের কাছে দাঁড়িয়ে ফুলনড়ি দিয়ে ফুঁড়ছিল মাঝে মাঝে মৃন্ময়ী। ধোঁয়া কমেছে, এখন ঝাঁ ঝাঁ করছে ঝাঁঝরির মতন আগুন। ভাওয়া দিয়ে আগুন জিভ বার করছে। ভাঁড়ার গায়ে ছোট ছিদ্রকে বলে ভাওয়া।

মৃন্ময়ী জানে না উঠোনে কে এসে দাঁড়িয়েছে। পাল বাড়িতে নেই। আগুন উসকে দিয়ে বাজারে গেছে কী একটা আনতে। একা পোন আগলাচ্ছে মিনু পাল। ওর দুই কাঁধের দু'পাশে জড়ো হয়ে নেমেছে দড়ির মতন শাড়ির বহর। একটি বুক সম্পূর্ণ প্রকাশিত, তাতে লেগেছে কৃষ্ণচূড়া রঙের আগুনের জিহ্বা। সমস্ত ফর্সা মুখে নিষ্পাপ আগুন। স্কন্ধে, গলায়, থুতনিতে আগুনের উষ্ণ ফাগ। ঘাম চিকচিক করছে।

আগুনের এমন ভয়াবহ তাপে কী সুন্দর দেখাচ্ছে মিতবউকে। চূর্ণ

কুন্তল লেপ্টে গেছে কপালের ঘামে, গালে অবধি। মদন এগিয়ে এসেছে পায়ে পায়ে ; আগুনের মতন তার নিঃশ্বাস ফুঁসিয়ে উঠছে। মন দিয়ে কাজ করছে মিনু। আগুনের শব্দে, কিছু ধোঁয়ায় সে কাউকেই দেখছে না।

সন্ধ্যা নামছে। আগুন আরও গাঢ় হয়ে উঠল। হঠাৎ চোখ পড়ল নামের উপর।

মৃন্ময়ী তার নিজের আগুন তাপিত বিষণ্ণ মায়াপূর্ণ চোখকে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিল না। ফুলনড়ি হাত থেকে খসে গেল তার। এ মুহূর্তে সে তার বুকের কাপড় ঠিক করতেও ভুলে গেল। ঘুরে দাঁড়াল আরও স্পষ্ট হয়ে।

নাম থতমত করে বলল— বিশ্বাস করুন মিতিন, আমি ঠিক বুঝতে পারিনি। ভেবেছি আগুন লেগেছে বুঝি ! পাগলের মতো ছুটে এলাম। নিজেকেই আমি কেমন চিনতে পারছি না। কেন এমন হল ! সত্যি বোধহয় আপনাদের ভালবেসেছিলাম। মিতে কেমন আছেন ?

গড়গড় করে এত কথা বলে দম নিল নাম। মৃন্ময়ী কোনও উত্তর দিতেই পারল না। মিনু চুপ করে আছে দেখে নাম মদন সলজ্জভাবে বলে উঠল— মিতে নেই দেখছি। আচ্ছা, চলি। বলে ঘুরে দাঁড়াল দেবনাথ। তারপর উঠোনের মাঝামাঝি চলে আসতেই মৃন্ময়ী ডেকে উঠল— শুনুন !

দেবনাথ থেমে পড়ল। পিছনে এগিয়ে এসে ছায়ার মতন সন্তর্পণে দাঁড়াল মিনু। বলল— আমার কথা আছে। শুনবেন না ?

— আমার কিন্তু শেষ হয়ে গেছে।

— তা হলে এলেন কেন ছুটে ?

— সত্যিই বলছি, আগুন দেখে কেমন ভয় করল। ভাবলাম আপনারা বুঝি...

— আমি আসছি, নদীর ধারে দাঁড়াবেন একটু ?

— এখানেই বলুন না !

— এসো !

নতুন এবং অপ্রত্যাশিত এই সম্বোধন এবং আহ্বানে প্রথমে কেমন চমকে উঠল নাম মদন। অনেকটাই তার নিজেকে বিহ্বল ঠাওর হচ্ছিল। নারীর স্বরে মাদকতা ঘনিয়ে উঠল আর কেমন আঠালো শোনাল 'এসো' বলার সুর।

'এসো' বলার আধ মিনিট বাদে সামনে এসে নাম মদনের হাত ধরল মৃন্ময়ী।

— কিন্তু.. বলে কথা হারিয়ে ফেলল মদন দেবনাথ।

— ওর ফিরতে রাত হবে। হালদার পাড়ায় নৌকা বলতে গেছে। বলেই হাত ধরে ঘরে টেনে নিয়ে গেল নামকে মিতিন।

নাম মদনকে ঘরের চৌকির উপর বসাল গা ধরে মৃন্ময়ী। ঘরের তাকে ক্ষীণ শুভ্র দীপালোক। বাইরে সন্ধ্যার আকাশে স্নিগ্ধ চাঁদের বাঁকা ফালি। একটি কেমন ঘোরলাগা কিরণ, আঁধারকে মেজে ঈষৎ পরিপাটি করেছে। ঘরে ছায়ার মতন বসেছে ওরা।

ওই দীপালোকে গায়ের বসন সম্পূর্ণ ফেলে দিল মিতবউ। বলল— আমাকে নেবে ? সব রাগ, সব অপমান, সব জ্বালা যদি মেটে আমি রাজি ! আর আমার কিছুই দেওয়ার নেই তোমাকে !

— মিতিন !

— বলো !

— আজ যে কিছুই নেই আমার। সব চলে গেছে। চাইলে আর কিছুই দিতে পারব না।

— তোমার অন্তর, তা-ও কি নেই ?

— আমি অভিশপ্ত মিতবউ !

— যে-পাপে পুড়েছি, সেই পাপ আজ সত্য হোক নাম। বলে মৃন্ময়ী দু'হাতে নাম মদনকে জড়িয়ে ধরে বুকের দিকে টানল। উঠে দাঁড়িয়ে নামের মাথাকে নগ্ন বুকে চেপে ধরল। শিশুর ঠোঁটের মতন নামের ঠোঁট নগ্ন বুকের বৃন্ত খুঁজে নিতে চাইল। মৃন্ময়ী আশ্চর্য হল, এই দুর্বৃত্ত এক শিশু ছাড়া কিছু নয়। নারীসঙ্গের কোনও অভিজ্ঞতাই লোকটার নেই। হাত বাড়িয়ে ছুঁতে চাইত জোর করে ! তখন একে দস্যু মনে হত !

এ মুহূর্তে অনেকটাই শিশুর বিস্ময় আর শিশুরই দস্যুতা যেন। বুকের সঙ্গে চেপে শিশুকে যেভাবে অন্তরে মেশাতে চায় মন, মৃন্ময়ীর তেমনই আকাঙ্ক্ষা হয়।

নামের রাগ নেই, অপমানের জ্বালা নেই, ক্ষুধার্তও মনে হয় না একে, কেবলই এক শান্ত দুর্মর পিপাসা শরীরে জড়ানো। শরীর কখনও কি অন্তর হয়ে ওঠে ! চাকের মাটির মতন শরীরই অন্তরময় হয় ! সামান্য বিদ্যা হলেও মাটির এই স্বভাব তো মৃন্ময়ীর চেনা। এ উপমা তার কাছে কঠিন নয়।

তা হলে কি নারী তার পুরুষের দেহকে অন্তর রূপে পেতে চায় চিরকাল ! এত কোমল কেন নামের দেহ ! এত হালকা, এত নম্র, এত আলাদা !

নামের মিলন-মুহূর্তে এবং মিলন শেষে মনে হল, নারীদেহ কি এতই

সকৃতজ্ঞ হয় ! আর এই কৃতজ্ঞতা তুমুল আশ্লেষ হয়ে অন্তরে বাহিরে প্লাবিত করে দিল তাকে। সে কেমন আচ্ছন্ন আর পূর্ণ হয়ে গেছে।

হঠাৎ মৃন্ময়ী নামের গলায় বুকে হাত বুলাতে বুলাতে এবং কপালের মাঝখানে চুমু দিয়ে সহাস্যে বলল— কেমন শোধবোধ হল তো ! বলো না !

—শোধ ! চরম আশ্চর্য হয়ে গেল নাম মদন। তার সব সুখ মুহূর্তে নষ্ট হয়ে গেল। কালো আর শুকনো হয়ে গেল সে মৃদু দীপালোকে। শরীরে কেমন যন্ত্রণা হতে লাগল।

নামের এই চেহারার রূপান্তর সহজেই চোখে পড়ল মৃন্ময়ীর। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, জিহ্বা কী অসতর্ক বস্তু, তার অন্তর তো একথা বলতে চায়নি। ভেতরের চাপা অপমানিত অস্তিত্বই কি তার মুখ দিয়ে একথা চেগে উঠে বলিয়ে নিল ! সত্যিই কত খারাপ কথা বলেছে সে !

মৃন্ময়ী ক্ষমা চাইবে ভাবল। তার আগেই নাম ঘর ছেড়ে বাইরে উঠোনে চলে গেল।

—চলে যাচ্ছেন ! বলে বিমর্ষ সুরে কথা বলল মৃন্ময়ী।

নাম উত্তর দিল না। তার চোখে জল এসে পড়েছিল। জলকে সামলে নেওয়ার জন্য চাঁদের দিকে চাইল। কী বিষণ্ণ ওই চাঁদটা ! এও কি তবে গতিকের মিলন ! মিতিন কি কমবেশি গণিকা মাত্র। তেমন আচরণই কি করেনি তা হলে !

তারপর রাস্তায় নেমে আপন মনে হেসে ফেলল মদন তন্তুবায়। শোধবোধ ! কৃতজ্ঞতা অনেক বড় ব্যাপার। এ যে হিসেবের কড়ির মতন দেহের ব্যবহার ! ছিঃ !

কেন ছিঃ মদন। দেহ চেয়েছিলে দেহ পেয়েছ। ব্যাস ! দুঃখ পাচ্ছ কেন ? দেহ পাওয়ার পর মনের দিকে হাত বাড়ানো কেন ? কিন্তু কেন নয় ? মিতিন যে অন্তর চাইলে হে !

—অমন কথা হয়তো একটা বেশ্যাও বলে। তা হলে কোন পাপে এতক্ষণ পুড়ল এই দেহটা।

নদীকে একটা প্রণাম করল মদন। তারপর বলল— পাপী ! তোকে ঘৃণা করি ভৈরব !

সারারাত বিছানায় শুয়ে ছটফট করতে থাকল নাম মদন। ঘুম এল না। কেমন গুমরে গুমরে উঠতে থাকল বুকটা। তার আর জীবন-বিস্ময়ের অবধি রইল না। এইই তবে দেহ, এইই তবে মৃন্ময়ী। মাদকের মতন চেতনায় নেমে আগুনের মতন জ্বলছে, অন্তরে রাবণের পোন প্রজ্জ্বলিত হল !

সমস্ত রাত্রি পোন আরও হল অগ্নিময়, আরও লেলিহান। চৌকিরই উপর আলুথালু হয়ে, অসংবৃতা মৃন্ময়ী ঘুমিয়ে পড়েছিল। মদন পাল মাঝরাতে বাড়ি ফিরে প্রথমে পোনের কাছে গেল। তারপর স্ত্রীর পাশে এসে শুয়ে পড়ল। ঘুমন্ত বউকে নিজের দিকে আকর্ষণ করলে বউ কঠিন হয়ে রইল, সামান্য বিরক্তও হল এবং কিছুতেই সাড় দিল না। দানো ভাবল, পরিশ্রম তো কম গেল না ! শরীরের আর দোষ কী !

গভীরতর হল রাত্রি। শেষ রাতের দিকে মৃন্ময়ী নামকে স্বপ্নে দেখতে পেল। কেন যেন বারবার মিতে মিতে বলে ডেকে উঠল। নাম যেন তাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে। কোথায় চলে যাচ্ছে, একটা গর্তের মধ্যে ডুবে যাচ্ছে কেন !

নামকে ডাকতে ডাকতে ঘুম ভেঙে গেল মৃন্ময়ীর। বিছানায় উঠে বসল। বুকের মধ্যে আশ্চর্য কষ্ট হতে থাকল। ভয়ানক তেষ্টা পেয়েছিল। মৃদু দীপালোকে স্বামীর ভারী দেহ ছায়ার মতন পড়ে রয়েছে। একবার সেই দেহ আলতো করে ছুঁয়ে বিছানা ছেড়ে নেমে কুঁজো থেকে গেলাসে জল গড়িয়ে নিয়ে খেল মিনু।

জল খেয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল মৃন্ময়ী। আবার চোখ তুলে স্বামীর মুখের দিকে চাইল। কোনও দিনই বেচারি স্ত্রীর পাপের কথা বুঝি টেরও পাবে না। কথায় কখনও পারে না মৃন্ময়ীকে। এমনভাবে কথাকে সাজিয়ে তুলে ধরে মিনু যে, সব কেমন ঘোর লেগে যায় পাল মশাইয়ের।

স্ত্রীর রূপমুগ্ধ, গুণমুগ্ধ দানো। স্ত্রীর বুদ্ধিতে চলে প্রতিটি ধাপ। স্ত্রীর রূপকে ভয় পায়, সন্দেহও করে। কিন্তু সন্দেহ প্রমাণ করার সাহস কম, যুক্তিও পায় না। কিছু দূর কায়দা করার পর খেই হারিয়ে ফেলে।

সন্দেহ একজনকেই। বড় বাবা কত ধন্দেই না ফেলেছে তাকে। সব সময় ভাবে, সে মরে যাবে। মৃন্ময়ী জানে, পালের কিন্তু মৃত্যুর প্রতি এক অদ্ভুত ভয়-মিশ্রিত আসক্তি রয়েছে। সারা দিনে একবার অন্তত মৃত্যু সম্বন্ধে চর্চা করা দানোর প্রবৃত্তি। মৃত্যুর কথা শুনিয়ে স্ত্রীকে কাছে টানতে চায়।

পাল বলে অভিশাপের কথা ; মৃত্যুর কথা। নামের জমিতে নদী ঢুকে দহ ফেলে দিলে লোকেরা যে শাপের কথা গাওনা করেছিল, সেই চর্চায় কেমন অদ্ভুত বিষণ্ণ হয়ে উঠেছিল লোকটা।

—লোকে কত কিছু বলবে, তাইই কি সত্য নাকি গো ! মৃন্ময়ী আশ্বাস দিতে চেয়েছে স্বামীকে।

—তা হলে দহ পড়ল কেন মিনু ?

—মিতের পাপ তোমরা কেউ জানো না। চাকে হাত দিয়ে দিব্যি করো শিবের নামে। করো, তা হলে বলি।

দানো এই প্রস্তাবে সহজেই রাজি হয়েছিল। কেননা, গোপন পাপ সম্বন্ধে মানুষ যা জানে, তা ঠিক নয়। দানোর অন্তত জানা থাক, আরও কোনও পৃথক গূঢ় পাপের কথা। দানো মৃন্ময়ীর পাপ সহ্য করতে পারছে না। মৃন্ময়ী যা নয়, তাকে তাইই করতে চাইছে মানুষ। করুক, সত্য তেমন নয়।

মৃন্ময়ী বংশী মদনের মৃত্যুর কথা স্বামীকে বলে দিল। দানো শুনে আহ্লাদিত হয়ে বলল— এত বড় অকাট্য ঘটনা মিনু, মিতে আমার সইছে কী করে! নির্মলা পাগল হয়ে গেল। যাবে না।

—কাউকে ব'লো না! প্রমাণ করতে পারবে না। দিব্যি করেছ!

—না, না, বলব কেন! এ কী বলার কথা! পাপ ছাড়ে না বাপ। ওর জমি যাবে নাতো, কার যাবে। কুঞ্জির পর্যন্ত সর্বনাশ করতে চাইত।

—তবু কুঞ্জির বিয়ে মিতেই দিয়েছেন। শোনো, প্রমাণ নেই হাতে।

—কিন্তু ভগবানকে তো মানুষ লুকোতে পারবে না।

মৃন্ময়ীর মনে হল, ভগবান সবই দেখেছেন। স্বামীর সরল মুখের দিকে আবার চাইল মিনু। কষ্ট হলেও সে জীবনের জন্য আরও বিস্ময়কর যুক্তি মনে মনে খাড়া করে তুলল।

—আমার আধারে ঘৃতাহুতি শুধু! আমি কী করতে পারি। পুড়ে মরছি, আমি কি পোড়াব না?

—কেন তুমি পুড়ছ মৃন্ময়ী?

—ধর্মই জানেন, আমাকে কেন পুড়তে হয়!

সেদিন ভোর হতে না হতে ধর্মের উদ্দেশে একলা বেরিয়ে পড়ে মৃন্ময়ী। ধর্মনারায়ণের পায়ে মাথা ঠেকিয়ে সমুখে পড়ে গিয়ে ফুঁপিয়ে ওঠে।

—কে?

—আমি আপনার মিনি!

—ও, পালের বউ! কী সব শুনছি মা! এ কি সত্য?

—আপনিই বলুন! সব দোষই কি আমার ঠাকুর!

—নদী তোকে খাবে, তুই নদীকে খাবি! এ নিতান্ত সহজ মা!

—আর?

—তোমার মদন একজন তো নয় রে জননী! বাঁচার জন্য যা করেছিস, আমি বুঝি। সংসার বুঝবে না।

—আমি যে সত্যিই পাপ করেছি বাবা!

—পাপ দস্যু রত্নাকরও করেছিল।

—আমার পাপ কি তেনার চেয়েও কঠিন ?

—এক অংশে কঠিন। অন্য অংশে নয়।

—অংশ করো বাবা !

—তোমার সুখে যখন অন্যের বিনাশ হয় একমাত্র তখনই সেটা পাপ। নদী যখন পাড় ভাঙে, তাতে নদীর পাপ হয় না। কিন্তু মানুষ ভাঙলে পাপ বটে তো ! ঝোড়া ঝোড়া মেটেল নিয়েছ নাম মদনের। ক্ষয় করেছ তার জমি। নির্ধারণ কঠিন, নদী আর তুমি কে কতটা ভেঙেছ ! যদি ভাব পাপ করেছ তা হলে পাপ।

—আমিই মিতেনি পাতিয়েছি বড়ো বাবা। স্বার্থে।

—জানি।

—ভালবাসা কি পাপ ঠাকুর !

—রত্নাকর পাপ করত কেন ? পত্নীপ্রেমে, সন্তান-স্নেহে। তাই না ?

—আজ্ঞে বাবা !

—কিন্তু দুনিয়ায় প্রেমের কোনও শুদ্ধ পথ নেই। অন্তত তোর নেই মৃন্ময়ী। রত্নাকর বাল্মীকি হতে পারেন দৈবকৃপায়। তুই কী হবি ! তোর দৈব দুর্জ্ঞেয়। চলে যা। যা করেছিস, মাটির বশে। এখন প্রশ্ন, তুমি কার বিনাশ চাও ? কার মৃত্যু কামনা কর ? তাই দিয়ে স্থির হবে রত্নাকরের চেয়ে তোমার পাপ কঠিন কিনা !

—আমি মৃত্যু চাই ?

—মরতে তো একজনকে হবেই।

—কে মরবে ?

—তাইই যদি বলতে পারতাম, তা হলে এত কষ্টে আজও বেঁচে আছি কেন ?

—আমি দু'জনকেই চাই ঠাকুর ! নিজেকেও চাই !

—এই জন্যেই বলেছি, তোমার পাপ আরও কঠিন। তুমি মৃন্ময়ী, তোমাকে সইতে হবে।

শুনতে শুনতে ডুকরে কেঁদে ফেলল মিনু পাল। ধর্মের কাছ থেকে ফিরে এসে স্বামীর মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল। কেমন আর্দ্র হয়ে উঠল সমস্ত অন্তর।

—তুই কোথায় গিয়েছিলি মিনু !

স্বামীর কথার উত্তর না দিয়ে হেসে উঠে মিনু বলল— রামকৃষ্টপুরের মেলায় এবার খুব মোচ্ছব হবে !

—কে বলল তোকে ?

—লোকে বলছে। আমি কিন্তু নাগরদোলায় চড়ব, আগেই বলে রাখছি।

—আমি সঙ্গে থাকতে পারব না, কেনাকাটি লাগবে, একলা খদ্দের সামলাব, না তোর সঙ্গে যাব!

—তা হলে মিতেকে সঙ্গে নাও।

—নাহ্। হবে না!

—কেন হবে না?

—হবে না, হবে না, ব্যাস!

স্বামীর আপত্তিতে অত্যন্ত মুখ ভার করে রইল মৃন্ময়ী। মৃন্ময়ী রাগ করলে দানো অত্যন্ত অস্থির হয়ে পড়ে।

বলল— বেশ, বেশ!

—তা হলে তুমি একবার বলে এসো।

—বলতে যাব, মাথা খারাপ হয়েছে তোমার। আপনিই আসে আসুক।

—আপনা থেকেই আসবেন মিতে?

—কেন, এতকাল আসেননি?

—কতকাল আসেননি, মনে আছে?

দানো মদন আশ্বস্ত হল, নাম তা হলে মিতবউয়ের কাছে গোপনেও আসে না। হৃষ্টভঙ্গি করে বলল— আসেন না তো আমরা কী করব! মান অপমান সবারই আছে।

—মানটাই তোমার বড় হল। সাপে কামড়েছে শুনেও একবার গেলে না!

—বেঁচে যে আছে, তার জন্য এত হেদিয়ে মরছ কেন?

—জমি নষ্ট হয়ে গেল! মুখের কথাও একটা বলতে হয়।

—বলতে হয়, কী বলব?

—রামকৃষ্টপুরের মেলায় কার জমি, কার লকড়ির মাল নিয়ে যাচ্ছ!

—চুপ করো মিনু। এখন থেকে রতনের মেটেল ঝোড়ায় ভরব।

—না। খবরদার না। আত্মীয়-বিচ্ছেদ হয়ে যাবে। আর মাটি নেওয়া যায় না অঙ্গনা ঘোষের।

—যায় না?

—না।

—ক'খানা জমিতে মেটেল আছে! কতদূর গিয়ে ঝোড়া টানবি বউ!

অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে গেল মদন পাল। নৌকা সাজাল নদীর ঘাটে। বিশাল বাতার প্রকাণ্ড ঝোড়া মাথায় করে নিয়ে গিয়ে হালদারদের ভাড়া

নৌকায় ফেলল। কোমর-ধসা বলে একজন জোয়ান ছেলেকে ধরে মাল তোলাতে হল! মাল তোলার জন্য টাকাও দিতে হল গুনে!

নৌকায় আলতো ঘোমটা টেনে বসেছিল মৃন্ময়ী। কী নীল আকাশ, কী সাদা মেঘ! সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে যাচ্ছে যেন তারা। বাণিজ্যে যাচ্ছে। দানোর চোখমুখ কেমন এক অহঙ্কারে মটমট করছে। বোনের বিয়ে দিতে পেরে অনির্বচনীয় রসে ভরে আছে সর্বাঙ্গ।

মেলায় মাল বেচা পয়সায় একখানা ভাল বাইক কিনে যৌতুক দেওয়ার পণ আছে। দিতে হবে।

নৌকো ছাড়ব ছাড়ব করছে, এমন সময় শুকনো দহ-পড়া মিতের জমির দিকে চোখ গেল দানোর। জমির চার-বাবলাতলায় ওই লোকটা কে? মিতে না?

দানো ভাবল, সঙ্গে নেওয়া যায়, মাল তোলাপাড়ায় হাত লাগাবে তস্তকার; তা হলে ডাকি। ব্যাস, এইটুকুই বিবেচনা, হেঁকে উঠল মদন পাল— মিতে, ও মিতে! একবারটি আসুন ইদিকে!

নাম মদন দ্বিধাগ্রস্ত পায়ে ঘাটের ধারে এগিয়ে এল। বুড়ো, রোগা, পিঠ ছেঁড়া, শ্যাঁতলা-ধরা কালো জামা পরা, রোদে পোড়া সরু মুখ, বুকের খাতা দেখা যায়, কানে বিড়ি গোঁজা প্রফুল্ল হালদার তার নিজের নৌকো ভাড়ায় টানছে; বলল— মিতে বলে কথা! ধর্ম-বাপের করা সম্বন্ধ! বলে পরনের মোটা ধুতি কোমরে গুঁজে নিয়ে হাল নাড়ল জলের ঘাতে। পায়ের রগ দপদপ করছে।

—আসুন! বলে হাত বাড়াল দানো মদন। অনেক দিন পর কথা বলতে কেমন তার বাধো বাধো ঠেকছিল।

নাম মদনের চোখ অপূর্ব-শ্রীময়ী মিতিনের কাজল টানা ডাগর চোখে হঠাৎ গিয়ে পড়ল। নামের বুকের ভেতরটা কেমন ঝনঝন করে বেজে উঠল। সে কেমন মোহগ্রস্তের মতো উঠে পড়ল নৌকায়।

নৌকো টাল ভেঙে, হেলে দুলে স্থির হল। প্রফুল্ল হাঁকিয়ে দিল ঝলাৎছল, আকাশে ভোরের রক্ত-কুসুম বকের ডানায় মেখে দিগন্তে ধেয়ে যেতে লাগল। নাম মদন বোবা। কেমন ভারাক্রান্ত। দানো হঠাৎ-ই বলল— এখনও কষ্ট পান মিতে! গল্প করুন, মিতিনের সঙ্গে গল্প করুন, প্রফুল্ল আর আমি শুনি। কী গো, প্রফুল্লদা, মিতে-মিতিনের ভাব মানুষ কী বুঝবে!

দানোর এমন দুরবস্থা দেখে মৃন্ময়ীর বুক দুরদুর করতে লাগল। বেফাঁস কিছু বলে বসবে নাতো লোকটা। এমন অস্বাভাবিক উচ্ছ্বাস সওয়া শক্ত; সন্দেহ হয়। প্রফুল্ল কিন্তু দানোর কথায় সায় দিয়ে হেঁ হেঁ

করতে লাগল।

—কথা কি, আপনার আসা উচিত ছিল! দানো আবার কথা বলে উঠল নামের উদ্দেশে। তারপর বলল— মূর্খের শতেক দোষ, বোঝেন না! খোঁজ কিন্তু করেছি আমরা, ঠাঁই বসে থাকিনি। মিতিন তো যাকে পেয়েছে শুধিয়েছে। সেই যে সন্দেশ খেয়ে চলে গেলেন, তা-ও তো এলেন না আর।

মৃন্ময়ী এবার গভীর ভয় পেয়ে গেল। নাম না বলে বসেন—এসেছিলাম তো! আপনি বাড়ি ছিলেন না!

নাম শুধু স্থিরভাবে দানোকে দেখল। মিনুকেও দেখল। প্রফুল্লকে দেখল। ওর হাতে ধরা ছিল একখানা ডায়েরি। জলে ফেলে দিতে গিয়েও ফেলল না। কোলে রাখল। অন্তরে কেমন চমকে উঠল মৃন্ময়ী। আপন মনে হাসছে নাম মদন।

রামকৃষ্ণপুরের ঘাটে ভিড়ল নৌকা। মাল নামাল নাম আর প্রফুল্ল মিলে। দানো দোকান সাজাতে শুরু করে দিল। পাত্রের পর পাত্র সাজানোই দোকান সাজানো আর তা-ও একটি আমগাছের তলায় খোলা আকাশের নীচে।

মাটির সামগ্রী রঙিন, মাটি অবহেলেও বিকোতে পারে। সুন্দরী বউ খদ্দের টানে একটু বেশিই, তা ছাড়া দানোর হাতের কাজের সুনাম আছে। হু হু করে না হোক, টং টং করে বেজে বেজে বিক্রি হতে লাগল মালগুলি। রাঙা কোরের টানই বেশি।

নাম মেলার মধ্যে একা কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল। দানো বলল—কোথায় যে গেলেন মানুষটা! খুঁজে পাবি নাকি বউ?

—খুঁজব?

—কোথায় খুঁজবে! সময় হলে আসবেন। বরং তুমিই একটু ঘুরে এসো। ওহো, ওই যে উনি এসেছেন! মিনু কিন্তু আহ্লাদ করে বসে আছে মিতে। খদ্দের লাগবে ঠেলাঠেলি করে। তার আগে ওর একটু নাগরদোলায় চড়া হয়ে যাক। আপনি যদি নিয়ে গিয়ে চড়িয়ে দ্যান, মন্দ হয় না! নাও, পয়সা নাও তুলে।

একটা সাদা কাপড়ের উপর টাকা-পয়সা ছিল। মিনুর পায়ের কাছে। ইচ্ছে মতন কিছু খুচরো পয়সা আর দু'চারটি টাকা নিয়ে শরীরে ঝাঁকুনি দিয়ে উঠে দাঁড়াল মৃন্ময়ী।

দানোর এমন প্রসন্ন মন খুবই কম দেখেছে মানুষ। মিনুকে সঙ্গে করে নাগরদোলার কাছে এল নাম মদন। এক ফেরতা না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত দাঁড়াতে হবে।

মিনু শুধাল— কিছু খাবেন ?

নাম বলল— কী খাব। এখানে কেন এসেছি, তাইই তো বুঝতে পারছি না।

—খারাপ লাগছে ?

—জানি না।

—আমার সঙ্গে আছেন, তা-ও।

নাম কোনও উত্তর দিল না। নাগরদোলায় ওঠার সময় সহসা মিতবউ বলল— আপনিও আসুন না।

—কেন। বলে বিস্মিত হল নাম।

—আহ্, আসুন বলছি।

নাগরদোলায় ঘুরছিল ওরা। হাতে হাত রেখেছিল ওরা। শরীরে শরীর অবধি। ধাক্কায় দোলায় বেসামাল হচ্ছিল দেহের উপচানো শরীর আর মন। এবং একসময় নারীর কানে মুখ গুঁজে কী যেন বলল পুরুষ। রেঙে উঠল মিতিনের মুখ, গ্রীবা, নাকের গোঁড়া, ঠোঁট কেঁপে উঠল।

—এক রাতের একটি প্রহরে কিছুই শোধ হয় না মিতিন।

—আবার তুমি চাইবে বলে অমন বলেছিলাম।

—এই ছলটুকু থাকে যেন চিরকাল।

—তার বেশি নয়।

তারপর কী কথা হয়েছিল ওদের দর্শক জানে না। শ্রোতাও শোনে না। পাত্র বেচতে বেচতে অকস্মাৎ দানোর মনে হল, কী করছে ওরা। মিতেও থেকে গেল কেন ? চড়িয়ে দিয়ে ফিরে এলেই তো পারত।

অবশ্য মেলায় একলা যুবতীকে ছেড়ে দেওয়া ঠিক না। কিন্তু রক্ষক যদি ভক্ষক হয়ে যায়। ধর্মের কুক্ষিতে সে কথা আছে। ধর্ম বহুদর্শী, ধর্ম নিরাসক্ত, কঠিন। ভাবতে ভাবতে বিক্রিবাটায় কেমন অমনোযোগী হয়ে পড়েছিল মদন পাল। বুকটা মৃৎপাত্রের মতন চিরে কেঁদে উঠল যেন।

দানো কাপড়ের পয়সা মুখ বেঁধে কোমরে গুঁজে একটি প্রায় অচেনা লোককে মাল আগলাতে বলে নাগরদোলার কাছে ছুটে এল। নাগরদোলা তখন শেষ পাক দিয়ে নেমে আসছে।

চোখের সামনে অবিশ্বাস। চোখের সামনে পাপ। নামের কোলে পাশে থেকে মুখ গুঁজে দিয়েছে মৃন্ময়ী। মৃন্ময়ীর পিঠে হাত রেখে নাম মধুর করে ডাকছে, মিতিন, মিতিন। রামকৃষ্ণপুরের মিঠে দোয়েল ডাকছে বুঝি বা।

এইই তবে মাটি আর এইই তবে ভালবাসা। নদীর কাঁখালেও জীবন সিনেমা হতে পারে। মাটি আসক্তি বড়োবাবা, মাটি ধুয়ে যায়। দানো

নিশ্চয়ই ধুয়ে ফেলবে সব। কিন্তু কিভাবে?

মালের কাছে দ্রুত ফিরে এসে মদন পাল দেখল, আগলাতে বলা লোকটা নেই। মালও অনেকগুলি চোট হয়ে গেছে। চোখের মাপে সে আন্দাজ করতে পারে। রামকৃষ্ণপুর এবার তার ভয়ানক লোকসানের মেলা, সবই তামাশা নাকি, সবই নৈরাশার বাণিজ্য!

॥ ৬ ॥

এবার ফিরতে হবে দানোকে। বউ নিয়ে ফিরতে হবে। মিতে নিয়ে ফিরতে হবে। প্রফুল্লের নৌকায় নৈরাশার প্রত্যাবর্তন। সব লোকসান করে, সব খুইয়ে, শুধু কিছু অর্থহীন অর্থ বাজাতে বাজাতে। দানো প্রস্তুত হতে লাগল।

মিতে মিতিন জোড়া হয়ে এসে সামনে দাঁড়াল। তাদের দিকে চোখ তুলতে পারল না মদন পাল। স্বামীর দিকে একটুখানি খুঁটিয়ে দেখে মৃন্ময়ী কেমন ভয় পেল। সর্বাঙ্গে কে যেন চরম বিষাদের কালি মাখিয়ে দিয়েছে; দু'চারটি মৃৎপাত্র এখনও সামনে পড়ে রয়েছে। সেদিকে পালের দৃষ্টি নেই।

কোলে সাদা কাপড় পেতে আপন মনে রেজগি গুনে চলেছে, বারবার ভুল হয়ে যাচ্ছে, কিছুতেই হিসেব মনে রাখতে পারছে না।

সিকি সিকিস্থানে সাজিয়ে চুড়ো করা, আধুলি আধুলিস্থানে। টাকা টাকাস্থানে। বাকি পয়সা একস্থানে ছড়ানো। হঠাৎ সব অর্থকে চুড়ো ভেঙে মিশিয়ে ফেলল শিশুর মতন দানো। আবার গোড়া থেকে গুনতে বসল। চোখ বারবার কেমন ঝাপসা হয়ে আসছে।

চোখের জল দানো কাউকেই দেখাতে চায় না। একজন খদ্দের আঠা হয়ে লেগেছে আবার। একটু আগে নেড়েচেড়ে চলে গিয়েছিল। দরে পোষাচ্ছে না। দানো এবার রেজগি মুঠোয় ধরে বলল— নাও, নাও, আর অত ঘেঁটো না। কত আছে? যা আছে ফেলে দিয়ে চলে যাও। আর অত বাদ্যি ভাল লাগে না। ওই লোকটাকে ডাকো, নিয়ে যাক। দরদাম আর না, মেলা ভাঙতে লেগেছে। আমার মেলা কত আগেই শেষ হয়ে গেল। কুমোরের মেলা আগেই শেষ হয়। পিত্যেক সন এইই তো দেখছি। মাল পড়তে পায় না। দানো মদনের হাতের জিনিস বাবা। মাঠপাড়ার মাটি, সুনাম আছে। ট্যাঁকে বেজায়। এইটে ধন্দ। মাটির জিনিস, হাত থেকে পড়ল তো গেল! এই দ্যাখো! বলে দানো শেষ অবিক্রীত হাঁড়িটা আছাড় মেরে ভেঙে ফেলে দিল। তারপর হা হা

করে হাসতে লাগল।

মিতে মিতিন ভয়ানক আশ্চর্য হয়ে গেল। স্বামীর পাশে ছুটে এল মৃন্ময়ী।

—আমি গুনছি, সরো তো! তুমি পারবে না। তুমি প্রফুল্লদাকে একটু দ্যাখো! জুয়োর ফড়ে বসেছে হয়তো, মাল টেনেছে। কোথায় পড়ে আছে কে জানে।

দানো নড়ছে না দেখে মৃন্ময়ী বিস্ময় প্রকাশ করল— যাবে না।

আজও মৃন্ময়ীর কপালের টিপ ধ্যাবড়া হয়ে গেছে। মদন পাল দৃষ্টি বিঁধিয়ে এমন করে চাইল যে, মিনুর কপাল সিরসির করে উঠল। রেজগি-ধরা মুঠো শিথিল হয়ে আসতে চাইল।

দানো বলল— প্রফুল্লদা মাল খায়নি, ফড়েও বসেনি। ঘাটে চলে গেছে। তাড়াতাড়ি না গেলে হাঁকড়ে মরে যাবে। চ, চ, আর তুই কি গুনবি!

—হিসেব করব না? আমার মাথা ঘুরছে, অমন করে পাক খাওয়া, মাগো। বলে কাঁচা পয়সাগুলো একদিকে সরাতে থাকল কোলে কাপড় তুলে নিয়ে মৃন্ময়ী। গুনতে গুনতে থেমে পড়ে বলল— হল না মিতে। বলে ঢলে চোখ মুদে স্বামীর কোলে পড়ে গেল মৃন্ময়ী। ওর চোখেমুখে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম ফুটে উঠল। ক'লহমা চৈতন্যই যেন হারিয়ে ফেলল মিনু পাল।

কী হল, দণ্ড কতক পরে স্বামীর কোল থেকে মুখ তুলে ধড়মড় করে উঠে বসল মৃন্ময়ী। আবার পয়সা গোনার চেষ্টা করলে মুঠো ধরে সবই ছিনিয়ে নিল মদন পাল। কোমরে গুঁজল কাপড়ের মুখ কালো শক্ত সুতোয় জড়ো করে বেঁধে থলের মতন।

হাঁটার তালে ঝুনঝুন করে বাজছে অর্থ। অর্থহীন। টিপ ধ্যাবড়ানি-বউ চলেছে পিছু পিছু। সামনে সামনে নাম মদন। কোনও কথাই বলছে না। নিঃশব্দেই ওরা নৌকায় চড়ে বসল।

এবার উজান-যাত্রা। পালে হাওয়া পেলে ভাল, নইলে গুণ টানতে হবে। একটু আধটু হাওয়া, তা-ও ভাগ্যের কথা।

স্রোত এলানো, কোনও তীব্রতা নেই। কোথাও অবশ্য আছে কোনও বাঁকে। তখন গুণ টানার দরকার হতে পারে। বইঠে ঠেলবে যে, তার তাকত থাকলে গুণ আবশ্যক নয়।

বইঠেয় বসেছে দানো। ধসা-কোমর, কিন্তু হাতে সামর্থ্য আছে, কোমর মুচড়ে মুচড়ে বইঠে মারতে পারবে।

পাল ছাঁদল প্রফুল্ল। বইঠের দানো আর তার বউ পালের আড়ালে।

তাদের মুখটা হালের এদিক থেকে মাঝে মাঝেই ঢেকে যাচ্ছিল। মুখ কেন, দেহও দেখা যাচ্ছিল না। দেখা যাচ্ছিল মিতিনের আলতা-রাঙা পা।

নৌকা কিছু অধিক লম্বা। পালের কাপড়ে দু'ভাগ হয়ে গেল। দেখতে দেখতে কোথা থেকে খ্যাপা হাওয়া এসে লাগল পালে। পালের পেট ফুলে উঠল। চোঁ চোঁ করে, বিকটভাবে পতপত করে ছুটতে থাকল নৌকা।

প্রফুল্ল হেঁকে উঠে বলল— বইঠে জল থেকে তুলে নাও হে। পরী আমার আপনিই যাবে, ডানা পেয়েছে। শুনলে নাকি, দানো?

নৌকো পরী, ঘোড়া পরী, মানুষ পরী। কী অবাক! কিন্তু নদীর বুকে ছলছল করে উজানে তেড়ে ছুটে আসছে অভিশপ্ত হাওয়া।

—জলদানো হাওয়া দিয়েছে ভাই মদন! শেষে উল্টে না দেয়। বলে ওঠে প্রফুল্ল।

নাম অধিক বিস্মিত হয়। জলে দানো, নৌকায় দানো। কেমন একটা ভয় করে উঠল নামের, মস্তিষ্কে কী একটা হল; ঘোর মতন; তার মনে হল, মিতে দানোই কোনও অভিশাপে নৌকোখানাকে জলের উপর তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে।

নামকে পালের টানাদড়ি ধরতে দিয়েছে প্রফুল্ল। এখন প্রফুল্ল গাঁজা খাবে কল্কেয়।

স্ত্রীর মুখের দিকে অতি নির্দয় কঠিন দৃষ্টি হানছিল দানো। সেই দৃষ্টি এত ক্রূর যে সওয়া যায় না। মিনু চেয়ে থাকতে পারল না। চোখ নামিয়ে নিল।

দানো বৈঠের ঠেকের ফাঁসদড়ি হাতের ধাক্কা দিয়ে এমনই করল যে বেশ ঢিলে হল। বইঠের মুঠো চেপে জল থেকে একটু খাড়া করল। জল থেকে আরও তুলে ঘুরিয়ে মিনুর বুকের কাছে, গলার কাছে, কপালের কাছে ঠেলে দিল। মৃন্ময়ী মুখ টেনে টেনে নিজেকে বাঁচাচ্ছিল।

আর দেরি করল না দানো। বইঠে দিয়ে আচমকা ঠেলে অসতর্ক বউকে নদীতে ফেলে দিল। মিনু ভয়ে আঁ আঁ করতে করতে পড়ে গেল। মানুষ পড়ার শব্দ বোঝা গেল।

—কী হল মিতে! বলে দড়ি শিথিল করতে নাম দেখল নৌকো ঘুরে গেছে পাড়মুখো এবং জলে মিতিন সাঁতরাচ্ছে।

—আরে ধরো, ধরো! বলে গাঁজার কল্কে নামাল প্রফুল্ল। একটু হতভম্ব হয়ে গেছে সে। দড়ি ছেড়ে দিল নাম। পাল উল্টে গেছে,

নৌকার গতি স্তব্ধ হয়ে গেছে। সাঁতরে নৌকো ধরতে জলে আন্দোলন করছে মৃন্ময়ী।

নৌকো ধরতে আসছে দেখে নৌকোর লগি টেনে নিয়ে উঠে দাঁড়াল মদন। বাতাসও হঠাৎ পড়ে গেল। আকাশে কার্তিকের হিম চাঁদ। এখনও দূর থেকে মেলার আলো চোখে পড়ছে।

জলে ভয়ানক যুদ্ধ, নিঃশ্বাস, ভয়, আতঙ্ক, আর্ত-ব্যাকুলতা, বোবা গোঙানি। মিনু নৌকোর কাঁধাল ধরে উঠে আসতে চায়। নৌকো স্রোতে আলগা পেয়ে পিছনেই চলেছে ধীরে ধীরে।

—এ কেমন আহামকি দানো। বউকে উঠতে দে। মারিস না! বলে চেঁচাল প্রফুল্ল। লগি দিয়ে মৃন্ময়ীর কাঁধ, পিঠ খুঁচিয়ে দিল মদন পাল। ছিঁড়ে গেল মিনু পাল। মুখে পর্যন্ত আঘাত পেল। লগি তুলে মিনুর মাথায় বসাতে গেল দানো। ভয়াবহ আর্তনাদ করে উঠল মৃন্ময়ী।

—আমায় মেরে ফেলল প্রফুল্লদা, দানোকে ধরো তোমরা! বলে জলে তীব্র গুমরে উঠল মৃন্ময়ী। নাম লগিসুদ্দো দু'হাত ধরে ফেলল দানোর। মারতে দিল না। কথা কিছুই বলল না নাম। জ্যোৎস্নার মধ্যে শলাকা-কঠিন দৃষ্টিতে দানোকে বিদ্ধ করল সে। দানোর হাত শিথিল হয়ে গেল।

দুই বাহুমূল খামচে ধরে বহুকষ্টে নাম মিতিনকে নৌকোয় তুলে নিতে পারল। ভেজা মিতবউ ঘাড় গুঁজে একটু একটু ব্যথার্দ্র গলায় ফোঁপাতে থাকল। বইঠে বাইতে শুরু করল নাম মদন।

কিছুক্ষণ সবই নিশ্চুপ। বইঠের শব্দ, হালের শব্দ খালি। দানো কেমন চোরা চোখে নামের ডায়েরিখানা দেখছিল। ওটি ছিল প্রফুল্লর পায়ের কাছে। কপাৎ করে হাত বাড়িয়ে সেটিকে হাতে তুলে নিল দানো। উপরে হাত উঠিয়ে নামের দিকে দেখিয়ে বলল— আর কেনে বিদ্যের ফুটুনি দাদা! ফেলে দ্যান। বলে ডায়েরিখানা জলে ছুঁড়ে ফেলল মদন পাল।

চমকে উঠে জলের দিকে চাইল মিতবউ। তারপর সে জলেই ঝাঁপ দিয়ে পড়ল। চিৎকার এবং প্রায় হাহাকার করে বলল— আমার যে ওটি দরকার বড়। হায় ভগবান!

সাঁতার দিয়ে ডুব দিল বউ। তলিয়ে ভেসে গেল কোথায়। সবাই কেমন বোকা হয়ে গেল। কী করবে ভেবে ওঠার আগে কোথায় চলে গেল মৃন্ময়ী। ডুব দিয়ে ওই দূরে উঠল একবার। আবার ডুব দিল। আরও দূরে চলে গিয়ে ভাসল। আবার ডুবে গেল।

অনেক দূর চলে আসার পর চিত-সাঁতারে গা এলিয়ে ভেসে চলল

মিনু। তার চোখের জল গলে নদীর স্রোতে মিশে যাচ্ছিল। আকাশের চাঁদটাও ভিজে উঠেছিল তারই চোখের জলে। এভাবে ঘণ্টাভর ভেসে এসে মিনু তার বাবার গাঁয়ের স্নানের ঘাটে ঠেকল। বিয়ের আগের দিন পর্যন্ত এই ঘাটেই চান করেছে মিনু পাল।

চাঁদের আলোয় ঝিলমিল করছিল ঘাটের স্রোত। জল উষ্ণ, দেহে বড্ড আরাম বোধ করছিল মৃন্ময়ী। যদিও তার পিঠ, বুক ছড়ে গেছে, ব্লাউজ ছিঁড়ে গেছে পিঠের দিকটা, কনুইতে বাড়ি খেয়েছে, তবু ঘাটে পৌঁছে অন্তরে সুখ অনুভব করছিল সে।

গলা অব্দি জলে দাঁড়িয়ে তার বড়োই অবাধ্য কান্না পেয়ে যাচ্ছিল। তারই গা ঘেঁষে জলে ডুবে রয়েছে দুটি মোষ। এদের উঠিয়ে না নিয়ে গেলে সারারাত ভোঁস ভোঁস করবে আর জলেই পড়ে থাকবে। তারও কি জলেই পড়ে থাকতে ইচ্ছে করছে না!

সাংঘাতিক অভিমান হচ্ছিল কেবলই। পারলে পাল তাকে খুনই করে ফেলত। সে মরে যেত। কিন্তু অমন খুনই বা চড়ল কেন লোকটার মাথায়! মিতের সঙ্গে নাগরদোলায় চড়েছে বলে সইতে পারল না!

এতদূর চলে আসার পর আর কী করে ফিরবে সে মদন পালের ঘরে! অভিমান আরও তীব্র হয়ে ওঠে। কাঁদবার জন্য জলে ডুব দেয়। নদী নির্জন, চাঁদ নির্জন, বাতাস কেবল উছলে দিচ্ছে কুচিকুচি ঢেউ। মোষের নিঃশ্বাসে ভরে যাচ্ছে ঘাটের মৃদু উদ্বেল স্রোতের কিনারা।

এই কান্না সে কাউকে দেখাতে পারবে না। গ্রামে গ্রামে রটে যাবে তার ছেনালি। ভাবতে ভাবতে মৃন্ময়ী মোষ দু'টোকে তাড়িয়ে তোলে জল থেকে। তারপর মোষেদের পিছু পিছু গাঁয়ের পথে হাঁটতে থাকে। মোষ এখন আপন মনে ভেজা দেহে নিজেদের গোয়ালে গিয়ে দাঁড়াবে। তা হলে এখন মিনু দাঁড়াবে কোথায়?

মিনু দাঁড়াল এসে ভাই পরেশের ঘরটার খুঁটি ধরে। পরেশ মাটির কাজ করে না। হাটে হাটে রেডিমেড পোশাক বেচে বেড়ায়। এখনও বিয়ে করেনি। বাপ বুড়ো হয়েছে, অবশ্য এই বার্ধক্য এসেছে কিছু আগেই। চোখ নষ্ট হয়ে গেছে বলে মাটির কাজ তুলে দিয়েছে, ছেলের উপর খায়।

পরেশ নতুন হ্যারিকেনের আলোয় বারান্দায় দড়ি ফেলে কাপড়ের গাঁট বাঁধছিল। কাল কোথাও হাটে যাবে নিশ্চয়। খুঁটির কাছে ছায়া দেখে ঘাড় ফেরাল।

—এ কী! দিদি, তুই? বলে অবাক হয়ে জলভেজা দিদির দিকে পলক না ফেলে চেয়ে রইল পরেশ পাল। চব্বিশ-পঁচিশ বয়েস বড়

জোর, কমও হতে পারে। তার দিদি সাড়ে তিন বছরের বড়। পিঠেপিঠি বলে ভাব যেমন, খুনসুটিও কম করেনি সমস্ত ছেলেবেলা। বিয়ের পর সেই ভাইই কেমন পর হয়ে গেছে। দিদিকে বড় একটা দেখতেও যায় না মাঠপাড়ায়।

—কেন, আসতে নেই ? তুই যাস না বলে কি আমিও আসব না ?

—কই আর আসিস ? আমি হাটুরে লোক ফুরসত পাই না।

—খুব কাজের হয়েছিস !

একটুখানি লজ্জা পেয়ে হাসল পরেশ। কিন্তু সে মনে মনে কেমন সন্দিগ্ধ হয়ে পড়েছিল। বলল— এত রাতে, একা ! তুই এলি কী করে ? ভিজেছিস কেন ?

—ঘাটের কাছে এসে চান করতে ইচ্ছে হল ! গোকুলদের মোষ দু'টো চান করছিল দেখে নেমে পড়লাম।

—তোর আজও ছেলেমানুষি গেল না।

—সত্যিই তুই কত বড় হয়ে গেছিস পরেশ। খুব মরদ হয়েছিস একখানা। বিয়ে করবি না ?

—মদনদা কেমন আছে ? ভেজা কাপড়ে দাঁড়িয়ে রইলি কেন ? ঘরের ভিতরে গিয়ে দ্যাখ, পরবার কিছু পাস কিনা। এ বাড়িতে বাবা আর আমি। ছুটকি রেঁদে দেয় দু'বেলা। মেয়ে না থাকলে যা হয়, ছিরিছাঁদ নেই। তুই সত্যি কী পরবি তা হলে ? বউ থাকলে...

—সেই কথাই তো বলছি ভাই ! চাদর জড়িয়ে বসে থাকতে হবে।

—না, না। দাঁড়া। ছুটকির জন্য হাট থেকে নতুন একখানা কাপড় এনেছি। এখনও দেওয়া হয়নি।

—ওর কাপড়, আমি পরব কেন ?

—কাল, ওর জন্য আবার একখানা কিনে আনতে হবে। বলে পরেশ ঘরে ঢুকে নতুন কাপড়খানা বার করে এনে বোনের হাতে দিতে দিতে বলল— মদনদার উপর রাগ করে চলে এসেছিস ?

—না। বলে চাপা অসহিষ্ণুতা আর বিষণ্নতা প্রকাশ করে ভাইয়ের হাত থেকে কাপড় নেয় মৃন্ময়ী।

ওদিকে প্রফুল্ল হালদার গাঁজার নেশায় অত্যন্ত চমৎকৃত হয়ে বলল— ভেসে গেল বউটা। চেয়ে চেয়ে দেখলাম আমরা ! দানো, এ তোমার ঠিক হল না ! তুমি তো মিনুকে মেরেই ফেলতে হে ! এতকাল তোমাকে ম্যাদা বলে জানতাম, কী সাংঘাতিক রোখ তোমার ! কোমর ভেঙেছিস ব্যাটা, শান নেই, বউ না থাকলে কী খাবি ! মর্দানি একখানা করে দেখালে বটে !

—ডায়েরিখানা ফেলে না দিলে মিনু ঝাঁপ দিত না প্রফুল্লদা ! বিদ্যা পাপ, জানো তুমি ? আমার বউকে নষ্ট করেছে এই লোকটা, এই আমার মিতে ! একেই শুধোও, কী লিখেছে ডায়েরিতে, কেন মিতবউ ঝাঁপ দিল ! কেন ?

—তুই মারবি, রোখ করবি, মর্দানি করবি, এতে কোনও পাপ হল না ! শালা, তুই নেমে যা। আমি মাল বইব, পাপ বইতে পারব না। দুটিই তোরা মানুষ না ! নৌকো ভেড়া।

নাম মদন বলল—আমাকেই নামিয়ে দাও প্রফুল্লদা। আমার ভার তুমি টানবে কেন ? মিতিনকে ঢুঁড়ে দেখা উচিত।

—আপনি যাবেন ? বলে দানো চাইল নামের দিকে।

—যাব।

—না।

—কেন ?

—আপনি যাবেন না, ফল ভাল হবে না। নেমে যাচ্ছেন যান, মিনুকে খোঁজার চেষ্টা করবেন না। মিনু ভেসে গেছে, আমার গেছে। অত দরদ থাকলে, বলে কয়ে ঢুঁড়তে যায় না কেউ। মিনু যখন ঝাঁপ দিল, কই আপনি তো ঝাঁপিয়ে পড়লেন না !

—এ কাজটা আপনাকেই করতে হত মিতে ! গেলে আপনারই যাবে, আমার তো কিছু যাবে না। একখানা ডায়েরি, আমি নিজেই ফেলে দিতে চেয়েছিলাম। তা ছাড়া, আমি ঝাঁপ দিলে আপনি কী করতেন ? ঝাঁপ দিতেন। কেন, না আমাকে ধরতে, আমাকে লগি মারবার জন্য। তাই না ? জলে দুই মদনের লড়াই বেধে যেত। সিনেমার এই রকম হয়। ভৈরবটা সিনেমার নদী নয় গো ! এখানে কার কী যায়, বোঝা যায় না। খালি ভাবছি, ডায়েরিখানা ধরতে কেন গেল, মিতিন ?

—হুঁহ্ ! ভাবছেন তা হলে ! বলে পাগলের মতো বাঁকা করে হাসল মদন পাল।

প্রফুল্ল ভাবছিল, দুই মদনকে এক নৌকোয় রাখা ঠিক না। একজন কাউকে নামিয়ে দিতেই হবে। নইলে তার নেশাটাই মাটি হবে ! তবে দানোটা অত্যন্ত নিষ্ঠুর সন্দেহ নেই। বউকে অমন করে মারল, ভাসিয়ে দিল, অথচ কোনও কষ্ট নেই, এখনও রোখ, এখনও নামকে শাসাচ্ছে।

যাওয়ার সময় তো পাঁচমুখে মিতে মিতে করছিলে, সেই দম মেলা না ভাঙতেই ফুরিয়ে গেল। মিতে মিতিন একসঙ্গে মেলায় ঘুরেছে, নাগরদোলায় চড়েছে, তো কী হয়েছে ! নষ্ট করেছে বউটাকে তোর ! এ অন্যায় ! ঘোরতর অপরাধ ! তা বলে লগি মারা ! দূর ছাই ! গাঁজা চড়ে

যাচ্ছে নাকি ! বেতালা হয়ে গেল নাকি মাথাটা !

নৌকো ছেড়ে নদীপাড়ের পথ ধরল নাম মদন। পাড়ের সরণি ধরে যেতে যেতে সহসা দানোর বিদীর্ণ গুমরোনো স্বরভাঙা গলার কান্না শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেল। প্রফুল্ল বেচারিকে ধমক দিয়ে থামতে বলছে। তাতে শিশুর মতো দানোর কান্না আরও উচ্চকিত হয়ে উঠছে।

সারা নদীটাই যেন কাঁদছে এখন। শিবই যেন কাঁদছেন। মিতিন কী ভাবছেন এখন ? দু'দুটো পুরুষ, মাঝিও বাড়তি ছিল, কেউ তাকে ধরল না, খোঁজও করল না ! কপালকুণ্ডলার মতো ভেসে গেল মেয়েটা। নবকুমারের মতো সেও কি শৌখিন পুরুষ ? সে তবে কী করতে এসেছিল মেলায় ? অন্যের বউকে ভাঙিয়ে নিজের করে নিতে ? মিতিনই তো নাগরদোলায় উঠে অমন করে ডাকল তাকে ! মিতিনই তো 'এসো' বলে হাত ধরেছে তার !

মিতের ঘরে আগুন লেগেছে ভেবে সেদিন অমন করে ছুটে গেল কেন নাম মদন ? মন কেন অমন করে বিভ্রান্ত হল ! মিতিনকে দেখার উদগ্র কামনাই কি পোনের আগুনকে গৃহদাহের আগুন করে তুলেছিল চোখের সামনে ! মন কি চাইছিল, দানোর সংসার ছাই হোক !

—আর কেন বিদ্যের ফুটুনি দাদা ! ফেলে দ্যান ! আচমকা মনে ধাক্কা লাগে।

—বিদ্যা পাপ, জানো তুমি ? নাম আঁতকে উঠল। ডায়েরি তার পাপের অক্ষরমালা।

—আমার যে ওটি দরকার বড়। হায় ভগবান ! মিতিনের কী দরকার ওই ডায়েরিখানায় ? কেন ঝাঁপ দিল মিতবউ ? ভালবাসলে কি এমন হয় নাকি ! মানুষ যে পাপের বোঝা বইছে, সেই ভার তো অন্যে নেয় না ! বড় বাবা হামেশা বলেন, রত্নাকরের পাপ কেউ বইতে চায়নি। প্রেমও কি পাপের ভার সইতে পারে ! ডায়েরিটা তোমার কেন দরকার ছিল মিতিন ? তুমি কি জানো, আমি বংশীকে মেরে ফেলেছি ! আমি একটি আড়বাঁশি সঙ্গে করে নিয়ে ঘুরতাম !

—'কিসের ভিতরে ঢুকেছিস, বেরিয়ে আয়।' মায়ের গলা ভেসে এল নদীর হাওয়ায়। মদন থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। পিছনে তাকাল। নদী বইছে পিছনের টানে। পিছনের পথ ধরে নদীকে অনুসরণ করবে নাম ? মিতিনকে খুঁজবে ? একবার প্রশ্নটি করা দরকার, ডায়েরিখানা বড় দরকার তোমার। কেন ? কেন অমন করে ঝাঁপিয়ে পড়লে তুমি ?

দানোর কান্না সহ্য করতে পারছিল না নাম মদন। ধীরে ধীরে নিজেকে তার কেমন অপরাধী ঠাওর হচ্ছিল। আবার হিংস্র দানোর

মুখটা মনে করে ঘৃণাও হচ্ছিল। ঘৃণা আর সহানুভূতির এমন দ্বন্দ্ব তাকে যেভাবে ছিন্ন করছিল তার কোনও তুলনা সে জানে না।

তারই পাপে বংশী মরেছে, তারই পাপে দানো পাগল হয়ে যাচ্ছে! সত্যিই তবে কিসের ভিতরে ঢুকেছে নাম মদন ; জীবনটা কেমন গহ্বর!

এই সমস্ত ঘটনার জন্য ধর্মই দায়ী। ধর্মই নামকে লোভ দেখিয়েছে। কেন বলেছিল, দানো মরে গেলে মৃন্ময়ী তার হবে। কেন বলেছিল, ভেবো না মিতবউ তোমারও বউ। একথা শুনে নাম ভেবেছে, মিতবউ কিছুটা তারও বধূ। কেন মিতিনকে আগলাতে বলেছিল ধর্ম!

অন্যের পরমায়ু চুরি করে, ছিনিয়ে নিয়ে বেঁচে আছে নাম। এবার সে অন্যের বউ ছিনিয়ে নিতে চাইছে। আবার ডুকরে উঠল দানো মদন। এই জায়গাটায় সাংঘাতিক স্রোত।

প্রফুল্ল নামকে নাম ধরে ডাকছে। মদন তন্তুবায় সাড়া দিল। জলের ধারে নেমে গেল। গুণ টানতে হবে।

নাম মদন গুণ টানতে লাগল। থলেতে রেজগি নাচিয়ে নাচিয়ে কাঁদছে দানো। পাগলই হয়ে গেল লোকটা। দানোকে প্রফুল্লর নৌকায় ফেলে রেখে নাম চলে যেতে চেয়েছিল। পারল না। তাকেই এখন গুণ টানতে হচ্ছে।

গুণ টেনেই চলল নাম মদন। পালে আর কোনও হাওয়া লাগল না। দানো আশ্চর্য শোকে অস্থির। প্রলাপ বকে চলেছে। তাকে প্রফুল্ল বইঠা বাইতে বলতে পারে না। ফলে গুণ টানা চলতেই থাকে।

নামের কাঁধ ব্যথা হয়ে গেল। জিভ ঝুলে পড়তে চাইছিল। চলতে চলতে একটা বিড়ি ধরাল মদন দেবনাথ। বিড়ির নেশা খুব কম। মাঝে মাঝে টানে। কী করে যেন বিড়ি দেশলাই তার পকেটেই ছিল। দু'বার টেনে কেমন অদ্ভুত তেতো তেতো ঠেকল। থুঃ করে মুখ থেকে ফেলে দিল সে।

মাঠপাড়ার ঘাটে নৌকো ভিড়লে চাঁদটা আকাশে নেমে গেল অনেকটা। প্রফুল্ল বলল— মিতেকে কাঁধে করে নামাও হে! এখন বেটা কথা বন্ধ করে দিয়েছে।

উপায় ছিল না। দানোকে ফেলে পালাতে পারছিল না নাম। কাঁধে করেই নামাতে হল। নামের কাঁধে মাথা রেখে দানো যেন ঘুমিয়ে পড়তেই চাইছিল। ওই অবস্থায় নাম হাঁটিয়ে নিয়ে চলল মিতেকে। যেতে যেতে দানো কাঁধ থেকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে পড়ে নামের কাঁধে উষ্ণ নিঃশ্বাস ফেলে কটমট করে চেয়ে রইল। পলক ফেলতেই চাইছে না।

কিছুক্ষণ বাদে সেই তীব্র ধারালো দৃষ্টি নরম হয়ে গেল আর দানো শিশুর মতো ফুঁপিয়ে উঠল। নামের শরীর কেমন সিরসির করে উঠল। দানো মদন মিতের কাছে ওই কান্নার ভিতর দিয়ে মিতিনকে ফেরত চাইছে।

একবার কাঁধ থেকে দানোকে ছুড়ে ফেলে দিতে ইচ্ছে করল নামের। তা-ও সে পারল না।

—এভাবে কাঁদবেন না, ভাল লাগে না!

আহ্ হা হা হা! করে এক অদ্ভুত হাহাকার মেশানো দীর্ঘশ্বাস ফেলল মদন পাল। বাড়িতে এনে বারান্দায় মিতেকে একখানি মাদুরের উপর শুইয়ে দিল নাম মদন। বলল— চুপ করে শুয়ে থাকুন। মাথা খারাপ করবেন না!

—না, আর তো করব না! আপনি আছেন ; আমাকে ছেড়ে যাবেন না তো মিতে। জানেন ডর ধরেছে গো!

—কিসের ডর! এত্তো বকছেন কেন? মারধর করে স্ত্রী বশ হয় নাকি! প্রফুল্লদা কী মনে করল, ভাবুন তো!

—করল, করল! কিন্তু আমার যে সব গেল মিতে।

—যায়নি।

—যায়নি? আপনি সত্যি বলছেন মিতে, যায়নি? বলে দানো মদন নাম মদনের দু'টি হাত আকুল হয়ে চেপে ধরতে ধরতে মাদুরের উপর উঠে বসে গেল।

—না, যায়নি। যাওয়া সহজ নয়।

—বলছেন? তা হলে···

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। বলছি বইকি!

—ভিতরে হুলায়, উপরে ফুলায় মিতে, সেই দু'খানি হাত আমাকে ফিরৎ দ্যান। আমার তো খালি গর্দানটুকু, বাকি সব ওই হাতের গড়ন-পিটন ; আপনি সবই জানেন! কুমোর পাণিগ্রহণ করে ; মেয়েদের দু'খানি হাতকেই বিয়ে করে নাম মিতে! দু'খানি ফর্সা হাত। গোটা-ধরা, পিটনি-ধরা, মথন দেওয়া হাত, রাঙা দেওয়া হাত, আমাকে এনে দ্যান মিতে! ধম্মের সম্বন্ধ আমাদের। চটি মাটি কে করবে, মাটির কাঁধকে রুটি গেলাবে কে!

কী যে সুতীব্র বেদনা, কত বড় শূন্য-হাহাকার ছড়িয়ে পড়ছে রাত্রির আকাশে, পথে, নদীতে। সেই কষ্টের সীমা পাওয়া যায় না।

দানো মদনের আর্তি আর অসহায় প্রার্থনা দু'খানি হাতকে ঘিরে, ফর্সা হাত, যা দেখলে নাম মদনের কামেচ্ছা জাগে! তা হলে এখন কী করবে

নাম মদন ? এ প্রার্থনা কি কবুল করে নেবে ?

সত্যিই তো, কুমোরের হাতের কাজ কতটুকুই বা। কম নয়। আবার খুব বেশিও তো নয়।

—আপনার মিতিনের খুব জিদ মিতে! ভাঙে, মচকায় না। লোকসমক্ষে এ আমি কী করলাম!

—এত করে কাঁদবেন না। বাস্তবিক ভাল্লাগে না।

—মান খুব কঠিন জিনিস! অপমান হয়েছে!

—এখন বুঝতে পারছেন!

—আপনি যান একবারটি। আজও তো ফিরল না। হাটে খবর নিয়ে জেনেছি, ও বাপের কাছে আছে। পরেশ বলেছে, সে তার বহিনকে পোষবার ক্ষ্যামতা রাখে।

আর দানোর কাছে আসতে ইচ্ছে করে না নাম মদনের। একই কথা সে বলে চলেছে। কাজ করে না। চাক স্তব্ধ হয়ে গেছে।

কুমোর একা কী করবে? একার কাজ তো নয়। পাত্রের স্কন্ধ বা গর্দান গড়া পর্যন্ত পুরুষ-হাত। তার পর সবই নারীর। পাত্রের সেই স্কন্ধকে আথালে বসাবে নারী-হাত। আথাল হল স্কন্ধ বসানোর বস্‌নে। স্কন্ধের মুখ গলিয়ে দেওয়া মাটির রুটি, ভাঁজ করে ঢোকাতে হবে বস্‌নের উপরি-তলে অর্থাৎ আথালের উপর। ভিতরে হুলাতে হবে ক্ষুদ্র ঘটির মতন গোটা দিয়ে, হুলানো জিনিসটা অনুভবেও বোঝা যায়। উপরে অর্থাৎ পাত্রের বাইরে কাঠের পিটনি মেরে ফুলিয়ে প্রসারিত করে নিতে হবে পাত্রকে।

—ভিতরে হুলায়, উপরে ফুলায় মিতে; সেই দু'খানি হাত আমাকে ফিরৎ দ্যান। কতবার বলা হল সেই কথা!

নাম মদন ভাবছিল, তাঁতের কাজেও নারী, মাটির কাজেও নারী। নারীর দু'খানি হাত। এই হাতকেই বিয়ে করে পুরুষ। ওই হাতকেই ভালবাসে। এত কঠিন সত্যের সামনে দাঁড়াতে হল তাকে!

ছন্দে-বন্ধ, ললিত দু'খানি ফর্সা হাত! বারবার নাম মদনের চোখের সামনে চুড়ির নিক্বণ শোনাতে থাকল। এই হাত দিয়ে নামের গলা জড়িয়ে ধরেছিল মিতবউ।

কিন্তু সেই দুখানি হাতের অভাবে মদন পালের সবই কেমন স্তব্ধ হয়ে যেতে থাকল। জীবনটাই যেন ফুরিয়ে আসতে থাকে। চাক বন্ধ, চাকের গায়ের মাটি হাড়ের মতো শুকিয়ে গেল। চাকের গর্তে ইঁদুরে মাটি তুলে ফোঁপরা করে দিল। শিবের গায়ে ঝুল জমল, মাকড়সা নকশা বানাল।

যাঁতের মুণ্ডুবৎ অর্ধভাঙা হাঁড়ির চারপাশে ছাই কী একটা ঘূর্ণিলাগা হাওয়ায় পোনের মধ্যে আপন মনে বনবন করে ঘুরতে থাকল অভিশপ্ত কিসের তাড়নায়, যখন তখন এ রকম হতে থাকল।

খুঁটিতে পিঠ লাগিয়ে সম্পূর্ণ হতোদ্দম হয়ে নির্বাক বসে রইল মদন পাল। দাড়ি গোঁফে আচ্ছন্ন হয়ে গেল মুখ। চোখে চিকচিক করতে থাকল চরম হতাশার অশ্রু। মাঝে মাঝে শিশুর মতন ফুলে উঠতে থাকল ঠোঁট দু'টি।

লোকে দেখল, মদন পাল পাগল হয়ে গেছে। পেটের ভাত জোগাড় করার আশ্চর্য মতলব বার করে ফেলল দানো।

তার জাত চলে গেল। লেংটিপরা, খালি গা, পায়ে কোনও জুতা নেই, দানো মদন গাঁয়ে গাঁয়ে ইট-ভাঁটায় আগুন দিয়ে বেড়াতে লাগল। ইট-ভাঁটায় আগুন দেওয়া এবং তার বিনিময়ে অন্ন জোগাড় করা একজন মৃৎ-শিল্পীর পক্ষে আত্মার চরম অবমাননা। সবচেয়ে অভিশপ্ত মানুষই এই কাজ করে, একজন শিল্পীর এত বড়ো পতন পালপাড়ার মানুষ ভাবতে পারে না।

এই পাল মদনের দু'হাতে হাঁড়ির পোন আর আগুন নিতে পারে না। দানোকে পালেরা মনে মনে ঘৃণা করতে শুরু করেছে।

কেউ কেউ বলল—একবার বউটার কাছে যেতে পারলে না মদন? কী করেছ তুমি যে, যেতে পার না?

মদন পাল উত্তর না দিয়ে আপন মনে কেবল নিঃশব্দে হাসে। নাম মদন একদিন সন্ধ্যার সময় চাতরা গাঁয়ে একটি ইট-ভাঁটার সামনে মিতেকে বসে থাকতে দেখে কেমন হতভম্ব হয়ে গেল। আগুন দিয়েছে, ফেঁসো আর পাট কাঠির বাণ্ডিলে কেরোসিন মাখিয়ে। এখন মাত্র পাঁচটা টাকা আর নতুন একখানা গামছা বা লুঙ্গির জন্য বসে রয়েছে। নামের দিকে চোখ তুলতে পারছে না দানো। চোরের মতন দৃষ্টি লুকোবার চেষ্টা করছে।

এ দৃশ্য হৃদয় দিয়ে হজম কথা যথারীতি শক্ত। সাইকেল তাড়িয়ে ওখান থেকে চলে আসে নাম। তারপর পরের দিন সিধে মৃন্ময়ীর বাপের দেশে রওনা দেয়। তখন দুপুর। বাড়িতে পরেশ ছিল না। বাপটা অন্য ঘরের মেঝেয় প্রায় অচৈতন্য হয়ে পড়ে রয়েছে। পরণের কাপড়ও ঠিক নেই। সেদিকে কেউ দৃষ্টিও দেয় না।

সাইকেলখানা উঠোনে ঢোকা মাত্র চিনতে পারল মৃন্ময়ী। নিঃশব্দে খুঁটি ধরে দাঁড়াল নামের সামনে মিনু পাল। দু'টি ফর্সা হাত দিয়ে খুঁটিটা জড়িয়ে ধরেছে মিনু। সেই হাতের দিকে অত্যন্ত কামার্ত দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ

হতবাক হয়ে চেয়ে রইল নাম। কেমন একটু শুকিয়ে গেছে মিতিন। তাতে তাকে আরও সুন্দরী দেখাচ্ছে। নাম মদন কিছুক্ষণের জন্য ভুলেই গেল, এখানে কেন এসেছে সে!

—এত দিনে মনে পড়ল আমাকে। রোজই ভাবি, এই বুঝি আপনি আসবেন! আজই। আবার ভাবি, কেনই বা আসবেন আপনারা। আমি কে, আমার কী দাম? তিন তিনটে পুরুষ চেয়ে চেয়ে দেখলেন, বউটা ভেসে যাচ্ছে, বাঁচেই কি না, তবু কারও মায়া হল না।

—আমি পারিনি মিতিন, পারিনি!

—কেন পারেননি?

—মিতে যদি আরও রেগে যায়, যদি প্রফুল্লদা ভাল মনে না নেয়। তা ছাড়া আমি...

—বলুন!

এবার দু'মিনিট কোনও কথাই নাম তার মুখে জুগিয়ে তুলতে পারে না। মাথা নিচু করে মাটির বারান্দায় খুঁটির কিছু তফাতে বসে থাকে চুপচাপ। তারপর হঠাৎ বলে—আমার সাহস হল না।

—আজ কোন সাহসে তা হলে এসেছেন! আপনার ডায়েরি ধরব বলে ঝাঁপ দিলাম। আপনারই জন্য; আপহি আমাকে কেমন করে দিয়েছেন! আজ আমি আমার নিজের ঘরে ফিরতে পারছি না!

—কেন ডায়েরি ধরতে গেলেন? ডায়েরিতে মানুষের অনেক গোপন কথা থাকে মিতিন! পাপ থাকে। অন্যায় থাকে।

—আমি যে আপনার সব কথা জানতে চেয়েছি!

—কেন? বলে ভয়ে কিসের একটা আঘাত পায় নাম মদন। তারপর হঠাৎ-ই উঠে দাঁড়িয়ে পড়ে।

—ও কি! উঠে দাঁড়ালেন কেন?

—হুদো পাখির দেশ এটা। পৈলান চাষির দেশ। পরীর দেশ। জানেন? এখানে একটা মানুষের সবখানি জানতে নেই।

—আপনি আমার সবখানি জানেন না?

—না।

—জানলে, আমার সঙ্গে আপনিও নদীতে ঝাঁপ দিতেন। সাহস হত।

মৃন্ময়ীর একথা শুনে চমকে উঠে কেমন একটা বিমর্ষ ভঙ্গিতে আবার বারন্দার মাটিতে বসে পড়ল নাম মদন। এবার মিনু খুঁটি ছেড়ে নামের কাছে ঝুঁকে এল। গায়ে আলতো করে ছুঁয়ে বলল—ভয় কিসের। এসো।

মিতিনের স্পর্শে আর কথায় এবার নাম মদন বিহ্বল হয়ে পড়ল।

ঘরের মধ্যে নামকে টেনে নিল মিনু পাল। সে-ও নিজেকে ধরে রাখতে পারল না। গায়ের কাপড় আপন হাতে ফেলে দিল মৃন্ময়ী, ব্লাউজ, খুলে ফেলল। সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে গেল।

মিতবউয়ের হাত দু'টি ধরবা মাত্র কানে এল, দানোর গলা, শূন্য হাওয়া থেকে ভেসে এল—'ভিতরে হুলায়, উপরে ফুলায় মিতে ; সেই দু'খানি হাত আমাকে ফিরৎ দ্যান !'

ফিরৎ দ্যান। ফিরৎ দ্যান। ফিরৎ দ্যান ! শুনতে শুনতে মিতিনের নগ্ন দেহ ছেড়ে নামের চোখ কোঠাঘরের বাঁশপাতা, বাঁশের তীরে গিয়ে ঠেকল। একটি ঘুলঘুলির দিকে চলে গেল।

—কী হল !

—না।

—কী, না ?

হাত দু'টি কেমন অসহায়ভাবে মুঠোর মধ্যে ধরল নাম। ধরল মিতিনের বাহু। আঙুল দিয়ে ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখল, মনে মনে বলল, এই হাত দিয়ে অন্ন জোগাড় হয়, চাকা ঘোরে, মাটির অন্তর খাবার পায়। এই হাত একটি মানুষকে চরম দুর্গতি আর অসম্মান থেকে বাঁচাতে পারে। এই মৃণাল বাহুই আবার কবি-কঙ্কন মদনের তৃষ্ণা এবং সৌন্দর্য।

—আমার ভার কতটা তুমি জানো না মিতিন। হুদো পাখির দেশে পাপের পরিমাপ হয় না।

—আমি সব জানি।

—কী করে জানলে ?

—নির্মলা আমাকে সব বলেছে। তোমার দোষে বংশী মরেছে !

—ওহ্ !

মিতবউয়ের দু'টি হাত ছেড়ে দিল নাম মদন। চৌকির উপর কেমন বিষণ্ণ শৈথিল্যে বসে পড়ল সে। তার কাছে এগিয়ে এল নগ্ন-রূপসী মৃন্ময়ী পাল। তার চোখে কামের আগুন ঘিয়ের প্রদীপ জ্বেলে তুলেছে।

—আপনি আমার ডায়েরি নিয়ে কী করতেন মিতিন ?

—আমার কাছে থাকত। আর কিছু না ! আসুন, বসে পড়লেন কেন ? আমি আপনার পাপের সমান ভাগ চাই। নির্মলাকে কিছু বলবেন না, কথা দিতে হবে।

—পাপের ভাগ, কেউ নেয় না মিতিন, ধর্মের কথা।

—নেয়, ভালবাসা নেয়। স্ত্রী নেয় না, সন্তান নেয় না, বন্ধু নেয় না। আমি তোমাকে ভালবাসি নাম।

—তোমার কৌতূহলকে ভয় করে মিতবউ ! তুমি ফিরে চলো।

—কোথায় ?

—স্বামীর কাছে। মিতে জাতিভ্রষ্ট হয়েছে। পাগল হয়ে গেছে।

—কই, সে তো এল না ! আপনি কেন বলতে এসেছেন ? যা করতে এসেছেন, করে যান। কই আসুন ! বলে, নাম মদনের গা ধরে নিজের দিকে টানল মৃন্ময়ী। এই প্রস্তাব কি কোনও প্রেমের ! এই কণ্ঠস্বর কেমন যেন জমির, পণ্যের দর করার মতন। নদীর ক্ষুধার্ত জল যেন পাড়ের জমিকে জিহ্বায় চেটে গিলে নিতে চায়।

—তোমার অন্তরে প্রেম নেই মিতিন ! আমি তোমার খদ্দের নই। চলি ! ওই দুটি হাত আমার নয়। বলে উঠোনে নেমে চলে এল নাম মদন।

চৌকির উপর লুটিয়ে পড়ে গলায় শব্দ তুলে কাঁদতে লাগল মৃন্ময়ী।

—কে ? কোন পাপী রে ! কে ঢুকেছে ঘরে ! বলে মিনুর বাপ আর্তনাদ করে উঠল।

রাস্তায় দ্রুত ছুটে এসে বাইক ছুটিয়ে দিল নাম মদন। যেন সে চুরি করতে ঢুকেছিল। কিছুদূর এসে বোলতলার কাছে সাইকেল থেকে নেমে পড়ল সে। দেখল, এখানে ইট কাটা হচ্ছে। পরেশের ইট। পাকা বাড়ি তোলার জন্য ভাঁটা সাজানো হচ্ছে। ইটের পাড়নদারদের কাছে থেকে সব খবরই নাম সংগ্রহ করে নেয়। তারপর কথাচ্ছলে জানতে পারে, পাকা দালান তুলতে পারলে পরেশের ভাল কনে জুটবে, পরেশ খুব গুছনো ছেলে।

নাম শুধালো—কবে ভাঁটায় আগুন দিচ্ছ তোমরা ?

হেড পাড়নদার বলল—কালই।

—আগুন কে দেবে ?

—যা হোক, কেউ। লবানির মা। অর্থাৎ লাবণ্যের মা। ফের হেড-পাড়নদারই বলল আগে যে আসবে, তার হাতেই আগুন খাওয়াব।

—আমি যদি লোক দিই ?

—আগুনের আবার লোক কী ? অবশ্যি, তা-ও আছে। এই পাপ সবাই করে না।

—বলছি কি, আগুনই দেবে না। পাঁজান পর্যন্ত মারবে। জ্বালানি খাওয়াবে দু ঘণ্টা। আমার লোক আছে।

—পাঠিয়ে দ্যান। নাম কী ?

—মদন।

—কী নাম বললেন ?

—নাম মদন ! বলেই নাম মদন চমকে উঠল। আর সে সেখানে

দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না।

—ভোরে ভোরে আসা চাই মদনের। মাটির চোপা পুড়বে, গতর পুড়বে, মাটির শাপ-শাপান্ত কত। তা-ও মানুষ লাইন দিচ্ছে গো। পাপের সাঁজাল ধরতেও মানুষের অভাব হয় না, এমনই দেশ।

মদন দিগরে পাঁচ নয়। ছয়। স্বর্ণকার মদনের কথা মানুষ বিশেষ জানে না। আরও কিছু মদন থাকতেও পারে। তবে নাম মদনের কত ছদ্মবেশ। এ বার সে দানোর রূপ ধরবে।

শোনো শোনো বন্ধুগণ শোনো দিয়া মন
মদনের ছদ্মনাম যে কোনও মদন।
পাপী মদন তাপী মদন শিল্পী মদনেরা,
মাটি জল আগুনেই করে ঘোরাফেরা।
তারপর কী হল গো কথক ঠাকুর?
কখন পৌঁছল দানো বোল-জিৎপুর?
পৌঁছল মদন পাল বোলতলার ডিহা
পাঁজালে আগুন ধরে নাচিয়া নাচিয়া,
ভোর রাতে রওনা দিয়ে আসে কুম্ভকার,
তারপর কী হল গো বলো সমাচার।

—সমাচার কী মিতে? মিনু আমার আসবে? বলুন, আসবে তো!

দানোর নিঃসহায় মুখের দিকে চেয়ে থেকে কথা বলতেও কষ্ট হয়। চোখ সরিয়ে নিয়ে নাম মদন শূন্য বাতাসে চোখ রেখে বলল—এখন যা বলছি, মন দিয়ে শুনুন মিতে। মিতিনকে আসার সময় বলে এলাম, আপনি তেনার শোকে পাগল হয়েছেন। ঠিক আছে? তো, কেমন পাগল হয়েছেন, বোঝাতে পারিনি। আপনার হাতে মাটির নয়, আপনারই জাত নষ্ট হয়েছে মিতে। একজন শিল্পীর এত বড় অধঃপতন হল। কেন হল? স্রেফ আপনারই জন্যে মিতিন। মিতের সংসারে আর শিবের করণী হয় না। চাক শুকিয়ে দড়ি দড়ি হয়ে গেল। গোটা, পিটনি সবই আপনার হাত দুখানির জন্য হাহাকার করছে। আপনি ফিরে চলুন মিতিন, ফিরে চলুন।

প্রায় যাত্রার গলা করে বলে গেল নাম মদন। সেই সুরে ধাক্কা লেগে দানোর দু চোখ বেয়ে দরদর করে নেমে আসা অশ্রু গণ্ডদেশ ভেজাতে লাগল দাড়ির ভিতর দিয়ে। গলার কাছে দাড়িতে চোখের জলের শিশির চিকচিক করছে। সেই দিকে একবার চেয়ে দেখে নিয়ে মদন তন্তুবায় বলল—এই কান্না আপনার কে দেখছে? ধর্মনারায়ণ দেখতে পাচ্ছে? পাচ্ছে না। আমি ছাড়া কেউ দেখতে পাচ্ছে না। কেন? আমি কেন

দেখছি ? আমাকেই কেন দেখতে হচ্ছে ? বড়ো বাবা, আমাদের এক সুতোয় বাঁধলেন। দুজনের মাঝখানে বসালেন মৃন্ময়ীকে। কেন ?

—জানি না মিতে, জানি না। বলে হো হো করে কেঁদে উঠল দানো।

—আপনার মৃত্যুর বাসনা হয় ?

—বড়ো বাবা, আমাকে মরতে বলেছিলেন, পারিনি।

—কেন বলেছিলেন ?

—জানি না গো !

—জানেন না। কারণ, বড়ো বাবাও জানেন না। ওটা, ওই মৃত্যু, ওটা কী ?

—কী ওটা ? বলে শিউরে উঠল মদন পাল।

—বেত্তান্তের একটা চাল থাকে, বুঝলেন ? আপনার আমার আর মিতিনের কেচ্ছা, তার একটি ভনিতে করলেন ধর্ম, কী না আপনি মরে যাবেন। সেই থেকে মৃত্যু চড়ল আপনার কাঁধে। প্রেমে জন্মাল অবিশ্বাস। নইলে বুঝতেন, নাগরদোলায় মিনু পাল মাথা ঘুরে নাম মদনের কোলে মুখ গুঁজড়ে পড়ে গেল। কিচ্ছু না।

—আমি দেখেছি ! বলে দানো উদ্দীপিত হল।

নাম মদন বলল—জানি, আপনি দেখেছেন ! দেখবেন বইকি !

—মিনুর টিপ ধেবড়ে গিয়েছিল !

—টিপ ধেবড়ে গেলেই সন্দেহ করবেন স্ত্রীকে ! টিপ তুচ্ছ জিনিস, সহজেই ধেবড়ে যায়। সহজ করে দেখুন ব্যাপারটাকে।

—দেখতে পারি আমি ? সহজ করে ! হ্যাঁ পারি ! বলে দানো কেমন দুর্বোধ্য করে মাথা নাড়ে। তারপর বলে—হায় ঠাকুর, কী বলছেন আপনি !

—বলছি, আপনাকে বাঁচতে হবে। বড়ো বাবা বলে, নারী হল গাভীবৎ, শত যণ্ডের স্পর্শেও অপবিত্র হয় না। ভৈরবে চান করলেই শুচি। শিব আপনাকে অনুগ্রহ করবেন কুম্ভকার মিতে ! আচ্ছা, আপনার মাথা কিছুটা ছেড়েছে ?

—আঁ ?

—বুদ্ধির জোর পাচ্ছেন কিছুটা ?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। অল্প অল্প।

—পাচ্ছেন ? কিন্তু এই যে এখনও ঘাড় আপনার কাত হয়ে যাচ্ছে। সিধে করুন।

—পারব না মিতে, আমার আর হবে না। জাত গেছে বলছে

লোকে। আপনিও বলছেন। কত পাঁজায় আগুন দিলাম। সেই শাপে জিভটা আর মুখের মধ্যে থাকতে পারে না, কষের এখান দিয়ে ঝুলে যায়। উঁউঁউঁ, উঁহু, এখান দিয়ে, অ্যাই দেখুন। বুদ্ধি আর জাগে না আমার। দেখুন না, গায়ের ট্যানটুকুনই জোগাড় করতে কত মাইল হাঁটতে হয়। তা-ও মঙ্গলের সাথে ভাঁটায় আগুন দেওয়া-থোওয়া নিয়ে বিবাদ হয়ে গেল। পেট-কাঁদুনে মঙ্গল পাল আমার ভাগ মারতে চাইছে।

—কালই যাবেন। শুনুন, বোলজিৎপুর চলে যাবেন। বোলতলায়।

—সেখানে কী ?

—আগে যান সেখানে, দেখবেন ভাঁটায় সাজ হয়েছে। যান, তারপর মিল-অমিল ভাগ্য ! যান, অনেক সমাচার পাবেন। বোলতলায় মিতিন আসবে, মিলজুল হয়ে যাবে ! ব্যস !

—আপনি কেচ্ছা করছেন মিতে। এ ভাবে পাপের কাটান হয় না, বুঝলেন ! বংশীর আড়-বাঁশি সঙ্গে করে ঘুরতেন। বাজাতে পারতেন না। মানুষকে এ ভাবে নষ্ট করেন কেন ? আমাকে লোভ দেখিয়ে মারবেন। বোকা বলে, জাত গেছে বলে ! যাব, মিতের পাপ কাটান দিতে যাব ! ধুঁকে মরব, লোভে লোভে মরে যাব ! ক্ষ্যামা নাই গো নাম মিতে ! ক্ষ্যামা নাই !

দানোর কথায় কি রকম স্পৃষ্ট হয়ে গেল নাম মদন। কী রকম বোবা হয়ে গেল কিছুক্ষণ। জীবনটাই যার এত দোষাবহ, ঘাড় যার জীবনের চাপে বেঁকে গেছে, জিহ্বা কথা বলতে প্রায় অপারগ হয়ে কষে ঝুলে পড়ে, গণ্ড যার ভাসে মুহুর্মুহু অশ্রুতে, সেই আধভাঙা, বুদ্ধি গুলিয়ে যাওয়া লোক এখনও কী চতুর, নামকে পাপী প্রতিপন্ন করার বেলায় হৃদয়কে কী সতর্কতায় জাগিয়ে তুলল ! বিশ্বাসই করল না নামকে।

বংশীর কথা মিতবউ স্বামীকেও বলেছে ! ভাবতে ভাবতে সর্বাঙ্গ কাঁপতে লাগল নাম মদনের ! সব ক্রোধ নির্মলার দিকে ভল্লের মতো ছুটে যেতে চাইছে। এখন নাম বুঝতে পারছে, কেন ওভাবে ডায়েরি ধরতে নদীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল মৃন্ময়ী।

মদন তন্তুবায়ের সারা দেহ পাপের নিবিড় কালিমায় ভরে গেল। অন্তর তার কষ্টে মথিত হতে থাকল, অসাধুকে নারী ভালবাসে গতিকে ! পাপীকে নগ্ন করে দেখার কৌতূহল ছাড়া মৃন্ময়ীর অন্তরে কোনও সুখ নেই। এক রত্তি ভালবাসাও বাসেনি তাকে মিতিন ! কেন তার কাছে ছুটে গিয়েছিল সে ? এবং কেনই বা মিতবউয়ের নগ্ন যৌন-আবেদনে সাড়া না দিয়ে চলে এল ? দুখানি হাত দেখে মায়া হল কেন এই দানোর

জন্য ? অধোগতির এই জীবন থেকে পতিত শিল্পীকে শিল্পে ফেরাতে চাইল কেন মন ?

মৃন্ময়ীর দুটি হাতকেই কেন এ ভাবে ভালবাসতে গেলাম ? কেন লিখে রাখলাম ডায়েরির পাতাগুলি ? তা হলে কি কোনও পুণ্যজ্ঞান ছিল আমার ? আমি কি সত্যিই মদন পালের কষ্ট বুঝিনি ?

নাম কাঁপতে কাঁপতে বলে উঠল—আমি জানি, আপনার রূপ ধরে বোলজিৎপুর যেতে পারব না। আপনাকেই যেতে হবে মিতে। আপনিই মিতিনের সঙ্গে দেখা করতে বলেছিলেন। ভুল হয়েছে, মস্ত ভুল হয়ে গেছে আমার। পাপ, মানুষের ব্যক্তিগত। আমি পাপী। আমার ক্ষমা নেই। এতকাল কী যে করে বেড়ালাম, তাই ভাবি। আজ আর পাপের কাটান হবে কিসে, ভাবি না। আমার দুর্গতি দূর হোক তাও কি সম্ভব ? এই মুহূর্তে, আপনার সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ পাকা হল মদন পাল। চির-বিচ্ছেদ। তুমি আমার মিত্র নও, আমিও নই তোমার, জমি গেছে, সম্বন্ধও গেল।

মদন দেবনাথের এমত উক্তি শুনে হঠাৎ মদন পালের চমক লেগে বুদ্ধিস্তর স্বচ্ছ হয়ে গেল, কিছুক্ষণের জন্য স্কন্ধ সিধে হয়ে উঠল। সে দুর্গতির তলায় পড়ে গেলেও বুঝতে পারল, ভুল হয়ে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে নামের দু পায়ে পড়ে গেল উপুড় হয়ে। ডুকরে ডুকরে বলল—আমাকে ক্ষমা করুন মিতে। পাগল আমি। অর্ধাহারে থাকি, পরনের কাপড় পাই না। ইটভাটায় আগুন দিয়ে খাই। আমি মানুষ না। শাপগ্রস্তকে ক্ষ্যামা দিতে হয়।

—আমিই তোমাকে নষ্ট করেছি দানো। সব দোষ আমার। আমার জমির দোষ। হুদো পাখির দোষ। পরী ঘোটকীর দোষ। আমি ভ্রষ্ট, আমি ভুল। পা ছাড়ো।

—মাফ তা হলে করবেন না।

—আমি কিসের মাফ করব তোমাকে। আমি নিজেকেই ক্ষমা করি না আজ। ক্ষমা মহতের ধর্ম, আমি মহৎ নই। সম্বন্ধ চুকে গেলে দ্বন্দ্বও থাকে না। মিনু পালকে বল, আমার সম্বন্ধে সব কৌতূহল ত্যাগ করতে। যাও, ভাঁটা সেজে বসে আছে, পরেশের ভাঁটা। চাইকি, একখানা ধুতিও পেতে পার। তোমার উঠোনে চটি পেতে বসে কাঙালপনা অনেক তো হল। তাই না ? এই তা হলে শেষ দেখা। চলি দাদা। পা ছাড়ো দেখি। মিতিনের মিতেগিরির স্বাদ কিন্তু মনে থাকবে। বলে দিও। চলি।

নাম মদন চলে এল পথে। মুখ হাঁ করে তার পথচলা দেখতে থাকল

মদন পাল। তারপর আপন মনে হাসতে থাকল। বিকেল ফুরিয়ে রাত এল ঘরে। অন্ধকারে ভূতের মতন বসে রইল দানো।

রাত্রে সারারাত ঘুমাতে পারল না মদন তন্তুবায়। বোনের মুখ চেয়ে তীব্র কুঁচকোনো ঘৃণা আর ব্যথা সারা মুখে ভরে গেল। ছটফট করল বিছানায়। শেষ রাতে শারীরিক কষ্টে বারান্দায় খুঁটি ধরে বসে হড়হড় করে বমি করে ফেলল। কলতলায় এসে মাথায় জল ঢালল। তারপর আকাশে শুকতারার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে ভাবল, বোলতলার ভাঁটায় কে আগুন দিতে এসেছে, যদি জানতে না পারে মৃন্ময়ী! এই আশঙ্কা মনে জাগতেই নাম সাইকেল বার করে ছুটিয়ে দিল বোলজিৎপুর।

পরেশের উঠোনে ঢুকে সিধে মৃন্ময়ীর সামনে এগিয়ে এসে বলল—ভাঁটায় আগুন হচ্ছে, গিয়ে দেখুন কে এসেছে! বলে নাম আর দাঁড়াল না, বাড়ির পথে সাইকেল ছুটিয়ে দিল।

॥ ৭ ॥

মৃন্ময়ী অপ্রত্যাশিতভাবে নামের আসা আর মাত্র একটি বার্তা দিয়ে চলে যাওয়ার ঘটনা কিছুতেই বুঝতে পারে না। সেই ভোরে পরেশের ইটভাঁটার বোলতলায় এসে দেখে ভাঁটা ধোঁয়াচ্ছে। কে এসেছে এখানে?

পরেশ কেমন হতভম্বের মতন কাঁঠালতলায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। বোনকে দেখে চোখের ইশারায় কাছে ডাকল।

—লোকটা কে রে দিদি!

—কোন লোকটা?

—আগুন দেবার সময়, হুকুম চাইল। পাটকাঠির বাণ্ডিল জ্বেলে পোনে নেমে গেল হুকুম দেওয়া মাত্র। তখনই মনে হল, কে মানুষটা? পাপের হুকুম তো দিলাম। কাকে দিলাম দিদি!

—কে?

—খুব চেনা চেনা ঠেকল। ওহে পাড়নদার, শোনো তো।

হেডপাড়নদার এগিয়ে এসে বলল—কে আবার হবেন। নাম মদন।

মৃন্ময়ীর চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠল। পাড়নদার পোনের মুখটায় নেমে ডাক দেয়—ওহে মদন, ইদিকে আসো দিকিনি। দিদি তোমার মুখ দেখবেন।

কাঁপতে কাঁপতে আগুনে ঝলসানো মদন পাল উঠে এসে পাগলের ক্ষুধার্ত দৃষ্টিতে স্ত্রী মৃন্ময়ীর মুখে চেয়ে স্থির হয়ে গেল। মিনু পাল এমন

করুণ বিধ্বস্ত দানোকে দেখে আর স্থির থাকতে পারল না। বুকের ভেতরটা মায়ায় তীব্রভাবে মোচড়াতে থাকল।

ছুটে এল স্বামীর কাছে মৃন্ময়ী। দানো তখন ভেঙে পড়ে যাচ্ছিল মাটিতে। দু হাত দিয়ে ধরে ফেলল মদন পালকে মিনু। স্বামীকে টেনে আনল বাপের বাড়ি। শুইয়ে দিল ঘরের চৌকির বিছানায়। তারপর সেবা করতে লাগল। চান করাল, খাওয়াল। রাত্রে মিলিত হল ওরা। তারপর স্বামীর সোহাগে অস্থির হয়ে পড়ল মৃন্ময়ী।

একবারও মিনু পাল নাম মদনের কথা তুলল না। দু চোখ মুদে সে তখন সম্ভোগ-পাগল স্বামীকে নিজের দেহে গ্রহণ করছিল, মনে হচ্ছিল এ যেন নাম মদন ; যেন সে স্বামী হয়ে তার মধ্যে ঢুকছে। মৃন্ময়ী শীৎকৃত হতে হতে আপন মনে বলছিল—এত পাগল তুমি মিতে। এতই আশ্চর্য।

ঘাড় সিধে হতে থাকল ধীরে ধীরে এবং দানো মদনের কষে ঝুলে পড়া জিভ আস্তে আস্তে মুখের গহ্বরে ঢুকে গিয়ে যথাযথ হয়ে গেল। পেট ভরে ভাত খেল দানো। ভাতের রসে শরীর শীতল হল, শরীরের কাঠামোয় বল ফিরে এল। স্ত্রী-সম্ভোগে মস্তিষ্ক স্থির হল, দেহের শোণিত হয়ে উঠল সুপ্রবাহিনী। চোখের দৃষ্টি হয়ে উঠল পরিচ্ছন্ন। মুখের ভাষায় ফিরে এল রসের ভিয়েন।

পাছার ট্যানা ঘুচে গিয়ে নতুন ধুতি জড়িয়ে ধরল তাকে। মৃন্ময়ী স্বামীকে সুগন্ধি তেল মাখিয়ে চান করাল বোল-জিৎপুরের পুকুরে। দশ কিলোগ্রাম চাল আর মাঠের বেগুন বেঁধে দিল একটি বস্তায় পরেশ তার বোনকে ; সেই বস্তা স্বামীর মাথায় চাপিয়ে দিল মিনু পাল।

স্বগৃহে ফিরে এল মৃন্ময়ী। পরেশ তার জন্য এক জোড়া নতুন জর্দা পেড়ে আর কটকি শাড়ি দিয়েছে, রঙিন স্যান্ডেল, ঝলমলে ব্লাউজ, সব দিয়েছে। মিনুর বরকেও ধুতি, বাংলা শার্ট, গঞ্জের মুচিদের তোয়ের করা চড়াতোলা জুতাও দিয়েছে। মচমচ করে ঘরে ফিরল মদন পাল।

মদন পাল নিভৃত সুরে স্ত্রীকে বলল—নাগরদোলায় চড়লে তোমার মাথা ঘোরে, আগে তো বলনি ?

—কে বলল তোমাকে ?

—কেন, মিতেই বলছিল। মাথা ঘুরে তুমি তেনার কোলে বাঁই করে মুখ ঘুষে পড়ে গেলে, তোমার টিপ ধেবড়ে গেল। মিতে বলেন, মেয়েদের সহজেই টিপ ধেবড়ে যায়। টিপ তুচ্ছ জিনিস !

—বলেছেন বুঝি ?

—হ্যাঁ, বলেছেন।

—আর কী বলেছেন ?

দানো মাথায় চালের বস্তা নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল একটি জিয়ালা গাছের তলে। পিছনে ঘুরে স্ত্রীর মুখে মিষ্টভাবে নিরীক্ষণ করে বলল—বলেছেন ন্যাকামি না করেই নাটুকে গলায়, বোলজিৎপুরে পরেশের ভাঁটায় সাজ হয়েছে। চলে যান।

—ও! তোমাকে এ ভাবে বলতে পারল! বিস্ময় প্রকাশ করল মিনু। একদণ্ড চুপ করে থেকে।

—কী করবেন! মানুষের জাত গেলে মানুষই তো আনন্দ পায়, নাকি? তবে এ কথাও বলেছেন, আমি শিল্পী মানুষ, আমার অধঃপতনে তেনার কষ্ট আছে।

—ওহ্!

—আচ্ছা মিনু, তুই ওভাবে ডায়েরি ধরতে গেলি কেন বউ! সঠিক করে বলবা মৃন্ময়ী!

—নির্মলা ওই ডায়েরি পড়ে এসে আমাকে মিতের দুর্বুদ্ধির জানান দিয়েছিল কি না! তুমি ভাবলে কেন আমি অমন করে ডুবতে গেলাম, তাই না? ডায়েরিও তুচ্ছ জিনিস, পাল মশাই।

—তুই তো তুচ্ছ করতে পারলি নে গিন্নি!

—পারব কী করে! মেয়েমানুষের মন তুমি বোঝো না, তুচ্ছ জিনিসে লোভ থাকে। ভাবলাম, ওই ডায়েরি আমি আমার কাছে রাখব।

—ওহ্, তাই বল। নির্মলা দাদার ডায়েরি পড়ে তোকে বলেছে?

—হ্যাঁ, তোমায় বলিনি, নাকি?

—না। বলেছিলি, নিমি বংশীর মরার কথা বলেছে, সরকারের মেয়ের বিয়ে কিন্তু মিতেই ভেঙে দিয়েছিল। কুঞ্জির বদনাম দেবার বেলায় ওই একই লোক। কিন্তু সব কথা ডায়েরিতে লিখেছে মিতে, কী করে জানব!

—তুমি খালি খালি মাথা খারাপ করলে! ভেসে গেলাম, মনে হল, আমি একা, সংসারে আমার আর কে আছে! তলিয়ে গেলে মেয়েলোক একাই মরে, একা ভাসতে এসেছি, ভেসেই যেতাম, কতদূর এই নদীটা গেছে গো, দেখতে বাসনা হয়!

—কী সর্বনাশের কথা মিনু! নদীর মুড়ো দেখতে চাস তুই?

—এই নদীটুকুনই ভৈরব, নারীর বাসনা হবে না? বড়ো বাবা বলেন, নদী আমাকে খায়, নদীকে আমি খাই। সেইই বা কেমন, আমিই বা কেমন!

—ওহ্! জল জঙ্গল নারী, তিন চিনতে নারি। কথায় বলে নদীর মন মানুষ বোঝে না।

—আমাকে তুমি বোঝো ?

আরও একটি গাছের তলায় হেঁটে এসে ফের থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে দানো।

পিছনে আবার ঘুরে দাঁড়িয়ে মিনুকে বলল—আমি তোকে মেরে ফেলতে গিয়েছিলাম বউ।

মদন পালের চোখ দুটি ভিজে এল। সেই চোখের জলের দিশার দিকে চেয়ে দেখতে দেখতে মৃন্ময়ী বলল—তুচ্ছ জিনিসে আমার কেমন লোভ শোনো। কেন হবে না। কুমোরনি আমি, দুঝোড়া মাটিতে লোভ কি না। ভেসে যেতে যেতে বোলতলার ঘাটে পৌঁছে দেখি দুটি কালো মোষ কী সোয়াদ করে দেহ ডুবিয়ে চান করছে। কেমন ঠাণ্ডা-গরম ভারী জল, মোষের চান, শরীরটা লোভেই মরে গেল। না হলে ভেসেই যেতাম বুঝি।

কথা শেষ করে স্বর সামান্য উচ্চে তুলে হাসতে লাগল মিনু পাল। সেই হাসিতে যথেষ্ট কষ্ট হচ্ছিল মদন পালের।

আবার হাঁটতে শুরু করল ওরা। নদীর পাড়নের সরণি ধরল। নদীকে দেখে মন কেমন করছিল মৃন্ময়ীর। নদীর সমস্তখানি দুচোখ ভরে কখনও দেখা যায় না, অথচ চোখ দুটি সেই মস্ত সমস্তকে দেখতে চায়; ক্ষোভে দুঃখে, বেদনায় আনন্দে, পাপেপুণ্যে, সন্তাপে, সহস্র কষ্টের ভিতর কী তৃষ্ণা যে জাগে! কিন্তু ওই পর্যন্তই; ভেসে যাওয়া মিনু পাল দুটি জলডোবা কালো মোষ দেখে আটকে গেল, মুড়ো অবধি যেতে পারল না। মরতে মরতেও সে বেঁচে গেল। এই দেহ কোথায় পুড়ে ছাই হয়ে ভেসে যেত। এই দেহ না থাকলে কোথায় পেত এই দেহ! এত যে চোখের জল কী দেখে ঘনিয়ে তুলত মদন পাল। কাকে ভোগ করত এভাবে!

এই দেহ ভৈরব আমাকে দিয়েছে, এখন আমি এই দেহ যাকে খুশি দেব! আমি অভিশাপের হাওয়ার মতন এই নদীতীরে ঘুরে মরছি। কারও নই আমি আর, কেউ আমার নয়। ভাবতে ভাবতে নদী-সীমানার পাড় সরু হয়ে ভেসে যায় মৃন্ময়ীর কাজলটানা চোখ। নিজেকে বড়ই উন্মনা লাগে তার।

সামনের চলমান স্বামী আপন মনে বিড়বিড় করে উঠল—নদীর মুড়ো নাই, মানুষের কথারও মুড়ো পাওয়া ভার। বলে কি, বোলজিৎপুর চলে যাবেন। বোলতলায়।

—মিতেই বলল তোমাকে!

—বলবে না, ভিতরে ভিতরে ক্ষয় হয়ে গিয়েছে যে। শুধালাম,

সেখানে কী ?

—কী বলল ?

—আগে যান সেখানে, দেখবেন ভাঁটায় সাজ হয়েছে। গড়পড়তা মাটি, গর্দা মাটি, তারও কি না সাজ। তা-ও বললে, আগে যান, মিল-অমিল ভাগ্য।

—তোমাকে বলল এমন করে ? নাম কী চাইছে বলো তো।

—হ্যাঁ, নাম। ওই করেই ডাক মিনু। ও আর মিতেটিতে না। সেই শখ আমারও ঘুচেছে। কথা শুনে ঘেন্নাও হল। আমার মিল-অমিল তোর বোঝার সাধ্যি আছে নাকি। পরিহাস বোঝো মৃন্ময়ী। পরিহাস। আমাকে ছেলেমানুষ পেয়েছে। মুখে ভাষা নেই দেখে যা খুশি বলবে।

—কী বললে তুমি ?

—ভিতরে ভিতরে ক্ষয়ে গেছে তো।

—তা গেছে। কী বললে তাই বলো।

—বললাম...বলে থমকে পিছনে ঘুরল মদন পাল। তারপর একটা ঢোঁক গিলে বলল—আপনি কেচ্ছা করছেন মিতে। এ ভাবে পাপের কাটান হয় না, বুঝলেন। বংশীর আড়বাঁশি সঙ্গে করে ঘুরতেন। বাজাতে পারতেন না। ব্যাস।

—তুমি এই কথা বলে দিলে। তোমায় না বলেছিলাম, এই সব কথার প্রমাণ নেই। কখনও কারও সমুখে বলো না।

—সে তো কই অস্বীকার করল না মিনু। এই মানুষকে ক্ষমা করব কেন।

—আজ যদি তোমাকে ক্ষমা না করি পাল মশাই।

—ছিঃ। ছিঃ। ঠাট্টা করছ বুঝি।

—না।

—তুই আমাকে বাঁচতে দিবি না মৃন্ময়ী। তুই আমাকে মেরে ফেলতে চাস ? বলে সহসা আর্ত-নিনাদ করে উঠল দানো।

—চুপ করো। কে কাকে মারতে চায় নদীই জানে।

—হ্যাঁ, জানে বইকি। না হলে সংসারে কত জমিই তো ছিল। নামের জমি চিরে দিল কেন ? লোকেই বলছে নানাখানা করে। আমি আর কী বলব। পাপীর নাম ডাকলে তবেই নদী কীর্তিনাশ করে মিনু।

—মিতের আবার কীর্তি।

—হ্যাঁ, কেলোর কীর্তি। বলে হাসবার চেষ্টা করেও মদন পাল সাহস পাচ্ছে না দেখে মৃন্ময়ী নিজেই হেসে উঠল। মদন তখন দম ফাটিয়ে হেসে ফেলে দেখল মিনুর চোখে জল এসে পড়েছে। এবং মিনু সহসা

থেমে পড়ে গম্ভীর হয়ে গেছে।

—চলো। কালই একবার কাঙালটাকে ডেকে এনো! কী হল, যাচ্ছ না কেন? চলো!

— না, মানে! বলে পা বাড়িয়ে কেমন স্তম্ভিত হয়ে থেমে পড়ে মদন পাল। তাকে কিছু বিমর্ষ দেখায়।

— এই যে বললে, তোমার মিল-অমিল ও বোঝে না, ডেকে আনো তবে তো দেখে বুঝবে!

— না।

— না, কেন?

— ওর ওই চোখের সুখও আমার সহ্য হবে না।

— আমার হবে। আমি আনন্দ পাব। তুমি যাও।

— না। হবে না।

— হবে না কেন পাল মশাই! নামকে তুমি ভয় পাও নাকি! এই যে বললে...

— কারও চোখের সুখ তোকে দেখাতে গিয়ে আমিই যদি আমার সুখ হারিয়ে ফেলি মিনু! তুই কোথাও চলে যাবি না তো বউ।

— ও। এই জন্যে যাবে না? বেশ।

— রাগ কেন করছিস মৃন্ময়ী। ও আর আসবে না।

— কেন?

— আমাদের বিচ্ছেদ নামই পাকা করে চলে গেছে। চির-বিচ্ছেদ। মদন পাল বলে ডেকেছে আমাকে। বলেছে, তুমি আমার মিত্র নও, আমিও নই তোমার। জমি গেছে, সম্বন্ধও গেল।

— তুমি অমনি বিশ্বাস করলে বুঝি। কেন, তুমিই তো বলতে, জমি গেলেও সম্বন্ধ থাকে!

— রাখলে থাকে, না রাখলে থাকে না।

— আমি রাখব। তোমাকে যেতে হবে।

— না। মদন পাল বলে ডেকেছে আমাকে। সম্বন্ধ ভেঙে গিয়েছে মিনু। কাঙালকে আর কিসের ঘরে তোলা, কিসের সন্‌মান।

— জমি গেছে, কিন্তু মাটি তো আছে এখনও।

— ওই খতেন আর করিস না বউ! ভুলে যা। বলে মদন পাল দ্রুত হাঁটতে লাগল। অনেকটাই পিছিয়ে পড়ল মৃন্ময়ী। চির-বিচ্ছেদ কথাটি তার দেহ হজম করতে পারছিল না।

যে আড়াই বিঘের জমিদার তাকে পাকে পাকে জড়াতে চেয়েছিল, তার হাতের মুঠোয় তাঁতের মুঠো ছাড়া আর আর কিছুই ধরার নেই, সব

গলে গেল। সে ভিতরে ভিতরে ক্ষয়ে গেছে; তত দিনই সে আগলদারির কথা ভাবত, যতদিন তার জমিটুকুনই ছিল।

মিতে আশ্চর্য লোক। বাইক তার আশ্চর্য, মাদি ঘোড়াও আশ্চর্যের, আড়বাঁশি কতই না কঠিন! ডায়েরিখানা কী করে লিখত লোকটা!

কত মেয়েই সংসারে ছিল! কারও দিকে চোখ গেল না তার। এতই ভীরু সে যে, ঝোড়ার মাটিতে চোখ ফেলে রাখল এত কাল! নরম, অসহায় মৃন্ময়ীকেই সহজ মনে হল! আমি কি এতই সহজ, চাইলেই পায় নাকি কেউ! ওই লোকটা অমন দুম দুম করে হেঁটে যাচ্ছে কিসের দর্পে? মিল-অমিল ও বেচারি ভাগ্য বলে জানে। আবার ভাগ্যের চেয়ে হাতের তেজ কম দেখায় না। ফের কতটুকু মিলেছে ওর তা-ও কি জানে! মিল আর অমিল, হায় মহাদেব, এই খতেন আমিই বা কী করে করব! বলে আপন মনে দীর্ঘশ্বাস ফেলে পায়ের গতি বাড়িয়ে দিল মিনু পাল!

ঘর বসল ওর। চাক ঘুরল ওর। না, চাক ঘুরবে বলে মাটি আনতে নামল মৃন্ময়ী নদীর কুক্ষিতে। মদন পাল এখন লাঠি ফেলেও হাঁটাচলা করতে পারে।

একদিন স্ত্রীকে বলল— এক ঝোড়া মাল এনেই খালাস! ধুঁকে মরছিস মেটেসাপের মতন। কী হয়েছে তোর মিনু! এতক্ষণ ধরে নদীতে রইলি, মাল এল এতটুকুনই! কী করছিলি তুই?

— খালি কে আসে, কে আসে, সেই ভয়। দিক সামলে তবে তো আনব। কে যায়, কে আসে দেখতে হবে না! তা ছাড়া রতনের মাটি নেব না। কতদূর গেলাম! আচমকা মনে হল, মিতেই বুঝি আসছে। কেমন ভয় পেয়ে গেলাম, জানো! লুকিয়ে পড়লাম পর্যন্ত! তারপর নিজেরই কেমন হাসি পেয়ে গেল।

স্ত্রীর বিবরণ শুনে কেমন থ হয়ে বসে রইল মদন পাল। তার থুতনি ঝুলে পড়ল। কোনও কথা বলল না। দু'হাতে শুধু উঠোনের মাটির কাড়া গুঁড়ো করতে থাকল আঙুলের চাপে।

মদন পাল পরের দিন ভোরে বাহ্যে বার হয়ে নদীর জলে শৌচ করে উঠে দাঁড়িয়ে নাম মদনের নদীচেরা গাভলার দিকে চেয়ে রইল অনেকক্ষণ একদৃষ্টে। সূর্য রাঙা দিয়েছে পুব-আকশে। কুসুম কুসুম রোদ লাগছে গায়ে। মদনের গায়ে ধুতির ফেরতা দেওয়া। বেশ একটু শীত শীত ভাব। তবে দিনেরবেলা বেলা বাড়লে চড়া রোদ পড়ে।

গাভলার মধ্যে ঢুকে পড়ে মদন পাল। বেশ সজাগ দৃষ্টি দিয়ে দেখে গাভলার কোলে কোলে যথেষ্ট মেটেলের বিঘত বিঘত স্তর। কেউই কিন্তু সেই কুক্ষিতে একটি কোপও মারেনি। গাভলা কাটা যেন মরা

মানুষকেই কোপানো। সে একটা বোধবুদ্ধির ব্যাপার, কিন্তু তারও চেয়ে বড় কথা, এই কুক্ষি খেলে গাভলার উদর বেড়ে যাবে, তখন নদী বানের সময় বাঁধ ঠেলে ঢুকে এলে জমিটুকুকে নানামুখে ভেঙে কী করবে ভাবতেও ভয় করে। তবে বাঁধের মুখ শক্ত করে রেখেছে পালেরা। উচ্চ ধরনের বান না হলে বিপদের সম্ভাবনা নেই।

দানোর কেমন লোভ হচ্ছিল। তীব্র অবৈধ আসক্তিতে মানুষ যেমন অস্থির হয়, তেমনই একটা মনের অবস্থা হচ্ছিল তার। সে যেন কিসের একটা শোধ নিতে চাইছিল। কিন্তু সঙ্গে ঝোড়া খুপড়ি কিছুই নেই। গাভলা ছেড়ে উঠে এল নদী পাড়ের পথে। মনে মনে ভাবল, সত্যিই সে মৃন্ময়ীর মন একফোঁটা বোঝেনি। মিনু পাল মিতেকে একবার হয়তো চোখের দেখা দেখে দৃষ্টির সুখ দেখিয়ে বেচারিকে লোভাবে, হা ঈশ্বর, এ কেমন মন! তবু এই নারীই তার জীবনের আশ্রয়। মিনুর দু'খানি হাতই তার বেঁচে থাকার ক্ষমতা। নাম মিতে তাকে হাত দু'খানি ফেরত দিয়েছে। তারপর সম্পর্ক ত্যাগ করে চলে গেছে। সত্যিই কি সম্পর্ক শেষ হয়ে গেছে!

কিছুতেই মন সরছিল না, কিন্তু দানোর পা দু'খানি তাকে টেনে আনল নামের ভিটেয়। মাথা নিচু করে বসল তন্তুবায়ের ঝাঁপের কাছে। আশ্চর্য শুকনো মুখ, কষ্টের খোঁচায় মুখের চামড়া মলিন। সেই মুখের দিকে চেয়ে নাম মদনের মনটা কেমন করে উঠল।

সাবিত্রী মদন পালকে দেখে তেরছানো দৃষ্টিই নিক্ষেপ করল, সেই দৃষ্টিতে বিষ ছাড়া কিছুই ছিল না। কথাও বলল না সাবিত্রী, বরং দূরেই সরে সরে থাকল। বোন নির্মলাকে দেখে সবচেয়ে কষ্ট পেল মদন পাল।

নির্মলা বড়ই অকারণ দানোকে দেখে হাসতে লাগল। কষ্ট হচ্ছিল বটে, আবার সব কেমন স্বাভাবিকও মনে হচ্ছিল মদন পালের। নির্মলার গা থেকে কাপড় খসে পড়ে গেলেও মেয়ের কোনও হুঁশ ছিল না। গায়ে জামা নেই, বুক জোড়া কেমন ছোট আর শুকনো। শরীর সম্পর্কে মেয়ের কেমন চেতনা নেই। সে তার যৌবনকে আর কানাকড়ি মূল্য দেয় না। আবার কোনও ক্ষুধার্ত গ্রাম্য ছেলেকে গোপনে দেহ দিয়ে ফেলতেও পারে না।

খালি শুকিয়ে যায় আর পাগল হতে থাকে। একটা দৃশ্য দেখল মদন পাল, নামের বাঁ দিকে রাখা মাড়ের ছোট গামলায় ঠাণ্ডা মাড়, তাতে হাত ঢুকিয়ে দিল নির্মলা আচমকা। এক খাবলা তুলে নিয়ে মুখে দিয়ে হিহি করে হেসে উঠল। নাম চোখ পাকিয়ে বোনের দিকে চাইলে বোন

হাসতে হাসতে বলল— মারবি নাকি রে দাদা ! মার, মার, আমাকে মেরে ফেল ! বলে এঁটো মাড়লাগা হাত দিয়ে নিজেকেই চড়াতে থাকল নির্মলা। সঙ্গে সঙ্গে কোথা থেকে সাবিত্রী ছুটে এসে মেয়ের হাত শক্ত করে চেপে ধরে টেনে নিয়ে চলে গেল অন্যত্র।

ওই দৃশ্যের দিক থেকে চোখ ফেরাল নাম মদন। তারপর দানোর দিকে চেয়ে বলল— বলুন ! কী খবর ! বলে হাসবার চেষ্টা করল। পায়ের তলার পাশানড়িতে চাপ দিয়ে ঝাঁপ টেনে মুঠো মারল, মেড়া ধাক্কা দিল মাকুকে। বিদ্যুতের মতো বয়ে গেল মটকার ভিতর দিয়ে মাকু।

— মিতিন আপনাকে একবার দেখতে চাইছেন মিতে !

— এই বোনটাকে তো দেখলেন ! বড় জ্বালা ! নিমিকে ছেড়ে কোথাও যেতে সাহস হয় না। রাতদিন আমার সঙ্গে খুনসুটি লেগেই আছে। এই দেখুন, বিশ্বাস করবেন না, এই গালে কেমন করে কামড়ে দিয়েছে ! অ্যাঁ দেখুন, দেখুন। বলে নাম দানোকে তার গালটা অন্যপাশ থেকে ঘাড় ঘুরিয়ে এদিকে আনে। ঘা। দানো ভয়ই পেল কিছুটা। মনে মনে ভাবল, এ হল অভিশাপ।

— তা হলে যাবেন না একবারটি ?

— এ গর্ত ঠেলে মন আর ওঠে না মিতে ! শুনছি, তারা পাল পাড়ভুঁই এক এক করে খরিদ করছে। টালির ব্যবসা আরও বড় করবে। আরও একখানা কল বসিয়েছে। আপনাদের হাড়ির ব্যবসার সুদিন আর নেই। অনেক পাল শুনছি তারার গোলায় কাজ ধরছে, জাত-ব্যবসা তুলে দিচ্ছে। শুনেছেন কিছু ?

—শুনব কি, দেখছিও ! আর একখানা কল এখনই বসেনি, তবে বসবে। ওই দেখলে আমার চলবে। গড়পড়তা মাটির কাজ। খুব মোটা কাজ মিতে ! মুনিষ খাটব তারার গোলায় ? বলেন কী ! ইটভাঁটায় আগুন দিলাম, শাপেতাপে গেল কিছুদিন। বাপপিতামোর কামেই থাকব, কপালে যা আছে হবে ! কল যা পারে, আমি তা পারি না, ঠিক কথা। কিন্তু আমার হাত যা পারে, কলের সাধ্য কি যে করে। কল থাকবে, আমিও থাকব।

— ভাল কথা। কিন্তু কার কুক্ষি খুঁটবেন ! তারা আমার গাভলা জমিটুকুই চাইছে। যুক্তি হল, মাটি ফেলে গাভলা বোজাবে। জমিকে আমার সিধে করে নেবে। তাতে বসতি রক্ষা পাবে, কলও চলবে।

— ভাল কথা নাম মিতে ! দরদাম ?

— তা-ও হয়েছে, খুবই শস্তা।

— কত ?

— যা দেবে, তাই নেব। আমার তরফে আর কোনও জিদ নেই দানো মিতে! ওই টাকা আর গাই বেচে যা হবে, একত্রে জড়ো করে নিমির বিয়ের এই শেষ চেষ্টা মিতে!

— ভাল। তা হলে উঠি। একবার গেলে ভাল হত! মিনু বলতে পারবে না যে, আমি হিংসে করে আপনাকে ডাকিনি। জমি গেলেও সম্পর্ক থাকে, আপনি দেখছি তা-ও বিশ্বেস করছেন না।

— অমন কথা বলতেও ভাল, শুনতেও ভাল। আপনি শিল্পী মানুষ, ভাবের কথা বলতে ভালবাসেন। তা শুনে লোভও হয়। লোভে লোভে তাঁতি আর কত যেতে পারে বলুন।

— যাবেন না তা হলে? বলে উঠোনে নেমে দাঁড়াল মদন পাল। তারপর মনে মনে প্রত্যাশা করে, নাম যেন কড়া করে না বলে ওঠে। পাল একটি না-এর জন্য হাঁ হয়ে রইল।

নাম দু'দণ্ড চুপ করে থেকে বলল— যাব না কী করে বলি! আপনার ভাবুকেপনার জবাব দিলাম। আসল বস্তুটি হল কী জানেন। গাভলা ভরাট করবে তারা পাল, তার আগে যত পারেন কুক্ষি কেটে ঝোড়া ভরে উঠোনে এঁটেল জমা করুন। যান। চলে যান।

কী আশ্চর্য তীব্র লোভ মদন পালকে গলা অবধি চেপে ধরল। বউকে কোনও কথা না বলে দানো গাভলায় খুপড়ির কোপ বসিয়ে দিল। ঝোড়া ঝোড়া মাল ধসা কোমর নিয়ে ঠেলে তুলে আনতে দেখে মৃন্ময়ী অবাক হয়ে গেল। জীবনের এমন উদ্যম, এত রোখ, এতই টান দেখে মিনুর চোখ বিস্ফারিত হয়ে গেল। বুকের ভেতরটা মায়ায় টনটন করে উঠল মৃন্ময়ীর।

মদন পালের বুকের শক্ত হাড়, শিরাউপশিরা অর্থাৎ বাতা আর ছোবার বাঁধন যেন আবার মৃন্ময়ী নতুনভাবে অনুভব করতে লাগল। এই লোককে ফেলে আর কোথায় যাবে সে? নদী যদি তাকে কোথাও ঠেলে পাঠাতে চায়, তা-ও তো সে পারবে না।

মদন পাল কতদিন রস করে বলেছে— তোর বাপ তোর সঙ্গে নয় মিনু। তোর দু'খানি হাতের সঙ্গে আমার বে দিয়েছে।

এ কথা মনে পড়লে মৃন্ময়ী তার নিজেরই হাতের দিকে চেয়ে থাকে। আয়নায় দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখে। বাহু দু'টির অনুপুঙ্খ বিচার করে। এই হাত দিয়ে নামের গলা জড়িয়ে ধরেছিল সে! এই বুকে মুখ দিয়েছে লোকটা! বুকের সব তন্তু কিভাবে যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তরঙ্গে কেঁপে শরীরকে মাতিয়ে তুলেছে! কী হালকা পশমের মতো মানুষটা।

একথা ভাবলে যে চাক আর ঘুরবে না। দানো যে মরে যাবে! ওর

ওই বুকের বাতা আর দড়ি যে ভয়ানক !

— কোথা থেকে এত মাল আনছ গো ?

— গুপ্তধন পেয়েছি মিনু। ঠাঁই দাঁড়িয়ে দেখে যা খালি ! জীবনটা এই রকমই বউ, শুধু অবাক হয়ে দেখার জিনিস ! আমি তো নেশার মতন মাটির সুগন্ধে মরে যাচ্ছি। কথা কী কইব এখন ! দাঁড়া, সম্বৎসরের ব্যবস্থা এই বেলা করে রাখি। তারপর স্কন্ধ আর নিতম্ব, আমি দেব মুখ, তুই দিবি আহার।

— ইস্, মরে তো আমিও যাচ্ছি গো !

— যাবি, যাবি ! এত কাণ্ড হয়ে যাচ্ছে, আক্কেলে কূল পাওয়া যায় না।

মাটি-শিকারী মানুষের কাছে মাটি এক অমর্ত্য-বিস্ময় ! নদীর কাঁধালে কীর্তিনাশা মৃত্তিকা ; ওই কুক্ষি, যেন লুব্ধক চরাচর। যত কাটা যায়, ততই সে কাটতে প্ররোচিত করে।

সেই ফাঁদে পড়ে গেল মদন পাল। নেশায় মজে গেল সে। এত নেশা যে, রাতে ঘুম চটকা লেগে ভাঙে, তখন বউয়ের ঘুমন্ত শরীরের পাশ থেকে উঠে চুপিসাড়ে ঝোড়া খুপড়ি নিয়ে গাভলায় এসে নামে।

একদিন রাত্রে টলটলে চাঁদ উঠেছিল। রাত অনেক। মৃন্ময়ীর কেমন করে ঘুম ভেঙে যায় হঠাৎ। পাশে স্বামী নেই দেখে আনচান করে ওঠে মনটা ! হঠাৎ-ই মনটা ওই রকম করে। মিনু পাল বাইরে আসে। চাঁদটাকে চেয়ে চেয়ে দেখে। হু হু করে বুকটা। কার জন্য এমন হচ্ছে তার ? স্বামীরই জন্য বোধহয়, নাকি মনে অন্য কেউ আছে ! কে আছে মনেরই অন্তরালে ?

নদীর ধারে চলে আসে মৃন্ময়ী। গাভলার কিনারে দাঁড়ায়। নীচে চেয়ে দেখে। কে একজন তলায় বসে আছে। কে ও ? মৃন্ময়ী দ্রুত নামে তলে। বসে থাকা লোকটার কাছে ঝুঁকে স্পর্শ করা মাত্র তার শরীরে বিদ্যুৎ ছুটে যায়। সহস্রমুখ বিদ্যুতের ঝাঁকুনিতে নিঃশ্বাস প্রগাঢ় হয়ে ওঠে তার। নাম উঠে দাঁড়িয়ে মিতবউকে আলিঙ্গন করে।

— এত মেটেল কেটে নিয়েছে মিতে। এত !

মাটির গুহার দিকে চেয়ে দেখে আঁতকে ওঠে মৃন্ময়ী। চুঁট ভেঙে পড়ার উপক্রম, তবু দানো থামতে চায় না। ক্রোধে, নেশায়, রোখে, আসক্তি আর লোভে কী না করছে মদন পাল !

সব দেখে শুনে মিতেকে আরও বুকের কাছে টানে মিতিন। বলে—এসো ! মৃন্ময়ী পুতুলের মতন নামকে টেনে তুলে আনে গাভলার বাঁধের এপারে নদীর খাঁড়ির একস্থানে ; এ স্থান খোদল করা গুহার মতন

এবং পলির রেতে মসৃণ। নদীর সরণি অতিশয় নির্জন।

চাঁদ এক উত্তম প্রকাশক। কিন্তু তবু দুই নরনারী গোপন। চিত হয়ে শুয়ে পড়ে মৃন্ময়ী। দুই জানুর মধ্যে নেয় নামকে। কাপড় তার জড়ো হয়ে কোমরে নেমে আসে। নদী থেকে গোপন হাওয়া এসে তার গোপন অঙ্গ স্পর্শ করে হিম-উষ্ণ মদিরতায়। নাম কুক্ষির মাটি খামচে নেয় মুঠো করে, মিতিনের বুকে মাখাতে মাখাতে মিনুর শরীরকে চরম উত্তেজনার স্তরে তুলে দেয়। নদীর কুক্ষি শীৎকারে, সম্ভোগে ব্যাপৃত-বিহ্বল। ওদিকে ঝোড়া খুপড়ি নিয়ে এতক্ষণে মদন পাল গাভলায় নেমে এসেছে। তার আগে চার-বাবলাতলায় উবু হয়ে বসে পেচ্ছাব করতে করতে দেখেছে বাবলার গায়ে সাইকেল হেলান দেওয়া। সিট নেই।

এ কার সাইকেল সে সহজেই বুঝতে পেরেছে। গাভলায় নেমে দেখে, মিতে নেই। গুহার ভিতরে কোপ মেরে খুঁটে আঁচড়ে আরও ঢুকে যায় মদন পাল। তখন নির্জন রাত তাকে উৎকর্ণ করে তোলে। ভোগীদের কাম-বিমোহিত যন্ত্রণা ও সুখ ; তাড়না ও ঘাত ; ক্ষুধার হাহাকার ও নিবৃত্তির বোজাম্বর ; প্রতিটি পল আরও পাগল করে দেয় মদন পালকে।

নদীর বুকে জোনাকিরা ওড়ে। মন্থর স্রোত ছুঁয়ে কত দূর তাদের নীহারিকা। সেই দিকে চোখ নেই দানোর। এবার চুঁট ধসে আসে ধীরে, হঠাৎ প্রবৃত্তি চমকায় পালের, দু'হাত দিয়ে রুখতে চায় বৃহৎ চাঙড়টিকে। ভীমবৎ ঠাণ্ডা এবং হিংস্র মাটি মদন পালের বুকে চেপে বসে যায়। তার আগে চিৎকার করে দানো মদন— মিতে ! ও মিতে !

সেই ডাকে মৃন্ময়ী কুঁকড়ে গেলেও নাম তাকে তখনই ছেড়ে দেয় না। তখনও কাম এক স্বার্থপর সজাগ নিষ্করুণ অস্তিত্ব। তা অগ্নিবৎ অন্ধ, নারীকে তখনও আঘাত করতে চায়। কামের ক্ষুধা শেষ গ্রাস নেবে, যেমন করে নদী মাটিকে না নিয়ে ছাড়ে না।

আবার ডেকে ওঠে দানো— মিনু ! আমারে বাঁচা মিনু !

এই জীবনাসক্তির শেষ ব্যাকুলতা নামের দেহে সংবিত ফিরিয়ে দেয়, যৌনগ্রাসের শেষ আঘাত উদ্যত হয়েও শুকিয়ে যায়। শরীরে উঠে আসে বশ্যতাহীন পাপ। ঘর্মাক্ত, পরিশ্রান্ত নর পড়ে থাকে লজ্জায় এবং ভয়ে। পড়ে থাকে খাঁড়ির খোদলের রেত-মসৃণতায়। মিনু ছুটে আসে, নারী ছুটে আসে পুরুষের কাছে, যে এখনও বেঁচে।

মিনু ডাকে— আসুন মিতে ! আমার স্বামীকে বাঁচান !

নাম মদন চুঁটের উপর এসে দাঁড়িয়েছে। এখনও সে ইতস্তত

করছে। ঠিক পাচ্ছে না কী করবে।

শূন্যে বুকের কাছে স্বামীর মাথাটা তুলে ধরে আছে মিনু। স্বামীর ধড় মেটেলের খোদলে আর বুকে ভীমবৎ মাটির চাঙড়। নেমে এল নাম মদন। খুপড়ি চালিয়ে মিতের বুকের মাটি আলগা করে চাপ চাপ নামিয়ে ঝরিয়ে ফেলতে লাগল পাগলের মতো। তারপর দানোকে টেনে বার করল সে। দানোর মুখে কী করে দানোরই জামা উড়ে এসে মুখটাকে ঢেকে ফেলেছিল।

সেই আড়াল থেকে কথা ভেসে এল— জীবনটা কত লোভের জিনিস মিনু! বড়ো বাবা। কী বলল বড়ো বাবা! মিনু? মৃন্ময়ী! অপঘাতে গেলাম বউ। মিতের জমিই আমাকে মারল। তুই এখন কী করবি পালের বউ?

স্বামীর বুকের বাতার দিকে চেয়েছিল মৃন্ময়ী। স্বামীর মুখের উপর পড়ে থাকা জামা সরাল। কথা থেমে গেছে। স্বামীর কষে জিভ ঝুলে পড়েছে।

— মিতে! মিতে। বলে চাপা আর্তনাদ করল নাম মদন। কিন্তু কোনও উত্তর পেল না। মুহূর্তে নাম কী যেন মনে করতে চাইল। তার মিতে এখন মিতিনের বুকে মরে পড়ে আছে। এখান থেকে এখনই তাকে পালাতে হবে। তার আগে সিটটা কোথায় দেখে নিতে হবে।

মাটির তলে চাপা পড়ে গিয়েছে নাম মদনের বাইকের সিট। সে প্রায় হামা টেনে দু'হাতে মাটি সরিয়ে যক্ষের মাটিচাপা ধনের মতন সিট খুঁজতে থাকে। স্বামীকে কোলে নিয়ে অদ্ভুত এই দৃশ্য হতবাক হয়ে চেয়ে দেখতে থাকল মৃন্ময়ী। দেখতে দেখতে ফেটে কেঁদে উঠতে গিয়েও পারল না।

সিট পেল না নাম মদন। তার আগেই পালাতে শুরু করল বাবলার হেলানে রাখা সিটবিহীন সাইকেল তুলে নিয়ে।

দানো মদনের মুখে নুড়ো জ্বেলে কোনও প্রকারে পালেরা ভাসিয়ে দিল নদীতে। নদীতে বর্ষা এল তারপর। নদী ডাক ছেড়ে বন্যার সংকেত দিল। এক তীব্র ক্রোধ ফুলে ফুলে উঠতে থাকল নদীর বুকে।

পরেশ এসে দিদিকে বোলজিৎপুর ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাইলেও মিনু যেতে চাইল না। বলল— পরে যাব ভাই। আগে চেষ্টা করে দেখি, পালের চাক চাকনড়িতে আমার হাতে ঘোরে কিনা। এত মেটেল তুলে রেখে গেল পাল, তার কী হবে!

দিদির এই যুক্তিটা আশ্চর্য ঠেকলেও পরেশ চুপ করে রইল। কারণ সে জানত দিদির মনটাই এমন, নদীতে ভেসে যেতে যেতে কালো দু'টি

জলডোবা মোষ দেখে বোলতলার ঘাটে থেকে যায় এবং মোষ তাড়িয়ে উঠে পড়ে ডাঙায় !

পরেশ একাই ফিরল বোলজিৎপুর। যাওয়ার সময় কিছু অর্থ দিদির হাতে গুঁজে দিয়ে গেল।

বর্ষা নামার অনেক আগেই দাদার মৃত্যুর দুঃসংবাদ পেয়ে শিমুল তার বরকে সঙ্গে করে মাঠপাড়ায় আসে। বিধবা বউদিকে একা ফেলে কুঞ্চি কোথাও নড়ল না। রতন কিছু রাত মাঠপাড়ায় কাটায়, কিছু রাত মায়ের কাছে গিয়ে থাকে। বর্ষায় নাদার ভেলা ভাসে। তাই নিয়ে ভেসে ভেসে আসে রতন, ভেসে ভেসে যায়।

নদী গোঙাচ্ছে। সৃষ্টির আদিম গর্জন তার গলায়। নদীর তরঙ্গ জিহ্বাবিশিষ্ট। নদী সহস্র সহস্র মোষের মতো গোঁয়ার। পাড়ে গুঁতো মেরে শিং ভেঙে রক্তাক্ত হলেও সে নদীর কুক্ষিকে ছাড়ে না। নদী তারপর এ বছর গাভলার বাঁধ ভেঙে দিল। নাম মদনের জমির চেরাপথে আবার এল নদী। জিভ দিয়ে ছুঁয়ে ফেলল পালপাড়ার উচ্চ পথটা। পথ পেরিয়ে ঢুকল মানুষের উঠোনে উঠোনে। যে স্থানটিকে নদী গত বছর অমন করে খেয়ে গেছে, সেই স্থানে তার কেন্দ্রীভূত ক্রোধ এসে পড়ল। নদী নিয়ম মানে না, জীবন মানে না, বসতি মানে না, শিল্প মানে না।

মদন পালের চাককে ডুবিয়ে দিল ভৈরব। জিভ বাড়িয়ে মৃন্ময়ীর চোখের সামনে থেকে পিটনিখানা টেনে নিল। গোটা টেনে নিল। আথাল ভাসিয়ে নিয়ে আনন্দে নাচতে নাচতে বইতে থাকল। চাকের সামান্য উপরে, তা-ও এক কোমর উচ্চতার তাকে রাখা শিবকে গর্ভে ভরে নিল নদী। সবই দেখল মৃন্ময়ী। দৃষ্টিতে প্রতিভাত হল, শিল্পও কিছু নয়, কর্ম কিছু নয়, প্রাণ কিছু নয় ; জীবন তা হলে কী ?

মদন পাল হেঁটে গিয়ে মরেছে। কেন মরেছে এভাবে ? না, জীবনকে এত করে আর ভাবতে পারল না মৃন্ময়ী। সম্মুখে এক অপার বিস্ময় রচনা করল নদী।

ঢেউয়ের তাড়ায়, অন্তর্নিহিত তোলপাড়ে চোখের সামনে ভেসে উঠল নামের সিটটা ; ভিজে ক্ষয়ে ফুলো ফুলো, কুকুরের দাঁতে বিক্ষত কাটা একটা প্রাণীর মতো। যেন একটা মহা-প্রাচীন কাছিম চোখের সামনে ভেসে উঠেছে। হাত বাড়িয়ে খপ করে ধরে ফেলল মৃন্ময়ী।

মিনু পাল কুঞ্চিকে বলল— নাদা ভাসাও শিমুল। আমরা যাব।

— কোথায় ? কত বলছি, আর আগলে থেকো না বউদি ! সব মাটিই ধুয়ে গেছে। আথাল, পিটনি, গোটা— সব গেল তোমার !

— আমার একবার মিতেকে দেখা করতে ইচ্ছে করছে কুঞ্চি।

— চলো।

জোড়া নাদার ভেলায় করে সরণি তাক করে কুঞ্চি আর মিনু রাত্রিতে ভেসে পড়ল জলে। লগি ঠেলে ঠেলে বন্যা-জড়িত গাঁয়ের তন্তুবায়ের উঠোনে আসতে পাঁচ ঘণ্টা যুদ্ধ করতে হল তাদের। পাটের ভুঁইতে এসে সেই ভেলা আর ঠেলতে পারে না ওরা। ওরা থেমে পড়ে বিশ্রাম নেয়। রাত্রির জলে দূরের নদীর শোঁ শোঁ আর কিসের একটা টকটক শব্দ।

তারপরই সেই পাখির ডাকটা— হুদো, হুদো, হুদো!

— আর যেতে ইচ্ছে করছে না কুঞ্চি! জলে ঝাঁপ দিতে ইচ্ছে করছে!

— ছিঃ! ও কথা বলে না বউদি! এই বন্যায় সাপ আর পাখি একসঙ্গে থাকে।

— আমি তো আমার শত্রুকেই দেখতে যাচ্ছি রে! শত্রুর জন্যে এই সিটটা কেন বয়ে নিয়ে যাচ্ছি বল তো!

— এখন আর শত্রুমিত্র আলাদা ক'রো না বউদি। কী করে বাঁচবে, তাই ভাবো!

বানে জাগা জ্যোৎস্নায় মিনু পাল আপন মনে হেসে ফেলল। আবার ওরা ভেলা ঠেলতে লাগল।

সূর্যের আভা ফুটছে, আভাও ঠিক স্পষ্ট নয়, পুব দিগন্ত এখন ফর্সা দেখাচ্ছে। নামের উঠোনে পৌঁছে দেখে দাওয়ার এক বিঘত নীচেয় জল। ওই জলের গালে যেন মুখ রেখে ঘুমিয়ে আছে নাম। দেখে পরিশ্রান্ত মিনুর ওই বিছানায় মিতের পাশে শুয়ে পড়ার লোভ হল। মুখটা ঝুঁকিয়ে দিয়ে নরম করে ডাকল— নাম মিতে!

আবার মৃদুসুরে মদন দেবনাথকে ডাকল মিনু পাল। ঘুম তখনও ভাঙল না মদনের। এবার গলা খানিকটা উচ্চে তুলে ডেকে উঠল মৃন্ময়ী। একবার ভাবল হাত বাড়িয়ে মিতেকে ছোঁবে। জোড়া নাদার ভেলা মাটির দাওয়ার গায়ে ঠেকেছে। কুঞ্চি লগি মেরে ঠেলে ধরে রয়েছে ভেলাকে।

উঠোনের জলে স্রোতও রয়েছে, গড়ানে নেমে পাশের গুমানি নদীতে পড়ছে। গুমানি ভৈরবের আত্মজা, ক্ষুদ্রতর নদী ; দুই নদী মিলে ঘিরে রয়েছে গ্রামগুলিকে। গুমানিতে বয়ে যাওয়া স্রোতের শব্দে মদনের ঘুম এই প্রত্যুষে এখনও নিবিড়। কিন্তু ভেলা থেকে হাত বাড়িয়ে মিনু বুঝল মিতের গায়ে তার হাত পৌঁছবে না। সে তবু দেখল, পাপীর মুখখানি

রোগা হলেও কী স্নিগ্ধ !

এই লোকের বাসনা তার স্বামীকে মেরেছে, তেমনি মৃন্ময়ীর যৌনশাপে মরেছে মদন পাল। তবু কেন এখানে এল মিনু পাল ? ওই মুখখানিকে এত সুন্দর দেখাচ্ছে কেন ! হৃদয় কি কঠিন বস্তু ভেবে পেল না মৃন্ময়ী।

আরও উচ্চে তুলল গলা এবং মৃন্ময়ী গলার মধ্যে তৃষ্ণা অনুভব করল। এবার নামের দেহ নড়ে উঠল। আবার ডাকল মিনু পাল। তার হৃদয় কিসের ভারে ছিঁড়ে পড়তে চাইছিল।

শুয়ে থেকেই চোখ মেলল নাম। প্রথমে ভেলা, তারপর নারীমূর্তি। নামের চোখ মৃন্ময়ীর বিধবা, দুঃখী এবং কামনামধুর চোখে এসে থামতেই, বিছানায় ধড়মড়িয়ে উঠে বসল মদন। সে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিল না। স্বপ্নবৎ ওই নারীযুগল একী অসম্ভব দৃশ্যে স্থির !

মদন ভাবল, ধর্মই যেন মিতিনকে পাঠিয়েছে তার কাছে। এটাই সত্য যে, এই বিধবা মৃন্ময়ী আজ আর তার জীবনে দুর্লভ নয়। মনে মনে ভাবল, তুমি আসতে বাধ্য মৃন্ময়ী ! এসো !

দু'হাত সম্মুখে বাড়িয়ে দিল নাম মদন। দু'খানা বাড়ানো হাতের দিকে নীরবে চেয়ে দেখল মিনু পাল।

— আসুন মিতিন ! ভাবতে পারছি না, এভাবে আসবেন !

— আমার সব ভেসে গেছে, সব। জল থইথই করছে উঠোনে। গোটা, পিটনি, আথাল, চাক, শিব সব ভৈরবের গরাসে দিলাম মিতে। সব নিয়ে গেল বানের নদী। শুধু এই সিটখানা উগলে দিলে। আপনার বসার আসন আপনাকেই ফেরত দিতে এসেছি। আমি এ দিয়ে কী করব ! নিন। বলে ভেজা সিটটা থপ করে তাঁতের ওদিকে ছুড়ে দিল মৃন্ময়ী।

— আপনি আসবেন না ?

— না।

— তবে হাত বাড়ালেন কেন ওভাবে ! কেন এলেন ?

— ওই যে সিটটা... ওইতে বসে আপনি কত কিছু করেছেন !

— ধর্ম বলেছে মিতিন, ধর্মের সম্বন্ধ আমাদের।

— ধর্ম বললেও এ আর হয় না মিতে।

— আমি বিয়ে করতে পারি। আজও আমি অবিবাহিত। এইই যে শর্ত ছিল...

— হয় না।

— কেন ?

— সব গেছে আমার। আর কেন আমাকে চাইছেন।

— আপনি এতই আক্রা মিতিন!

— সংসার আমাকে আক্রা করেছে। দাম নেই কানাকড়ি। তবু তুমি আমাকে চাইতে পার না নাম। চল কুঞ্চি। লগি মার! সংসার জেগে যাবে। তার আগেই পালাই।

জোড়া নাদার ভেলা নামের সম্মুখ দিয়ে ভেসে চলে গেল। নদীতে এসে পড়ল ভেলা। নদীতে এই রাতের শেষে মরার টান। জল নামছে।

হতভম্বের মতো থ হয়ে বসে রইল নাম মদন। কাকে ডাকবে বুঝে পেল না। কী করবে তা-ও তার জানা নেই। সহসা তার চোখ গেল ভেজা সিটটার দিকে। ওটা এক বৃদ্ধ কাছিম। মহাপ্রাচীন একটি জীব। পাপ সর্বদা কূর্মবৎ শক্ত খোলবিশিষ্ট । ওটা এই মুহূর্তে প্রাণ পেতে চাইছে।

— কে তুই! বলে শিউরে উঠল নাম মদন।

নড়ে উঠল কাছিম। লম্বা নলিটা বার হয়ে এল। সেই নলিতে ধারালো দাঁত গজাল।

— কে তুই? কী চাস?

কাছিম এবার মদনের দিকে একটু একটু এগিয়ে আসতে চাইছে। ভয়ে সিঁটিয়ে যায় নাম।

— মিতিন মিথ্যুক। পাপের ভার কেউ নেয় না। ধর্মই সত্য।

আরও এগিয়ে আসে কাছিমটা। জমি যায়, মাটি যায়, আথাল, গোটা, পিটনি সব যায়। রাঙার সম্বন্ধ শেষ হয়ে গেলেও ভূতগ্রস্ত কূর্মপাপ থেকে যায় কেন?

ভয়ে অভিভূত আর্তস্বর করে ওঠে নাম। বোবা যেন কাঁদতে চাইছে। তার চোখ দু'টো ভয়ে ঠেলে বেরিয়ে যেতে চাইছে। হাত পা অসম্ভব কাঁপছে। আঁ-আঁ করে ভয়ে কাছিমের দিক থেকে চোখ টেনে নিতে চেয়েও পারছে না মদন তন্তুবায়।

— সংসার তো জানে না কিছু। তুমি আর আমি ছাড়া কেউ জানে না। সংসারের দোহায় দিলে কেন?

কূর্ম বলল— দানোর মৃত্যুকে জানে না সংসার। কিন্তু তোমাদের সব সম্বন্ধ জানে। আমি কূর্ম, আমিই আসক্তি, আমিই ধর্ম তোমার। আমি বিঘ্ন, আমিই অভিশাপ। আমি চলমান। আমি তোমাকে অনুসরণ করি। আমাকে তুমি কুড়িয়ে তুলে আনো। নদীও আমাকে নেয় না। এ যে পাপের আসন, তাই তো অমন করে মিতিন ফেরত দিয়ে গেল!

— আমাকে রেহায় দাও ! আমাকে বাঁচতে দাও ।

— হুদো পাখির দেশে রেহায় কিসের ! এ দেশে গর্ভের ছাগশিশু রেহায় পায় না । তুমি তো মানুষ, তুমি কেন পাবে ?

— ওই ভেলাটা কিসের কূর্ম ? কেন ভাসছে ?

— গাঙুড়ের জলে নয়, গুমানির জলে । কিন্তু হুদো পাখির দেশে লখিন্দর জাগে না হে !

কূর্ম গান গাইতে গাইতে বলল—

শোনো শোনো নাম মদন শোনো দিয়া মন ।

গুমানির জলে ভেলা ভাসে গো কখন !

— আমি জানি ! বলে চিৎকার করে নাম কূর্মকে তুলে জলে ফেলে দিয়ে অদ্ভুত হেসে উঠল । আশ্চর্য তখনও যে, বানের জল সম্পূর্ণ নেমে গেলে সেই কাছিম উঠোনের গা-লাগা জমিতে সিটের মতন কাদায় কামড়ে রইল । পিঠিলির ঝোপের মধ্যে । পাপ গেল না ।

॥ ৮ ॥

বোলজিৎপুরে চলে গেল মৃন্ময়ী । সেই বোলজিৎপুরেই নির্মলার বিয়ে স্থির হল । জীবনের শেষ চেষ্টা করছে মদন দেবনাথ । বুড়ো স্বর্ণকার মদন দেবনাথ সেই বিয়ে লাগিয়ে তুলেছে । স্বর্ণকার মদনকে লোকে মণিকার মদন বলে ডাকে । কারণ ওর হাতের কাজ খুব সূক্ষ্ম আর ললিত । লোকটা ধীরস্থির গোছের । অপ্রয়োজনে একটা কথাও খরচ করতে চায় না ।

সাবিত্রীকে মণিকার বলল—আমি ঘটক-ফটক নই সাবিত্রী । তবে আমি সেচা পুকুরে খাপলা ফেলি না । এ জন্মে আমি কম-সে-কম চার গণ্ডা মেয়ে পার করেছি । তুই নিশ্চিন্ত থাক, এ বিয়ে এবার হবে ।

—তুমি যখন তত্ত্ব করছ দাদা, নিশ্চয় !

—লক্ষ্মীটাকে বেচে দে । ভিটের ওই পাশটা আর নদী—সবই বেচতে হবে তোকে ।

—ভিটেও বেচব !

—আমাকে বন্ধক দিয়ে রাখ, পারলে পাঁচ সনে ছাড়িয়ে নিবি ।

—পাঁচ সনে পারব কেন ?

—মদনকে শুধপুছ করে ফাইনাল কর ।

নাম শুনে শুধু মাথা নাড়ল । মাথা নাড়তেই থাকল । না বলছে না, হ্যাঁ-ও বলছে না । আসলে সে কিছুদিন কিছুই বিশ্বাস করতে পারছে

না। একদিন অত্যন্ত ভোরে ঘুম থেকে জেগে উঠে বোকার মতো থম মেরে বসে থাকতে থাকতে বুঝতে পারল, ভিটের পাশজমি মণিকার চাইছে।

মাকে বলল—দিয়ে দাও মা।

সাবিত্রী বলল—তা দিচ্ছি। তুই তারা পালের কাছে ধর্না দে।

নাম তখন তারা পালের পাকা দালানের বৈঠকে প্রার্থীর মতো এসে দাঁড়াল। চেয়ে দেখল বাইরের বিশাল উঠোন গোয়াল পর্যন্ত প্রসারিত, সেই উঠোনের গা-লাগা মস্ত আমবাগান। বাগান অবধি সুবৃহৎ পাঁজা, লাল টকটকে টালি সাজানো। দু'দুটো কলে টালির কারখানা চালু রয়েছে। কী বিষম ব্যাপার! থাবা মেরে নদীর জমি কিনে নিচ্ছেন তারা পাল।

প্রথমে নাকের ফুটোয় নস্য ভরতে ভরতে চোখে জল এনে ফেলা তারা না-ছুঁই, না-ছুঁই করতে লাগলেন। ভুঁড়ি চুলকোলেন, অকারণ নিজেরই কানের লতি দু'আঙুলে রগড়ালেন। গায়ে ফেরতা দেওয়া ধুতি। বেঁটেখাটো লোক। মাস্টারমশাই। অত্যন্ত নম্র স্বভাব, মৃদুভাষী। দেখে শরীরে দয়ামায়া আছে বলে প্রত্যয় জন্মে। কিন্তু সব ব্যাপারে প্রায় নীরবভাবে সতর্ক থাকতে ভালবাসেন। তাই, অবশেষে নাম মদনের নদীর জমি অবিশ্বাস্য রকম কম দরে স্পর্শ করতে চাইলেন।

নাম রাজি হয়ে গেল। কারণ সে ভিটেও বেচবে। সবই যখন হয়ে উঠেছে, গম্ভীর গলায় মণিকার বলল—ডিড হবে বন্ধকের, বয়ান করবে নফর মহুরি। চিন্তা করিস না সাবিত্রী, সাত সনে কিস্তি দিবি, জমি তোর রইল। আর শোন, নাম যেন এ বিয়েতে একটুও নাক না গলায়।

—কেন দাদা?

—ওই ছেলের সাইত খারাপ। লাখ কথা খচ্চা করে বিয়ে হচ্ছে, ওর আর কথা বলার দরকার নেই।

—তাই হবে।

বিয়ের কথা শুনে একটু একটু সুস্থ হচ্ছিল নির্মলা। মাটির দেওয়ালে কাচপোঁতা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সাজতে পর্যন্ত আগ্রহ বোধ করছিল। সবই লক্ষ করছিল মদন তন্তুবায়।

কোনও এক মঙ্গলবার বোলজিৎপুরের বরপক্ষ কনে দেখতে এল। মণিকার দেবনাথের বাড়িতে বয়ে এসে কনে দেখা আলো পড়ল পশ্চিমাকাশ থেকে কাঠের চেয়ারে ঘোমটা টেনে বসা কনে নির্মলার সাজানো মুখে। আকাশে তখন রক্তপাত হচ্ছিল, এই মুখটুকুনই দেখতে পেল না নাম মদন। কারণ মণিকার তাকে কায়দা করে ওই আসরে

ঢুকতে দিল না।

—তুই বরং এই টাকাটা ভেলুরচকের সাহাজি পাড়ার নন্দুর হাতে দিয়ে আয় নাম। ওর সঙ্গে আমার পুরনো হিসেব-নিকেশ, সাইকেল মেরে যা, কত পাবে মনে পড়ছে না, খাতার হিসেব দেখে তবে দিবি। আগে খাতা দেখবি, তারপর। যদি দেখিস আমার কাছে পাওনা হচ্ছে না, তা হলে দিবি না। বোলজিৎপুরের লোক যা আসবে, আমিই সামলাব। চলে যা। তোর আর না থাকাই ভাল, বোনের জন্য অনেক করেই দেখেছিস তুই। পারিসনি। তাই না ?

—আজ্ঞে !

মণিকারের কথা শুনে আজ্ঞে বলার পর নাম মদনের মুখটা নীরব হাসিতে একটুখানি বেঁকে গেল, বুকের যন্ত্রণা গলায় দলার মতো উঠে এসে আটকে গেল।

নাম মদন আজকে ছোট নিমাইকে পর্যন্ত ডেকেছিল, একসঙ্গে বরপক্ষের সঙ্গে কথা বলবে বলে। হল না।

নামের মাথাটাও আর আগের মতন কাজ করে না। তার শুধু ঘন ঘন কামেচ্ছা জাগে, তবু সে আশ্চর্য স্মৃতিহীন হয়ে গেছে, মৃন্ময়ীর শরীরটাকে মনে করতে গিয়ে স্বপ্নের মধ্যে ভয়ংকর কষ্ট পায়। হঠাৎ কোনও রাতে স্বপ্নে মৃন্ময়ীর দেহ সংগ্রহ করতে পারলে শুধু মিতিনের বুকে মাটির প্রলেপ দিতে দিতে স্বপ্ন ভেঙে যায়। তখন সে জেগে বসে শস্তা কামশাস্ত্র পাঠ করে কুপির আলোয়। তাতে যেসব নগ্ন নারীরা আছে, তাদের কাউকে সে ব্যবহার করে। দামি নগ্ন ছবি গঞ্জে মেলে না, শহর থেকে আনিয়ে নেওয়ার উৎসাহ, পয়সা, কৌশল তার নেই।

রোজই রাতে সে গঞ্জে যায় কফি হাউসে। কফি হাউস হল তাঁবু। কফি পাওয়া যায় না। নীল সিনেমা পাওয়া যায়। গ্রামের লোকেরাও নোংরা জিনিসের ফুটুনিদার নাম রাখতে জানে। ওই কফি হাউসে মাঝে মাঝে পুলিশ হানা দিয়ে তাঁবুর মালিকের কাছে ঘুস খেয়ে যায়।

নামকে কেউ কেউ বলেছে, চকের ওদিকে নাকি গভীর রাতে নীল সিনেমায় দু'একবার পশুর সঙ্গে মানুষের যৌনদৃশ্য দেখানো হয়েছে। ওই দৃশ্য যারা দেখছিল তাদের নাকি পুলিশ মেরেছে। শোনা কথা, যাচাই করা হয়নি। যে ছেলেটা এই খবর নামকে দিচ্ছিল, তাকে নাম শুধিয়েছিল—আচ্ছা বকাই, পশু মানে মাদী ঘোড়াও হতে পারে তো ?

বকাই বলেছে—তা-ও আছে !

নাম বলেছে—তা হলে থাক বকাই। আমি সহ্য করতে পারব না।

—তুমি দাদা, সতী হলে নাকি ? সহ্যটহ্য কী। দেখব, ফুর্তি মারব,

ব্যাস!

—তুই যা। আমার মেয়েমানুষই স্বর্গ রে!

—উরি ব্বাস, তোমার কি গেট-ডায়ালগ মাইরি। পালায় লাগালে লোকে খাবে।

—তুই গিয়ে সুরেন পাণ্ডের পঞ্চরসে লাগিয়ে দিয়ে আয়, শালা।

—তুমি রাগ করলে নাকি?

সত্যিই সেদিন রেগে গেল নাম মদন। হঠাৎ তাঁতের গর্ত থেকে উঠে বকাইকে প্রথমে একটা চড় মারল। চড় মেরেও শান্তি হল না। উঠোনে পেড়ে ফেলে বকাইয়ের বুকে চেপে বসে চড়াতে থাকল নাম। মার খেয়ে বকাই খুব ভয় পেল এবং আশ্চর্য হয়ে গেল। কোনও কথা না বলে চলে গেল তখনকার মতন।

দুপুরের দিকে হাটে যাচ্ছিল বকাই। যাওয়ার পথে নাম মদনের উঠোনে এসে দাঁড়াল। তারপর সুন্দর একটি ফোটা গোলাপ ছুঁড়ে দিল নামের দিকে। সেই ফুল মটকার আলোর উপর এসে পড়ল। ফুল ছুঁড়ে দিয়ে দ্রুত পথে নেমে চলে গেল বকাই।

নাম মদনের বিস্ময়ের শেষ রইল না। গোলাপের ঘ্রাণ নিতে নিতে নামের অকারণ বড়ই কান্না পেতে লাগল। সাহিত্যের পাঠক মদন আজকাল শুধু কামশাস্ত্র পড়ে, তবু তার কান্না পাচ্ছে হে! বলে নিজেকেই কেমন চিনতে পারল না তন্তুবায়।

তা হলে মদনের মাথাটাও আর আগের মতো কাজ করছে না। তাকে যেতে হবে ভেলুরচক। নন্দু টাকা পাবে মণিকারের কাছে, খাতা দেখে তবে বোঝা যাবে, আদৌ পাওনা কত, হতে পারে কিছুই পাওনা নেই। নেইই যখন, তা হলে মাত্র একশো কুড়ি টাকা ভাঁজ করে ঘড়ি-পকেটে ভরে নিয়ে বাইক হাঁকিয়ে ওই অত মাইল পথ যাচ্ছে কেন নাম? আর আজই কেন যেতে হবে? গিয়ে যদি দেখা যায় নন্দুর খাতায় চার আনা মাত্র জের পড়ে আছে, তা হলে?

কথাটি মণিকারের সামনে তুলতে পারল না নাম মদন। মণিকারের আজ্ঞা তাকে পালন করতে হবে মুখ বুজে। মাথাটা আর আগের মতো কাজ করছে না, ফলে এই কাজ এড়ানোর কোনও কৌশল বার করতে পারল না সে। মদন তো আর মুখবুকঅলা মানুষ নয়, তার মুখ থেকেও নেই, বুক থেকেও নেই, মাথা হেঁট করে মণিকারের টাকা গুনে ঘড়ি-পকেটে ঢোকাল।

এই অবস্থায় ছেলেকে দেখে সাবিত্রীর চোখ ছলছল করে উঠল মাত্র, সে চুপ করে মাথার ঘোমটা টেনে অন্য দিকে সরে গেল। চোখের সেই

জল লক্ষ করল নাম। বোনটাও দাঁড়িয়ে ছিল সামান্য তফাতে বাঁশের একটি খুঁটি ধরে। দাদার চোখ তার উপর গিয়ে পড়তেই, সে-ও খুঁটি ছেড়ে সরে গেল।

সাইকেলের কাছিম-সিটটা বর্ষা-প্লাবনে খেয়েও শেষ হয়নি। এর গায়ে লাগা কাদা জলে ধুয়ে রোদে শুকিয়ে নেওয়া হয়েছে, মিতিন এই সিট মদনকে দিয়ে গেছে, নদী একে নেয়নি। নদী সব নিয়ে গেল, ধুয়ে মুছে নিল, মেটেল-এঁটেলের দ্বন্দ্বও ফুরাল মদনের জীবনে, মিতিনও রইল না, দানো চলে গেল পায়ে হেঁটে মৃত্যুর কাছে, ঝুনোট মাটির ক্ষুধায় শেষ হল সব, শেষ হল প্লাবনের নদীতে। তবু নদী বইতে থাকল। আস্ত একটি বছর ঘুরে গিয়ে আরও সময় চলে গেল চৈত্র-জোনাকির মহানীহারিকায়।

নদীর কাঁধালে সাইকেল ধেয়ে এসে গাভনা মাটির দহে চেয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল নাম। এই জমি তারা পালের। এখানেই মরেছে মিতে। কোনও চিহ্ন নেই মৃত্যুর। কী হাস্যকর এই জীবন! কোনও কিছুই আর মদনের নয়, কেমন সব হাওয়া-বাজির মতন আর সবই ছায়াচার। তা হলে কিসে কী, কী দিয়ে কী হয়!

গত রাতে এক আশ্চর্য হাওয়া আর জ্যোৎস্না ছিল ঢলানো উঠোনে। দুটি কেউটের বাচ্চা কী চমৎকার খেলা করছিল জড়িয়ে নেচে, ক্ষুদ্র ফণা তুলে, গা তাদের চকচক করছিল, কালো শরীরে জ্যোৎস্নার চিকনো উল্লাস ভাবা যায় না! ওই দেখে দেখে সারা রাত জেগে থাকতে পারত নাম। কিন্তু বাধ সাধল বিকট পেঁচার বাচ্চাটা, ছোঁ মারার তালে কাঁঠাল গাছে বসে চেঁচাতে থাকল, তাই শুনে ভেঁদো কুকুরটা, ধর্মের কুকুর ঢুকে এল উঠোনে। খেলা ভেঙে গেল।

ওই রকম কেউটেতেই কেটেছিল বাবাকে তাঁতের গর্তে, অবশ্য সেই কেউটে অনেক সেয়ানা ছিল। সেই কেউটেও কি শিশুকালে জ্যোৎস্নায় খেলা করেছে! সেই রকমই ওই চুঁটের তলে মসৃণ পলিতে মিতিনের সঙ্গে খেলা করেছে নাম। কোনও চিহ্ন নেই।

এই নদীতে ভেসে এসেছিল প্রফুল্ল হালদারের নৌকা। লাল কোর বেচা পয়সা কাপড়ের মুঠোয় বাজিয়ে বাজিয়ে কাঁদছিল মদন পাল। অর্থহীন অর্থকে বাজিয়ে ফেরাই কি জীবন? নামই কি সেই অভিশাপ, মানুষ নয়? সেইই কি হুদো পাখির ছদ্মবেশে ডেকে চলেছে নদীর কিনারে কিনারে? মিতিনের ভেলা ভেসে চলে গেছে এই নদীতেই। দানো মদন কি লখিন্দরের মতো ফিরে আসতে পারে না এই নদীর পথ ধরে? কেমন হত যদি জীবনটা অমনই হত এই দেশে? হয় না কেন?

নাম মদন এখন কোথায় যাচ্ছে ? কেন ? ঘড়ি-পকেটে তার মাত্র একশো কুড়ি টাকা। নন্দুর পাওনা কিনা তা-ও তার জানা নেই। নন্দু সুদি মহাজন। ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থা চালু হওয়ার পরও নন্দুরা থাকে এই দেশে। উড়ো জাহাজ চলে আকাশে, গরুর গাড়ি চলে রাস্তায়। এদেশে সবই দিব্যি থেকে যায়। আকাশে শনিগ্রহ, মাটিতে শনির থান। স্টিলের হাঁড়ি, অকলঙ্ক ইস্পাতের হাঁড়ি, অ্যালুমিনিয়াম পাত্রাদি, সবই। এবং মাটির পাত্র।

দানো মদন গুমরে উঠল—আমাকে বাঁচা মিনু ! মিতে, ও মিতে ! এই ডাক পষ্ট শুনতে পেল নাম মদন। সাইকেল ছুটিয়ে দিল। যেতে যেতে সূর্য ঢলে গেল পশ্চিমে।

নন্দু খাতা খুলে দেখাল, গত বারের জের মাত্র আড়াই টাকা। তারপর আর কোনও লেনদেন নেই। আড়াই টাকাই কেটে নিল নন্দু। তখন মদনের মনে হল, সবই সে জানত। জানত মনে করলেও, আসলে সে কিছুই জানত না। অবশ্য তার হাসি পেয়ে গেল, এই দেশে একটি যুবকের কিভাবে সময় খরচ হয় ? কতভাবে সে কাছিমের পিঠে চড়ে ঘুরে বেড়াল ভারতভূমে। কাছিমের চোখে সময় বয় না, এতই মন্থর লাগে।

আর কী করার আছে জীবনে ? ধর্ম বাবার সঙ্গে কী কথা অবশিষ্ট আছে নামের ? ধর্ম কি আদৌ বেঁচে আছে ?

সূর্য পাটে বসল। নির্মলার মুখ-দেখানি আলো লেগেছে পশ্চিম আকাশে। হায় ভগবান। বিয়েটা যেন ভাল ভালয় হয়ে যায়। মাড় খেয়ে ফেলা বোনটার যেন শাপমুক্ত জীবন হয় হে ঠাকুর !

সাইকেল ছোটাচ্ছে মদন। পাকা সড়কে সূর্যাস্ত হচ্ছে। সহসা তার মনে হল, জীবনটাই তাকে আর চাইছে না, সংসার তাকে চাইছে না, মা সাবিত্রী তাকে চাইছে না, বোন নির্মলা তাকে চাইছে না।

যখন কেউই চায় না আর, তখন মানুষকে আড়াই টাকার জের টানতে হয় এবং শোধ দিতে হয়। একথা ভেবেও যদি কান্না না পায়, বুঝতে হবে, মাথাটা গেছে। কই কাঁদতে তো পারছে না মদন তন্তুকার !

তারপর একদিন নাম মদন বড়ো বাবার বৈঠকের সামনে এল। দেখল লোকটা নেই, কেউ রাস্তায় লাঠি বাড়িয়ে পথ রুখছে না। মদনের বুকের ভেতরটা ছ্যাঁৎ করে উঠল।

বাড়ির ভিতর থেকে একজন বার হয়ে এসে বলল, বড়ো বাবা মাঠে গেছে। নাতির সঙ্গে গাই চরাচ্ছে।

বুকের ভেতরটা মদনের কেমন আনন্দে মেতে উঠল। সে সাইকেল নিয়েই প্রান্তরে এসে ঢুকল। একটি প্রকাণ্ড আমগাছের তলায় পড়ে

রয়েছে বড়ো বাবা। মুখ হাঁ। গাছের শিকড়ে ফোতা ভাঁজ করে ফেলে মাথা রেখে শুয়ে নাক ডাকাচ্ছে। ওদিকে নাতিটা গাইয়ের নথ-গলতানি ধরে ঘাস খাইয়ে ফিরছে আলে আলে।

মদন ডাকল— বাবা। বড়ো বাবা।

—আঁ-আঁ-আঁ-হ্। বলে নাক সিঁটকে চেতন পেল ধর্মনারায়ণ। বোবায় ধরা গলায় প্রশ্ন করল— কে ?

— নাম মদন।

— বেঁচে আছ ?

— আজ্ঞে।

— ওহে, দানো তো গেল। দুর্ঘটে চলে গেল বটে। ইবার কী ?

— বলুন।

— কিসের যেন বাজনা যাচ্ছে ?

— আজ্ঞে হ্যাঁ।

— কিসের ?

— বিয়ের।

— ওহো, কাছারিপাড়া থেকে আসে কি ?

— হ্যাঁ।

— মিছরিদানার বিয়ে কি ?

— মিছরিদানা ?

— হ্যাঁ, হে। বিড়ি-বাঁধনি মিছরি। মাখনের মেয়ে। কই ঠেকানো কি গেল ? তোমরা বিয়ে ভেঙে দিয়েছিলে মদন। দাওনি ?

— দিয়েছিলাম আজ্ঞে।

— হাতে তোমার আড়বাঁশি ছিল ?

চুপ করে রইল নাম মদন।

— কই হে।

— আজ্ঞে, বলুন।

— ছিল কিনা ?

— ছিল। আমি নাম মদন বাবাজি।

— আর চালাকি ক'রো না ; মদন তুমি যেই হও, মদন হলেই হল।

— হ্যাঁ, ধর্মবাবা।

— যাও, ছইগাড়িতে মোহড়ায় মাইক বাঁধা বুঝি।

— হ্যাঁ, গাড়োয়ান যেথা বসেছে, তার সামনে।

— যাও, কী গান বাজে কান পেতে শোনো। কী গান।

— 'মধুর মধুর বংশী বাজে কদমতলিতে।'

— কানাইয়ের গান, রাধির গান। মিছরির বিয়ের গান। কই ঠেকাতে পারলে ?

— পারলাম না ঠাকুর।

— কষ্ট হচ্ছে নাকি হে ? পীড়া হচ্ছে বুকে ?

নাম মদন চুপ করে থাকে।

— আমি কী করব বড়ো বাবা ?

— গান শুনতে শুনতে যাও।

— কোথায় যাব ?

— বোলজিৎপুর যাচ্ছে বিয়ের গাড়ি। চলে যাও ছইয়ের ফাঁকে কনের মুখ দেখতে দেখতে।

— আশ্চর্য প্রস্তাব।

— ধর্মের প্রস্তাব বাবা, বিস্ময়ের কী আছে।

মাঠ থেকে বেরিয়ে মদন সাইকেলের পিছনের টায়ারে আঙুল দিয়ে টিপে দেখে বাতাস পড়ে গেছে। নিশ্চয়ই আলপথে বাবলার কাঁটা ফুটেছে। তা হলে আর যাবে কী করে সে ?

মিছরির চন্দনলিপ্ত মুখখানা একবার দেখতে বড়ই সাধ হচ্ছিল মদনের। সাইকেল যাবে না, তাতে কী ? পরী চলেছে মাইকলাগানো গাড়ির পিছু পিছু মাথা নেড়ে নেড়ে। আরও পাগল হয়ে উঠেছে ঘোটকী পরী। জনার্দন খেতে দেয় না। মাঠে মাঠে, পরের নাদায় নাদায় খেয়ে বেড়ায়। বাচ্চারা ধরে পাকড়ে চড়ে। কেমন কঙ্কাল হয়ে উঠেছে ঘোড়াটা।

বাজনা শুনেই মেতেছে বেটি। বাচ্চারা ওর পিছু পিছু মজা করতে করতে ছুটছে। সাইকেল ফেলে দিল মদন। কেমন পাগলের মতো ছুটে গেল পরীর কাছে।

ছইয়ের পিছু পিছু হাঁটতে থাকল মদন দেবনাথ। যখন তাদের গ্রাম ছাড়িয়ে গেল গো-গাড়ি, মাঠপাড়াও ছাড়িয়ে গেল, সূর্য ডুবুডুবু হল বেলা, তখন বাচ্চারা আর পথে নেই। পরীকে একলা পেয়ে পিঠে চেপে পড়ল নাম। মাইক আর বাজছে না।

সাত-সাতটা মেয়ের বিয়ে ভেঙে দিয়েছিল মদন দেবনাথ। বিড়ি-বাঁধনি মিছরিই ছিল শেষ, যার বিয়ে হচ্ছিল না। তারও তা হলে বিয়ে হয়ে যেতে পারে। মিছরি এক পা খোঁড়া, লাঠি ধরে লেংচে হাঁটে নিতম্বে মোচড় দিয়ে। সেই মোচড়ানি দেখে মদনের যৌনক্রোধ হত।

এখন পরীর পিঠে চড়ে সেই মদনের ক্রোধ যেন সীমা হারাল মিছরির মুখ দেখে।

— কী লোক তুমি গো, পাগল নাকি ! মিছরি কথা বলে উঠল।

— কেন ?

— পরীর পিঠে কেডা চড়ে অমন করে ?

— আমি।

— রোগা মাল, বাচ্চারা চড়লেই তাগদ দেখায়, না হলে কী আছে ওতে ? মাথা ঘুরে পটকে পড়ে যায়। অমন করে চড়লে, মায়া হল না ?

— থাম মিছরিদানা, মায়া কিসের ! মাইক হাঁকিয়ে ঘর করতে যাচ্ছিস, কী সোয়াদের জীবনটা !

— তা হবে না ! লেংড়ি বলে কি পড়ে থাকব। বংশী আমার বিয়ে ভেঙে দিল, তাইতেই কি পচে মরলাম নাকি ! বলে বরেরই সামনে মদনের দিকে বুকের কাপড় ঠেলে সরিয়ে বিয়ের নুতন ব্লাউজে ঢাকা একটি স্তন প্রকটভাবে বার করে দিল !

— কে জানে বংশী না তুমি !

— কী ?

— বিয়ে ভেঙেছিলে !

— মুখ সামলে কথা বলবি মিছরি, আমি শিক্ষিত ছেলে ! অনার্স গ্র্যাজুয়েট !

— সে জানি। তোমাকে আমি ঠাট্টা করছি দাদা ! ঠাট্টাও বোঝো না ! তবে, নেকাপড়া জানা মরদেরও বায় থাকে ঢেরখানি। কী কপাল তোমার, বেধবা মিতিনও তোমাকে পুছল না ! কী দোষ করেছিলে ?

— কী বলছিস তুই ?

— এই যে বর দেখছ আমার, উনিই সেই মিনসে, এতদিনে ভুল ভাঙল ; বুঝল, আমি কেমন মেয়ে ! ভাঙা বিয়ে জুড়ে গেল দাদা ! আমার ইনি বলেন কি, আড় হাতে তুমিই নাকি গিয়েছিলে বোলতলার মাচানে ! আমি বলেছি, ছিঃ ! চোখের ভুল।

— আমি তোকে খুন করে ফেলব মিছরি ! বলে পরীর পিঠ থেকে ঝপ করে নেমে পড়ল নাম মদন। তার হৃদয়কে কে যেন করাত দিয়ে কাটছিল। তার শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসতে চাইছিল।

মিছরির মুখটা নির্মলার মতো দেখতে হলেও, বুক জোড়া প্রখর এবং উচ্চকিত। সব কেমন গুলিয়ে যেতে লাগল নাম মদনের। সে পরীর পিঠ থেকে নেমে পরীকে কিল ঘুসি মারতে লাগল।

সবচেয়ে নরম এই পশুটা। মদনের শেষ প্রতাপ এই পশুটারই উপর। একে খুন করলে কী হয় ! কেউ তাকে জেল দেবে না, ফাঁসি দেবে না।

কুড়বা কুড়বা কুড়বা লিজ্জে
কাঠায় কুড়বা কাঠায় লিজ্জে !

বলে দুম দুম করে পেটাতে লাগল মদন। পরী পিঠ বাঁকিয়ে মাটিতে পড়ে গেল।

যে পশুর অগ্র-পশ্চাৎ জ্ঞান নেই, বিয়ের মাইকের বাজনা শুনে যে পশু বিয়ের গো-গাড়ির পিছু ধাওয়া করে, তারও রয়েছে অন্তরের মদির-আনন্দ অথবা সে বাজনাও বোঝে না, বোঝে শুধু ছেলেপেলের হইচই, বাচ্চারা গো-গাড়ির পিছু ধাইছে দেখে সেও পিছু নিয়েছিল।

বিয়ের নেমন্তন্ন বাড়িগুলোয় পরীকে দেখা যায়, এঁটো পাতা ফেলে দেওয়া গর্তে কুকুর আর ভিখিরিদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে পাতা চাটে। পরী কেন মাইকের বাজনা শুনতে শুনতে বোলজিৎপুর চলেছিল সে কি জানে! এখন মার খেয়ে পড়ে গেছে। বোধহয় মদনকে সে চিনতে পেরেছে, যার ফলে মার খেয়েও নড়তে চাইছে না।

মারতে মারতে মদনের হঠাৎ মনে হল, কই বরটা তো নেমে এসে তাকে নিরস্ত করল না। গো-গাড়ি চলে যেতে লাগল, মিটকি মিটকি হাসছে বরটা, কনে কেমন করে মুখ ঝামটা দিল। পরী মরে গেলেও ওদের অন্তর কোনও ভাবে স্পর্শ করবে না।

সন্ধ্যা হয়ে গেল। এমন নির্জন মাঠে পরীকে খুন করে ফেলে রাখবে কিনা মদন ভাবল। তার অপ্রতিরোধ্য ক্রোধ কিছুতেই প্রশমিত হচ্ছে না। মনে হচ্ছে, পরীকে খুন করলে তবেই সে শান্ত হতে পারবে।

তবু মদন পারল না। শেষ অবধি পরীকে রহস্যময় সান্ধ্য-আঁধারে ছেড়ে দিল। দিগ্‌ভ্রান্ত, অগ্রপশ্চাৎশূন্য পশুটা কোথায় যাবে মদন জানে না, এত মার খেয়েও পরীকে কোথাও যেতে হবে।

ছেড়ে দিল মদন। তারপর দৌড়তে শুরু করল। দৌড়তে দৌড়তে পরীর কথা ভেবে তার কান্না পেতে লাগল। পরী বোবার মতো মার সহ্য করছিল। এরই পিঠে চড়ে মদন হুদোয় চাকরির জন্য গিয়েছিল। মেয়ে পরীকে দেখতে গিয়েছিল। মানুষের দ্বারা এই পরী ধর্ষিত হয়েছে। এই পশুর জন্য একাই সে কাঁদছে। একটা জীবনে একজন পাগল এভাবে এদেশে কাঁদে, কেউ বোঝে না, কেউ জানে না। কিন্তু ক্রোধ আর হিংসা তো গেল না ঈশ্বর! মিছরির বিয়ে হয়ে গেল, এ কী করে সহ্য হবে?

ভাবতে ভাবতে মদন সম্পূর্ণ উন্মাদ হয়ে গেল।

সম্পূর্ণ উন্মাদ অবস্থায় বোলজিৎপুর পৌঁছল মদন। বোনের যে-বাড়িতে বিয়ের ব্যবস্থা পাকা হয়েছে, সেই বাড়িটাও খুঁজে পেল সে। তাকে দেখে নির্মলার হবু শ্বশুর বাড়ির লোকেরা কেউ চিনতে পারল

না।

নির্মলার হবু ভাসুর পেটে কালির আঁচড় পড়া লোক। ডাক-পিয়নের চাকরি করে। হবু জামাই তন্তুবায়। চোখে পড়ার মতো বেঁটে, প্রথম সে বিয়ে করেছিল পাঁচ বছর আগে, সে বিয়ে টেকেনি। মামলা-মোকদ্দমার পর নিষ্পত্তি হয়েছে। আগের বউ ছিল অত্যন্ত লম্বা আর স্বাস্থ্যবতী, উগ্র যৌবনা, সেই জন্য নাকি সে বউ তাঁতির ভাত খেল না। ভাসুরের নাম অমর। হবু জামাই জহর।

ভাসুরের বউ, ছেলেপুলে আছে। জামাইদের মা বাবা আছে। জামাইদের বোন আছে একটি। বিয়ে হয়নি। বিয়ের চেষ্টা করা হচ্ছে। এদের কিছু মেঠো জমি আছে। ধান-সবজি হয়। নিজেরা চাষবাস করে না।

ভাসুর লম্বা, মাত্রাধিক ডিগডিগে। একহারা গড়ন, রোগার ধাঁচা, গলা লম্বা বলে কিছুটা লাজুক। গোল মুখ, নাক লম্বা। লুঙ্গি পরা, খালি গা। বিড়ি ফুঁকছিল। বাইরে থেকে ডাক শুনে বিড়িতে সুখটান মেরে পাটকাঠির বেড়া-দেওয়া বাড়ির উঠোন ছাড়িয়ে হেঁটে এল মদনের সামনে। দুর্বা ঘাসের উপর দাঁড়াল বাইরের কুঁয়োতলায়।

— কী চাই ?

— খবর ছিল।

— কিসের খবর ভাই ?

— বিয়ের ব্যাপারে কিছু বলার ছিল দাদা।

— কোথা থেকে আসছ ?

— মণিকারের লোক আমি।

— ও, আচ্ছা। আসুন আসুন, ভেতরে আসুন ভাই। আগে বুঝতে পারিনি।

উঠোনে একটি টুলের উপর বসতে দেওয়া হল নাম মদনকে। দেখতে দেখতে কিছুক্ষণের মধ্যে আশপাশের বাড়িতে খবর রটে গেল, তাঁতিবাড়িতে বিয়ের লোক কী যেন খবর বয়ে এনেছে।

— কী খবর, বলুন ভাই। তার আগে জল বাতাসা হোক।

— হোক। বলল মদন। বলে সে চোখ তুলল।

নাম মদনের এখনও পৃথিবীকে আশ্চর্য ঠেকছিল। এখনও পৃথিবী তাকে বিশ্বাস করে। চারিদিক থেকে মানুষেরা তাকে কী চমৎকার আগ্রহে ঘিরে ধরেছে। অবশ্য এই সব মানুষেরা সর্বনাশের বিনাশের ধ্বংসের নষ্টের পাপের দুর্গতির দুর্নামের বিনষ্ট যৌনতার যৌনক্রূরতার হিংসার অসূয়ার অপ্রেমের হৃদয়ের কুটিলতার জটিলতার ক্ষুদ্রতার নীচতার

হীনতার পতনের সর্বনাশের বিনাশের নষ্টের পাপের কথা শুনতে ভালবাসে। এরা জমে ওঠে বোলজিৎপুরের তাঁতিবাড়ির মাটির দাওয়ায়।

পুলিন ঘোষের নির্জলা খাঁটি দুধের মতন জ্যোৎস্না। বুনো শুভ্র মরালীর মতো ফিনিক-শাদা জ্যোৎস্নার উঠোনভরা টইটই করা আশ্চর্য রাত। চাঁদ যেন পৃথিবীর সমস্ত সাদা হিমানি মেখেছে। এই জ্যোৎস্নায় মানুষ তার হাতের লোম আর অন্যের কপালের রাজশিরার দাপানি পর্যন্ত অনুভব করতে পারে।

কিন্তু ছায়া পড়েছিল মাটির বারান্দায় ; খড়ের চালের ঝুঁকে পড়া ছায়া। ছায়া আর জ্যোৎস্নায় কী রকম মোহ্ জাগে। বারান্দার ছায়ায় রয়েছে মানুষ, কেউ বা খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে। ছায়ায় মুখের আকৃতি দেখা গেলেও সব রূপ স্পষ্ট হয় না, কারণ জ্যোৎস্নায় মদনের চোখ ধাঁধিয়ে গেছে। চোখ আর মস্তিষ্কে ধাঁধানি এবং চোখে জলও আছে।

বারান্দার সবচেয়ে দূরের খুঁটিটা ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে যে যুবতী, তার মুখে পড়েছে চালের ছায়ার সঙ্গে আরও কিছু ছায়া ; চাঁদটা এক দিগন্তের উচ্চতা থেকে সেই ছায়া পাঠাচ্ছে তার মুখে। চালেরও আড়াল হতে পারত আর কিছু নিচু হলে চাল। হয়নি, তবু গাছপালারই নির্দেশে ছায়া কিছু গভীরই রয়েছে। কে ওটা ?

জলবাতাসা হয়ে গেল।

— সাবিত্রীর মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে এ বাড়ির ছেলের ?

— হ্যাঁ, ভাই!

— মণিকারকে বিশ্বাস করেন নাকি ?

— করি।

— ঠিক না।

— তুমি কে ভাই ? তুমিই তো বললে মণিকারের লোক তুমি। কথা বলছ না কেন ?

— আমি বংশী। বুঝলেন, লোক কারও নই। এ বিয়ে দেবেন না।

দূরের খুঁটির ছায়া নাম মদনের উক্তি শুনে নড়ে উঠল। শেষ পর্যন্ত মিতে নির্মলার বিয়ে ভেঙে দিতে এসেছে। বংশী সেজে এসেছে। এখানকার কেউ ওকে চেনে না। অপরিচয়ের সুযোগ নিয়ে নাম কী সর্বনাশের কথা বলছে!

— ওনাকে আসল নাম শুধাও তোমরা ; বংশী কে ? বংশী মদন বেঁচে নেই। বলে উঠল খুঁটি ধরা ছায়া। অমর মৃন্ময়ীর বাক্য শুনে সচকিত হয়ে উঠল। পাশের বাড়ি থেকে এতক্ষণে একটি ছোট

হ্যারিকেন এল। এ বাড়িতে কেরোসিন ছিল না। চাঁদের আলো প্রবল হলে কেরোসিন ছাড়াই একটি রাত একটি পরিবারে স্বচ্ছন্দে কেটে যেতে পারে।

অমর বাচ্চা মেয়েটার হাত থেকে হ্যারিকেনটা দ্রুত কেড়ে নিয়ে উঠোনে নাম মদনের সামনে নেমে এল। হ্যারিকেনটা মদনের কপালের কাছে তুলে ধরে ঈষৎ কড়াসুরে শুধাল— বিয়ে কেন দেব না ভাই ? তুমি কে, সত্যি করে বলো দিকিনি।

— আমি বংশী মদন। নির্মলা জানে আমি বংশী কিনা। ওই উনি আমারে চেনেন না। বলে খুঁটির ছায়ার দিকে আঙুল তুলল নাম।

— লোকটাকে চিনতে পারছ মিনু ? ভাল করে দেখো তো। মনে হচ্ছে, দু'নম্বরী লোক।

—বলছি, ও বংশী নয়।

মৃন্ময়ীর ওই উক্তিই যথেষ্ট মনে হল জহর গুঁইয়ের। চড়াক করে রাগ উঠে গেল মাথায়। বারান্দা থেকে লাফ দিয়ে নেমে ক্ষিপ্র বেগে ছুটে এল নামের সামনে। সময় নিল না এক দণ্ড। অমরকে 'সরো দাদা, আমাকে দেখতে দাও' বলে জহর দাদাকে সামান্য ঠেলে দিয়ে হাঁকল— কে তুই ? এই শালা, মণিকারের লোক বলে ঢুকেছিস গেরস্ত বাড়িতে। কেন রে ? ভাঙানি দিতে। বল, তুই কে ? কী করিস ? ইনকাম ?

— বাঁশি বাজাই। বলল নাম, ভয়ে ভয়ে।

— না, ও বাঁশি বাজাতে পারে না। সব ভুল, মিথ্যা। বলে উঠল মিনু পাল।

সঙ্গে সঙ্গে বেঁটে জহর, 'ওরে শালা ফিকিরবাজ, কেতাও করতে চাঁদনি রাতে এসেছিস, তাই না ! এই শালা ওঠ' বলে একটি চণ্ড ঘুষি বসিয়ে দিল নামের গালে। মার খেয়ে গালে হাত দিয়ে টুল থেকে মাটিতে পড়ে গেল নাম মদন। উঠোনে পড়ে থাকা মদন ওঠার চেষ্টা করবা মাত্র তার মুখে লাথি কষিয়ে দিল জহর গুঁই।

এই সময় দূরের উঠোনে ছোট হাত-ঢোলক কুড়কুড় করে উঠল। মেয়েলি গলার গান ভেসে আসতে লাগল :

রূমকে ঝমকে নাচিব মশালে
মশাল জ্বালিয়ে দে।
হেলিয়া দুলিয়া নাচিব মশালে
মশাল জ্বালিয়ে দে।

কে মশাল জ্বালবে, কার জন্য, ভেবে কেঁপে উঠল মৃন্ময়ী। চাঁদের মশালে নামের মুখ পুড়ে গেছে। ওকে আর চেনা যাচ্ছে না। ওকে মিনু

ছাড়া কেউ তো চেনে না আর !

— মরা মানুষের ছদ্মবেশ ধরে এসেছিল শালা ! ওঠ ! ক্ষুর নিয়ে আয় পলাশ। দেখি, বদটাকে ! বলে আবার লাথি মারল জহর।

গান বেজে উঠল :

বাপের দুয়ারে নাচিব মশালে
মশাল জ্বালিয়ে দে।
ভাইয়ের উঠোনে নাচিব মশালে
মশাল জ্বালিয়ে দে।
শ্বশুর ভাসুর দূর হোক মশালে
মশাল জ্বালিয়ে দে।
মশাল জ্বালিয়ে দে রে সয়া
মশাল জ্বালিয়ে দে।

— ওগো ! ওকে অমন করে মেরো না ! ছেড়ে দাও ! বলে মৃন্ময়ী বারান্দা ছেড়ে উঠোনে নামল। উঠোনে মদনের একখানা হাত ধরে টেনে হিচড়ে নিয়ে বেড়াচ্ছিল জহর।

জহরের হাত চেপে ধরল মিনু। মদনের কষে জ্যোৎস্নালাগা রক্ত। জহরের হাত থেকে মিতেকে এক প্রকার কেড়ে নিয়ে আঁচল দিয়ে নামের কষের রক্ত মুছিয়ে দেয় মৃন্ময়ী।

মদনের সারা দেহে ধূলা আর ঘাস। ঘামে মাথার চুল পর্যন্ত ভিজে গেছে।

মৃন্ময়ীর কাণ্ড দেখে উপস্থিত সকলেই যথেষ্ট আশ্চর্য বোধ করল। তারপর ছিঃ ছিঃ করতে লাগল। মিনু তার মিতেকে বুক দিয়ে চেপে ধরল। মিনুর চোখ জলে ভরে এসেছিল। সে ভুলে গেল কোথায় কাকে নিয়ে কী করছে !

মিনু পাল মিতেকে উঠোনের উপর খাড়া করে তুলল। দু'হাতে আগলে ধরে অমরদের অঙ্গন পার হয়ে রাস্তায় নেমে এল। বলল— তুমি চলে যাও নাম ! এখানে থাকলে লোকে তোমাকে মারবে। মেরে ফেলবে।

— কোথায় যাব মিতবউ ! আমাকে তুমি শোধ নিতে দিলে না। নিমির বিয়ে হয়ে যাবে, তারপর আমি কী করব ! মনে মনে বিড়বিড় করল মদন তাঁতঅলা। মুখে কিছুই প্রকাশ করতে পারল না। নিমির মুখ মনে করে তার চোখ ঝাপসা হয়ে আসছিল। অভিশপ্ত মদনকে আজ আর দুনিয়া পোঁছে না। এত বড় পাপীকে তবু কেন মিতিন এভাবে বাঁচাল !

— যাও !

— না।

— আমাকে ছেড়ে দাও নাম।

— না।

— আর হয় না মিতে !

— তুমি কথা রাখো মৃন্ময়ী। আমার ভার তুমি নাও। মুখে বলতে না পারলেও মদনের চোখের তারায় আবেদন ফুটে উঠল। সেই অসহায় করুণ মুখখানির দিকে চাঁদের আলোয় চেয়ে থাকতে থাকতে মিনুর বুকের ভেতরটা কেমন মোচড়াতে থাকল। অপূর্ব বেদনায় টনটনিয়ে উঠল হৃদয়। মদনের গালে, গলায়, ঠোঁটে, বুকে হাত বুলিয়ে দিয়ে মৃন্ময়ী বলল— আর বোলজিৎপুর এসো না কখনও।

— ধর্মের কাছে একবার অন্তত চলো মিনু। একবার !

আকাশে জ্বলছে চাঁদের মশাল। তাকে একাই জ্বেলেছে মৃন্ময়ী। সে একাকিনী, তার শ্বশুর ভাসুর সংসার কোথায়, কেউই কেউ নয়, শ্বশুর-ভাসুর কিছুই ছিল না কখনও। স্বামী ছিল, স্বামীও ছিল না কখনও। সে মৃন্ময়ী, এইই তার পরিচয়। সে বিধবা, এ তার ছদ্মবেশ।

নদীর ধারে ধারে পথ ধরে চলতে লাগল ওরা। নাম মদন নদীর বাতাসে এবং মৃন্ময়ীর সান্নিধ্যে ক্রমশ সুস্থ হয়ে উঠতে লাগল।

মুখে আর কোনও কথা না বললেও দু'জন অভিশপ্ত নরনারী মনে মনে স্থির করল, রাঙা মাটি আর বসুনে জলের সব সম্বন্ধের অবসান হয়েছে এই রাতে। প্রেমই একমাত্র জিনিস যা পাপের ভাগ নেয় ; সংসার মিথ্যা করে, সংস্কার ভাঙে, আদিম তিন দেবতা, জল-মাটি-আগুনকে কলা দেখায়। জল মাটি আগুনের চক্র থেকে পার হয়ে আসে ওরা।

কিন্তু কোথায় আসে মিতবউ ? ধর্মের কাছে জীবনের হদিস নেবে বলে সঙ্গে করে চলেছিল মদনকে। মিতবউ কেবল শুধাবে, আমরা কি তা হলে সত্যিই বিয়ে করতে পারি, বড়ো বাবা।

একথা ভেবে নাম মদনের চোখের দিকে চাইল পাশে ঘাড় ঘুরিয়ে মৃন্ময়ী। ওরা এসে পৌঁছল নদীর জিভে চেরা সেই দহপড়া সুবৃহৎ খাদের কাছে। এই জমি মদনের আর নেই।

ওই দিকে মসৃণ পলি রেতের উপর মিতিনের সঙ্গে তার সঙ্গম অসম্পূর্ণ ছিল, তারই পূর্ণতার জন্য এই এত আখ্যান। শাস্ত্র মতে, সম্পূর্ণ সঙ্গমই মর্ত-জীবের জীবন, তারই জন্য জগৎ রচনা। সম্পূর্ণ মিলনই প্রেম। মৃন্ময়ীর সেই একই কথা মনে হল। তখনই তারা দু'জন অবাক হয়ে

দেখল, চার-বাবলাতলায় কে যেন বসে রয়েছে।

ওরা এসে দাঁড়াল চার বাবলাতলায়। লোকটা নড়ছেও না পর্যন্ত। কে লোকটা ? ঝুঁকে পড়ল মৃন্ময়ী।

— কে তুমি বাবা ?

— আমি ধর্ম, আমাকে চেন না ?

— আপনি এখানে কেন ?

— হাটে এসেছিলাম।

— ফিরতে পারেননি ?

— না। এখানে এসে দম চলে গেল হে মদন। চাঁদের আলো খাওয়াচ্ছি আত্মাকে।

— কেন বাবা ?

— রোদ সহ্য হয় না। সংজ্ঞার সহ্য হয়নি।

— কে সংজ্ঞা ?

— বিবস্বানের পত্নী।

— বিবস্বান মানে তো সূর্য। বলে উঠল নাম মদন।

— হ্যাঁ। এবং সূর্যর বউ সংজ্ঞা। স্বর্গে থাকতে সঙ্গম কালে সংজ্ঞা বিবস্বানের তাপ সহ্য করতে পারে না। সঙ্গম অসম্পূর্ণ থাকে। সংজ্ঞা ভয় পায়, গলে শেষ হওয়ার ভয়, পুড়ে ছাই হওয়ার ভয় বা খাক হওয়ার ভয়। সংজ্ঞাই আমার বিচারে মাটি।

— আর কত আখ্যান তোমার কুক্ষিতে আছে ধর্মনারায়ণ, কবে তুমি মরবে ? বলে আর্তরব করে উঠল নাম মদন।

— আখ্যানের এখানেই সমাপ্তি নাম বাবা। সেই সংজ্ঞা সঙ্গম সম্পূর্ণ করতে মর্তে নেমে ঘোটকীর রূপ ধরেন। তখন বিবস্বান নেমে আসেন মর্তে ঘোটক রূপে। তাঁরা পূর্ণ সঙ্গম করেন। তুই পঞ্চতপা মৃন্ময়ী, উত্তর দে, দানোর সঙ্গে তোর মিলন কি সম্পূর্ণ হয়েছিল ?

— আজ্ঞে !

— দানো কি পূর্ণ হয়েছিল ? উত্তর দে, চুপ করে থাকিস না। আমার সময় ঘনিয়ে আসছে, এখানেই আমি মরব।

— আমি জানি না বড়ো বাবা ! বলে ডুকরে উঠল মৃন্ময়ী।

— তুই কি সম্পূর্ণ মিলনের আনন্দ পেয়েছিস ?

— জানি না।

— এই জন্যেই বলে দেবতার কাহিনী বলা যায়, মানুষের বেত্তান্ত বলা যায় না। যাও, ওইখানে দেখো পরী মরে পড়ে আছে। ওই খাদে, যেখানে তোমার স্বামী মরেছে।

খাদের মধ্যে দ্রুত ছুটে এসে নেমে পড়ল মদন তন্তুবায়। পরীকে স্পর্শ করেই চেঁচিয়ে উঠল— পরী এখনও মরেনি ঠাকুর। বলে অনেকক্ষণ ধাক্কা দিয়ে দিয়ে পরীকে খাড়া করে তুলল নাম মদন। খাদ থেকে ওঠাবার সময় হড়কে পড়ে গেল আবার গর্তের মধ্যে পরী। তখনই মারা গেল প্রাণীটা। সেই মৃত্যুকে সহ্য করতে পারল না মদন দেবনাথ।

এই ঘটনা দেখে আতঙ্কিত মৃন্ময়ী চার বাবলাতলায় ধর্মের কাছে ছুটে এসে অত্যন্ত বিচলিত সুরে বারংবার বলতে লাগল— আমি দানোর জীবনে সম্পূর্ণ হয়েছিলাম ঠাকুর। আমি ফাঁকি দিইনি বড়ো বাবা! ওগো, শোনো তুমি, ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট। একবার চোখ খুলে আমার দিকে চাও। আমি তোমার মিনি!

ধর্মের কানে আর কোনও কথাই পৌঁছল না। তিনি আর কখনও চাইবেন না মর্তের দিকে। নদীর দিকে; মৃত্তিকা, জল ও আগুনের দিকে। সবই বুঝতে পারল কাঁদতে কাঁদতে, কান্না দমাতে দমাতে, কান্নার চাপে ফুলে ফুলে ওঠা দেহে মৃন্ময়ী।

নাম তার মিতিনকে ডাকল— চলো!

মিতিন উত্তর দিল না।

আবার ডেকে উঠল মদন দেবনাথ— এই হাত দু'খানি আমাকে দাও মিনু। নিমি চলে যাবে ঘর করতে, আমার মটকায় আহার কে খাওয়াবে। মিনি, তুমি আমাকে সম্পূর্ণ করো।

— ধর্ম যে আমার কথা শুনতে পেল না গো।

— তুমি দেরি কেন করলে উত্তর দিতে!

— আমি যে তোমাকে মিথ্যে দিয়ে পেতে চাইনি নাম। ধর্মই আমাকে রক্ষা করেছে, আমার মুখে চরম মিথ্যা শোনার আগেই চলে গেছে। বলেই মৃন্ময়ী পাগলের গলায় হেসে উঠল। হাসতে হাসতে কেঁদে ফেলল মিনু পাল। সেই ঘটনা হতবাক হয়ে দেখতে থাকল মদন তন্তুবায়।

এই জ্যোৎস্নার সীমাহীনতায় আর নদীর শান্ত বাতাসে তার অন্তর এক অলৌকিক শান্তিতে ভরে গেল। সমস্ত হারিয়ে আজ সে সম্পূর্ণ জয়ী হয়ে গেল। হুদো পাখির দেশে তার হৃদয় অমর্ত্য-সুঘ্রাণে ভরে গেল। হিংসা থেকে মুক্তি ঘটল এই চরাচরে। তার আর কিছুতেই সম্পূর্ণ হতে ইচ্ছে করল না। সেই বা কেমন আর এই নদীই বা কেমন।

ভাবল মদন নাম যার, সেই লোকটা। মিতবউ ধীরে ধীরে কান্না শেষে উঠে দাঁড়াল। আশ্চর্য শান্ত দেখাচ্ছিল মিতেকে। মদন পায়ে

পায়ে এল নদীর জিভচেরা দহবৎ গহ্বরের সামনে।

চিত হয়ে পড়ে আছে মৃত পরী। সেদিকে চেয়ে থাকতে থাকতে অকস্মাৎ নাম বলে উঠল— মিতিন। তবে তাই হোক।

— কী? আকুল হয়ে জানতে চাইল মিনু পাল।

— যা এই মর্তে শেষ হল না, তা এখানে পূর্ণ হয় না। বড় লোভ হচ্ছে তোমাকে দেখে। তবু ফিরে যেতে হবে তোমাকে। পরীর দিকে চেয়ে দেখো, মিতিনকে কি আমি আর স্পর্শ করতে পারি! মাটিকে মৃত্তিকায়, ফুলকে পুষ্পে, বিবস্বানকে অন্তরীক্ষে স্থাপন করেছেন ধর্ম। আমাকে সবই তিনি দিয়ে গেছেন! আমাতে আমি স্থাপিত হয়েছি মিতবউ। তুমি ফিরে যাও। হিতেনপুরে দানো মিতের পানা একজন আছে, তারও নাম মদন পাল। বউ মরেছে আন্ত্রিকে মিতিন। তাকে বিয়ে করো!

— আর তুমি?

— তোমাকে কি আর মিথ্যে বলতে পারি।

— সত্য কী?

— অবিবাহ। বলেই দ্রুত বাড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করল নাম মদন। তারপর একদিন বর্ষা নামল আকাশে, নদীতে প্লাবন।

পরীর কঙ্কালকে ভাসিয়ে নিয়ে চলল নদী। চেরা জমি দিয়ে জিহ্বা বাড়িয়ে নদী তারা পালের টালির কল দুখানিকে গর্ভে ভরে নিল। সব ঘটে গেলেও নদীর কুক্ষির শেষ হল না।

পালের চাক তবু ঘুরতে থাকল, চটি মাটি করল মৃন্ময়ী। মাটির রুটি খাওয়াল মৃৎপাত্রের স্কন্ধকে। পোন জ্বলে উঠলে তার প্রকাশ্য ঘর্মাক্ত স্তনে উড়ে এসে বসল তসরের প্রজাপতি। কৃষ্ণচূড়া আগুনের জিহ্বায় সেই লেলিহান সৌন্দর্য শেষ হল না।

দ্বিতীয় বিয়ের পর মৃন্ময়ী এক বর্ষায় জোড়া নাদার বানে লগি মেরে মিতেকে খুঁজতে বার হল পাপকে সম্পূর্ণ করতে। মিলনের সম্পূর্ণতা নয়, অভিশাপের সঙ্গে পাপের সম্পূর্ণতাই জল মাটি আগুনের উপাখ্যান; তাইই নদীতীরে হুদোর চরে পৈলান চাষির দিগরে ঘটে থাকে, এর অন্যথা দেখি না।

শোনো শোনো বন্ধুগণ শোনো দিয়া মন/ প্রেমের অন্তরে দেখি পাপের মন্থন।